২

মহিলা ফিকাহ

আল্লামা মুহাম্মদ আতাইয়া খামীস

www.bjilibrary.com

মহিলা ফিক্‌হ

দ্বিতীয় খণ্ড

www.bjilibrary.com

فقه النساء

محمد عطيه خميس

www.bjilibrary.com

মহিলা ফিক্‌হ

দ্বিতীয় খণ্ড

মূল

আল্লামা মুহাম্মদ আতাইয়া খামীস

আবদুস শহীদ নাসিম
অনূদিত

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.bjilibrary.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আ. প্র. ২১০

৬ষ্ঠ প্রকাশ

রজব	১৪৩১
আষাঢ়	১৪১৭
জুন	২০১০

বিনিময় ঃ ১২৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

فقه النساء-এর বাংলা অনুবাদ

MOHILA FIQH Volume-2nd by Mohammad Atya Khamis. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 125.00 Only.

www.bjilibrary.com

অনুবাদকের কথা

ইসলামী শরীয়তের অনেক বিধি বিধান পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। আবার পুরুষ পুরুষ হবার কারণে তাদের জন্য মহিলাদের থেকে পৃথক কিছু বিধান রয়েছে এবং মহিলারা মহিলা হবার কারণে তাদের জন্য রয়েছে বিশেষ কিছু আলাদা বিধান।

প্রাচীন এবং আধুনিককালে লিখিত অধিকাংশ ফিক্‌হ গ্রন্থেই পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের শরয়ী বিধান একই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। এসব গ্রন্থ রচিত হয়েছে মূলত আরবী ভাষায়। আর আমাদের দেশে সাধারণত পুরুষরাই মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণ করে আসছে বিধায় মহিলা সমাজ তাদের জন্য শরীয়ত প্রদত্ত বিধিবিধান সরাসরি জানার ক্ষেত্রে দারুণভাবে পিছে পড়ে গেছে। যার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা শরয়ী বিধিবিধান এবং হুকুম আহকাম জানার ক্ষেত্রে রয়ে গেছে অজ্ঞ। একটি মুসলিম সমাজের জন্যে এটা খুবই দুঃখজনক।

এ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বিশ্বব্যাপী ইসলামের যে জাগরণ শুরু হয়েছে, তাতে মহিলারাও পিছিয়ে নেই। আজ যেখানেই দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলছে, সেখানেই মহিলারাও এগিয়ে আসছে আল্লাহর দীনকে জানার, বুঝার এবং প্রতিষ্ঠার কাজে। কিন্তু মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য শরয়ী বিধিবিধান ও হুকুম আহকাম জানার ক্ষেত্রে রয়েছে চরম সংকট। কারণ, তাদের সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী বলতে গেলে তেমন একটা রচিতই হয়নি। অথচ আল্লাহর পথে এগিয়ে এসেছে যেসব মহিলা, আল্লাহর দীনকে বুঝার জন্য তাদের যে উদগ্র আকাঙ্খা, যে সুতীব্র পিপাসা তা মেটাবার পথ ও পাথেয় একেবারে সংকীর্ণ অপ্রতুল।

এই বিরাট প্রয়োজনটি মেটাবার পথেই একটি সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন মিশরের খ্যাতনামা আলিমে দীন মুহাম্মদ আতাইয়া খামীস। তাও আল্লাহর পথে এগিয়ে আসা তরুণী, যুবতী ও মহিলাদের তীব্র তাগাদার তাড়নায়ই তিনি এ কাজে হাত দিয়েছেন। প্রণয়ন করেছেন 'ফিক্‌হুন নিসা'—মহিলা ফিক্‌হ। বিশ্বব্যাপী আল্লাহর পথে এগিয়ে আসা মহিলাদের বড় উপ্‌কার করেছেন তিনি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে এর উত্তম বিনিময় দান

www.bjilibrary.com

করুন। আমার জানা মতে গ্রন্থটি বেশ কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সমাদৃত হয়েছে মহিলাদের একান্ত আপন গ্রন্থ হিসেবে। এ গ্রন্থে ঃ

(১) প্রমাণ গ্রহণ করা হয়েছে কুরআন সুন্নাহ থেকে।

(২) প্রমাণ গ্রহণ করা হয়েছে সাহাবায়ে কিরামের আছার থেকে।

(৩) মতামত উল্লেখ করা হয়েছে, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী এবং পরবর্তী শ্রেষ্ঠ ইমামগণের (রাহিমাহুমুল্লাহ)।

(৪) কোনো বিশেষ মযহাবের প্রতি বিশেষ প্রবণতা প্রদর্শন করা হয়নি। ফলে ঃ

(ক) জ্ঞানী পাঠিকা এ গ্রন্থ পাঠ করে নিজেকে কুরআন সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত করার সুযোগ পাবেন।

(খ) সমস্ত ইমাম ও মুজতাহিদের মতামত পাঠ করে অধিকতর যুক্তিসংগত মত অনুসরণ করার সুযোগ পাবেন।

(গ) বিশেষ কোনো মযহাবের অনুসরণ করতে চাইলে তাও করার পথ পেয়ে যাবেন।

(ঘ) সবচাইতে বড় কথা হলো, অধিকাংশ বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর বক্তব্যসহ শ্রেষ্ঠ ইমাম মুজতাহিদগণের মতামত জানার বিরাট সুযোগ পেয়ে যাবেন।

বাংলাভাষী মুসলিম মহিলা সমাজ এ গ্রন্থটির সাহায্যে তাদের শরয়ী জ্ঞানের সংকট কাটাবার একটা বড় সুযোগ পেয়ে যাবেন বলে আশা করি। আর সে উদ্দেশ্যেই এর বাংলা অনুবাদে হাত দিয়েছিলাম। দয়াময় রহমান এ কাজকে আমার আখিরাতে নাজাত লাভের উপায় বানিয়ে দিন। এর পাঠক পাঠিকাদের শরীয়তের সঠিক বিধান মেনে চলার তৌফীক দিন। আমীন।

আবদুস শহীদ নাসিম
১৯-১-১৯৯৩

www.bjilibrary.com

সূচীপত্র

২৩. মহিলাদের যাকাত সংক্রান্ত বিধান	**১৭**
অলংকারের যাকাত না দেবার পরিণতি	১৯
মহিলাদের অলংকারের যাকাত	২১
চার মযহাবের মতামতের পর্যলোচনা	২৩
আলোচনার সারকথা	২৫
যেসব অলংকারের যাকাত হয় না	২৫
স্বর্ণের নিসাব	২৬
রৌপ্যের নিসাব	২৬
সোনা রূপার নিসাবের দলিল	২৬
যাকাতের হার	২৭
নগদ পুঁজির যাকাত ও তার নিসাব	২৮
যাকাত কাদের দেবেন	৩১
মহিলাদের দেনমোহরের যাকাত	৪২
মোহরের যাকাতের হিসাব	৪৩
মহিলাদের সোনার অলংকার পরার ব্যাপারে সতর্ক করা	৪৫
মহিলাদেরকে স্বর্ণালংকার পরার ব্যাপারে শাস্তির ভয় প্রদর্শন	৪৮
২৪. মহিলাদের দান সদকা	**৫০**
অনুমতি থাকলে স্বামীর অর্থ সম্পদ থেকে দান করা জায়েয	৫০
স্বামীর অনুমতি ছাড়া মহিলারা নিজের অর্থ ব্যয় করতে পারে	৫৩
মহিলাদের জন্যে কাদেরকে দান করা উত্তম	৫৪
স্বামীকে যাকাত প্রদানের ব্যাপারে মতভেদ	৫৬
সারকথা	৫৭
মা কি পুত্রকে যাকাত দিতে পারে	৫৮
মহিলাদের সাদাকাতুল ফিতর	৫৯
২৫. মহিলাদের রোযার বিধান	**৬১**
রোযার প্রকার ভেদ	৬১
হায়েয ও নিফাস অবস্থায় রোযা রাখা হারাম	৬২
মাসিক আরম্ভ হবার সম্ভাবনা থাকলে রোযার নিয়ত করবে কি ?	৬৫
রমযানে দিনের বেলায় মাসিক আরম্ভ বা বন্ধ হলে কি করবে ?	৬৫

www.bjilibrary.com

হায়েয নিফাসের কারণে ভংগ করা রোযার কাযা করা ফরয ৬৬
সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণে হায়েয নিফাস থেকে পবিত্র হলে ৬৭
স্বামীর উপস্থিতিতে নফল রোযার বিধান ৬৮

২৬. রমযান মাসে রোযা না রাখার অবকাশ ৭০
গর্ভবতী ও শিশুকে স্তন্যদানকারী মহিলাদের জন্যে অবকাশ ৭০
রোযা রেখে চোখে সুরমা লাগানো বা পানি ও ঔষধের ফোটা দেয়া ৭৪
চোখে পানি বা ঔষধ দেয়া ৭৭
রোযা রেখে খাবারের স্বাদ পরীক্ষা করা ৭৭
রোযা রেখে চুমু খাওয়া ৭৮
এ বিষয়ে ফকীহদের মতামত ৮১
এ বিষয়ে ফিক্হী বিধান ৮৩

২৭. রোযার আরো কতিপয় মাস'আলা ৮৬
গোসল ফরয অবস্থায় রোযাদারের ভোর হওয়া ৮৬
হায়েয বা নিফাসের রক্ত বন্ধ হবার পর করণীয় ৮৯
রমযান মাসে দিনের বেলায় সহবাস করা ৮৯
এ বিষয়ে ফকীহদের মতামত ৯০
কাফ্ফারা কি দিতে হবে ? ৯২
রোযাদারের যদি দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হয় ৯৫

২৮. রোযার কাযা ও ফিদইয়া ৯৬
কাযা কি ? ৯৬
রোযার কাযা কতদিন বিলম্ব করা যাবে ? ৯৭
ফিদইয়া এবং ফিদইয়ার পরিমাণ ৯৮
রোযা রেখে গীবত, অশ্লীল ও মিথ্যা বলা নিষিদ্ধ ১০০

২৯. মহিলাদের ই'তেকাফ ১০২
ই'তেকাফের অর্থ ১০২
ই'তেকাফের গুরুত্ব ১০৩
ই'তেকাফের স্তম্ভ ১০৩
ই'তেকাফের মসজিদ ১০৩
ই'তেকাফের মসজিদ প্রসংগে মতভেদ ১০৪
মহিলাদের ই'তেকাফ প্রসংগে আমাদের মত ১০৫
নিয়ত ১০৬
ই'তেকাফের শর্ত ১০৭

www.bjilibrary.com

ই'তেকাফের সময় কি রোযা রাখা শর্ত ১০৮
ই'তেকাফের জন্যে স্বামীর অনুমতি প্রয়োজন আছে কি ? ১০৯
রাসূলুল্লাহ কেন স্বীয় ই'তেকাফের তাবু উঠিয়ে ফেললেন ? ১১০
ই'তেকাফের মুদ্দত ১১২
কি কি কারণে ই'তেকাফ ভংগ হয় ১১২

৩০. মহিলাদের হজ্জ সংক্রান্ত বিধান ১১৫

হজ্জের অর্থ ১১৫
হজ্জ ফরজ হবার দলিল ১১৫
উমরার বিবরণ ১১৭
হজ্জ মহিলাদের জিহাদ ১১৮
হজ্জ করার জন্যে স্বামীর অনুমতি নেয়া ১১৯
স্বামীর অনুমতি না পেলে কি করবেন ? ১১৯
মহিলাদের জন্যে মাহরাম সফরসংগী থাকা শর্ত ১২১
দিন প্রসংগে হাদীসে মতভেদের কারণ ১২৩
স্বামী বা মাহরাম সফরসংগী আবশ্যক হবার ব্যাপারে মতভেদ ১২৫
বৃদ্ধাদের হজ্জ যাত্রা ১২৮
নফল হজ্জের সফর ১২৯
উদ্ধৃত মতামতের সারকথা ১৩৩
কেউ যদি মাহরাম সংগী ছাড়া হজ্জ করে ? ১৩৪
মাহরাম কারা ১৩৫
মাহরাম সাথীর বুদ্ধিমান ও বালিগ হওয়া শর্ত ১৩৬
মাহরাম সাথীর সফর খরচ কে দেবে ? ১৩৬
ইদ্দত পালনরত মহিলার হজ্জ ১৩৭
তালাকের প্রকারভেদ ১৩৮
ইদ্দত পালনরত মহিলার হজ্জে যাবার বিধান ১৩৯
পথিমধ্যে যদি মাহরামের মৃত্যু হয় ? ১৪১

৩১. ইহরাম বাঁধার সময় মহিলাদের করণীয় ১৪৩

গোসল করা ১৪৩
নুফাসা ও ঋতুবতীর জন্যেও গোসল মুস্তাহাব ১৪৩
ইহরাম বাঁধার সময় মহিলাদের সুগন্ধি ব্যবহার করা কি বৈধ ? ১৪৫
মহিলাদের শোক পালনের সময় সুগন্ধি ব্যবহার ১৪৭
রোযাদারের সুগন্ধি ব্যবহার ১৪৭
ইহরাম বাঁধার সময় যারা সুগন্ধি ব্যবহার নিষেধ মনে করেন ১৪৮

www.bjilibrary.com

ইহরাম বাঁধার সময় মেহেন্দী লাগানো ১৪৯
ইহরামের সময় নখপালিশ লাগানো ১৫০
ইহরাম বাঁধার পরে মেহেন্দী লাগানো ১৫১

৩২. ইহরামের অর্থ ও প্রকার ভেদ ১৫২
নুফাসা ও ঋতুবতীর ইহরাম ১৫৩
ইহরামের প্রকারভেদ ১৫৪

৩৩. ইহরামে মহিলাদের পোশাক ১৫৭
সুগন্ধিযুক্ত কাপড় ১৫৯
দস্তানা ১৫৯
কুসুম ফুলের রঙে রঞ্জিত কাপড় ১৬১
ইহরাম অবস্থায় অলংকার ও কালো কাপড় পরা ১৬১

৩৪. ইহরামের সময় মুখমন্ডলে নিকাব পরা ও লাব্বায়েক বলা ১৬৩
হাদীসের বর্ণনা ১৬৩
নিকাব কি ? ১৬৪
ইমামদের মতামত ১৬৪
মহিলাদের লাব্বায়েক বলা ১৬৬
হায়েজ ও নিফাস অবস্থায় লাব্বায়েক বলা ১৬৬

৩৫. ইহরাম অবস্থায় যেসব কাজ হারাম ১৬৭
চুল কামানো ১৬৮
চুল আঁচড়ানো ১৭০
চুল ছিঁড়ার ফিদইয়া ১৭১
ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করা ১৭২
বিপক্ষের বক্তব্য ১৭২
ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করা যারা জায়েয মনে করেন ১৭৩
ইহরাম অবস্থায় বিয়ের সাক্ষী হওয়া ১৭৬
ইহরাম অবস্থায় বাগদান ১৭৬
ইহরাম অবস্থায় তৈল ব্যবহার ১৭৬
আলোচনার সারকথা ১৭৮
ইহরাম অবস্থায় সুরমা লাগনো ১৭৯

৩৬. ইহরাম অবস্থায় স্ত্রীসহবাস ১৮২
সহবাস পূর্ব কার্যক্রমের বিধান ১৮৪
হজ্জের কার্যক্রম ও মানাসিক ১৮৫

www.bjilibrary.com

৩৭. তাওয়াফ ১৮৬

১. পবিত্রতা ১৮৬

এস্তেহাযার রোগীদের তাওয়াফ ১৮৯

২. সতর ১৮৯

ইদ্‌তেবা প্রসংগ ১৯২

৩. মহিলারা 'রমল' করবে না ১৯৩

৪. পালাক্রমে তাওয়াফ করা ১৯৪

৩৮. বিভিন্ন প্রকার তাওয়াফ ও মহিলাদের সমস্যা ১৯৬

তাওয়াফে কুদূম ১৯৬

তাওয়াফে উমরা ১৯৭

তাওয়াফের পূর্বে মাসিক দেখা দিলে কি করণীয় ১৯৭

মাথার চুল না খোলা ২০২

তাওয়াফের আগে মাসিক শুরু হলে কুরবানী ওয়াজিব ২০৪

তাওয়াফে ইফাদা ২০৪

তাওয়াফে ইফাদার সময় ২০৫

মহিলাদের তাড়াতাড়ি ইফাদা করা উচিত ২০৬

ইফাদার পূর্বেই মাসিক আরম্ভ হলে কি করবে ? ২০৬

তাওয়াফে বিদা ২১১

তাওয়াফে বিদা ও ঋতুবতী ২১২

যে মহিলা যাত্রার সময় তাওয়াফে ইফাদা করে ২১৪

তাওয়াফে বিদা অন্যদের জন্যে রহিত হয় না ২১৪

৩৯. সাফা মারওয়ায় সায়ী করা ২১৬

নুফাসা ও ঋতুবতীর সায়ী ২১৬

সায়ীর স্থান কি মসজিদে হারামের অংশ ? ২১৭

সায়ীর সময় মহিলারা কি সাফা মারওয়ায় উঠবে ? ২১৮

মহিলাদের রাত্রে সায়ী করা মুস্তাহাব ২১৯

মহিলারা সায়ীতে রমল করবে না ২১৯

৪০. উকুফে আরাফা ২২০

আরাফায় অবস্থানের জন্যে পবিত্রতা শর্ত নয় ২২০

আরাফায় তাকবীর ও তাহলীল পাঠ ২২১

৪১. মুযদালিফায় রাত্রি যাপন ২২২

৪২. পাথর নিক্ষেপ ২২৫

www.bjilibrary.com

জুমরায়ে উকবা ২২৬
আইয়্যামে তাশরীকে পাথর নিক্ষেপ ২২৯
রামী করার জন্যে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা ২৩০

৪৩. চুল কামানো বা ছাঁটা ২৩২
মহিলারা কি পরিমাণ চুল ছাঁটবে? ২৩৩

৪৪. হাদী বা কুরবানীর পশু ২৩৪
কুরবানীর পশু যবেহ করার জন্যে প্রতিনিধি নিয়োগ করা ২৩৫
কুরবানীর পশু সম্পর্কে কতিপয় জাহেলী ধারণা ২৩৬

৪৫. মদীনা সফর ২৩৮
প্রিয় নবীর কবর যিয়ারত ২৩৮
হায়েয ও নিফাস অবস্থায় যিয়ারত ২৪১
সারকথা ২৪৫

www.bjilibrary.com

মহিলা ফিক্‌হ
দ্বিতীয় খন্ড

www.bjilibrary.com

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى
خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً

হে মানুষ ! তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি একটি মাত্র প্রাণ থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন আর সেই প্রাণটি থেকেই তার জুড়ি তৈরী করেছেন এবং তাদের দু'জন থেকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য পুরুষ আর নারী ।

[আননিসা ঃ ১]

www.bjilibrary.com

২৩. মহিলাদের যাকাত সংক্রান্ত বিধান

যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। যাকাতের আভিধানিক অর্থ পবিত্র করা এবং বৃদ্ধি পাওয়া। পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন : (الشمس : ٩)– قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا "ঐ ব্যক্তি সাফল্য লাভ করলো, যে আত্মাকে পবিত্র করলো।" (আশ শামস : ৯)

আত্মাকে পবিত্র করার মানে, কুফর, শিরক এবং অন্যায় কামনা বাসনা ও লোভ লালসা থেকে আত্মাকে মুক্ত ও পবিত্র রাখা।

আরবরা তাদের কথাবার্তায় বলে থাকে زَكَا الزرعُ । এর অর্থ 'ফসল বৃদ্ধি পেয়েছে' এবং 'ফল পুষ্ট হয়েছে'।

সুতরাং আমরা 'যাকাত' শব্দটিকে উভয় অর্থে ব্যবহৃত হবার প্রমাণই পেয়ে গেলাম। অর্থাৎ পবিত্র করা এবং বৃদ্ধি পাওয়া।

যাকাতের পারিভাষিক অর্থ হলো, অর্থ সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ বছরান্তে এমন কাউকে দিয়ে দেয়া, যে কতিপয় শর্তের অধীনে সেগুলো পাবার অধিকারী হয়।

যাকাত ফরয হয়েছিল দ্বিতীয় হিজরীতে। পবিত্র কুরআনের অনেকগুলো আয়াতের অকাট্য নির্দেশের মাধ্যমে যাকাত ফরয হয়। যাকাত প্রদানের জন্যে আল্লাহ তা'আলা এভাবে অলংঘনীয় হুকুম দিয়েছেন : وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ অর্থাৎ "যাকাত দাও।"

তিনি আরও বলেছেন :

(وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ –الذريت :١٩)

"তাদের অর্থ সম্পদে প্রার্থী এবং বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।" [আয যারিয়াত : ১৯]

সুন্নাতে রাসূলেও যাকাত প্রদানের অকাট্য নির্দেশের কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

ম. ফি–২/২—

www.bjilibrary.com

بنى الاسلام على خمس : شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله واقام الصلوة وايتاء الزكوة و صوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا - (بخارى و مسلم)

"পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত স্থাপন করা হয়েছে। সেগুলো হলো ঃ

১. আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল—এই সাক্ষ্য দান করা (এটা হচ্ছে ঈমান)।

২. নামায কায়েম করা।

৩. যাকাত পরিশোধ করা।

৪. রমযান মাসের রোযা রাখা এবং

৫. যাবার সামর্থ থাকলে বায়তুল্লায় হজ্জ করা।"

[বুখারী ও মুসলিম]

যেসব অর্থ সম্পদের যাকাত দিতে হবে, হাদীসে সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং নিসাব নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিভিন্ন রকম অর্থ সম্পদে যাকাত ফরয হয়। সব ধরনের অর্থ সম্পদেরই নিসাব নির্ধারিত আছে এবং কি পরিমাণ যাকাত দিতে হবে তাও নির্ধারিত আছে। উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত পশুর যাকাত দিতে হবে। এগুলোর নিসাব এবং যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করা আছে। সোনা রূপার যাকাত দিতে হবে। সোনা রূপা যদি সোনারূপা আকারে থাকে সে ক্ষেত্রেও যাকাত দিতে হবে। মুদ্রা আকারে থাকলেও যাকাত দিতে হবে। এ ক্ষেত্রেও নিসাব এবং যাকাতের পরিমাণ নির্ধারিত আছে। ব্যবসায় পণ্যের যাকাত দিতে হবে। খনিজ সম্পদের যাকাত দিতে হবে। প্রোথিত সম্পদের যাকাত দিতে হবে। ফল ফসলের যাকাত দিতে হবে। সকল ক্ষেত্রেই নিসাব এবং যাকাতের পরিমাণ নির্ধারিত আছে।

এসব অর্থ সম্পদের নিসাব এবং যাকাতের পরিমাণ ফিক্‌হের গ্রন্থাবলীতে সবিস্তারে লিপিবদ্ধ আছে। এখানে আমরা যাকাতের সেসব বিধিবিধান এবং মসলা মাসায়েল নিয়েই আলোচনা করবো, যেগুলো বিশেষভাবে মহিলাদের সাথে সম্পর্কিত। যেমন—অলংকারের যাকাত।

www.bjilibrary.com

অলংকারের যাকাত না দেবার পরিণতি

এ প্রসংগে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করি ঃ

(১) "আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। একবার রাসূলুল্লাহর কাছে এক মহিলা এলো। তার সাথে তার মেয়েও ছিলো। মেয়েটির দুই হাতে ছিলো সোনার দুইটি বলয় (বালা)। তাকে দেখে নবী করীম (সা) মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

أتعطين زكوة هذا ؟

"তোমরা কি এই অলংকারের যাকাত দাও ?"

মহিলাটি বললো ঃ জি–না।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

أيسرك ان يسورك الله بهمايوم القيامة سوارين من النار ؟

"তোমরা কি এটা পসন্দ করবে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এ চুঁড়ি দুইটির কারণে তোমাদেরকে দুইটি আগুনের চুঁড়ি পরাবেন ?"

বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে মহিলাটি বলয়গুলো কেটে ফেললো। অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে, খুলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে রেখে নিবেদন করলো ঃ "এ বলয় আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের জন্যে নজরানা হিসেবে পেশ করছি।"

হাদীসটি সুনানে আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, জামে তিরমিযী এবং দারুকুতনী প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে।

খাত্তাবী বলেছেন ঃ

أيسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار

"তোমরা কি এটা পসন্দ করবে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এই চুঁড়ি দুইটির কারণে তোমাদেরকে দুইটি আগুনের চুঁড়ি পরাবেন ?"

–এই হাদীসটি মূলত পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটিরই তাফসীর ঃ

يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ – (التوبة –٣٥)

"একদিন অবশ্যি আসবে, যখন এই সোনা রূপার উপর জাহান্নামের আগুন উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে ঐলোকদের কপাল, পার্শ্বদেশ এবং পিঠে চিহ্ন দেয়া হবে।" [আত তাওবা ঃ ৩৫]

(২) সুনানে নাসায়ীতে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার দু'জন মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়। তাদের দু'জনের হাতে ছিলো সোনার দু'টি বলয়। তাদের দেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তোমরা কি এগুলোর যাকাত প্রদান করো ?" তারা বললো ঃ 'জী-না।' তখন নবী করীম (সা) বললেন ঃ

أتحبان ان يسور كما الله بسوارين من نار؟

"তোমরা কি এটা পসন্দ করো যে, আল্লাহ তোমাদের দু'জনকে দু'টি আগুনের চুঁড়ি পরান ?"

তারা বলল ঃ 'জী-না' আমরা কিছুতেই চাইনা।

তখন নবী করীম (সা) বললেন ঃ

فاديا ذكوتة

"তাহলে এগুলোর যাকাত দিয়ে দেবে।"

(৩) আবু দাউদ, দারুকুতনী এবং বায়হাকী উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে এসে আমার হাতে সোনার আংটি দেখতে পান। তিনি জানতে চান ঃ

ما هذا يا عائشة ؟

'আয়েশা ! এ কী ?'

আমি বললাম ঃ 'এটি আমি তৈরী করিয়েছি, যাতে এটি পরে আপনার জন্যে সাজসজ্জা করতে পারি।' তিনি বললেন ঃ

أتودين ذكوتهن ؟

'তুমি কি এটির যাকাত প্রদান করো ?'

www.bjilibrary.com

আমি বললাম ঃ জী–না। অথবা আল্লাহ আমার মুখ দিয়ে তখন যা বলিয়েছিলেন, আমি তাঁকে তাই বললাম। তখন তিনি বললেন ঃ

هى حسبك من النار

"তোমার জাহান্নামে যাবার জন্যে এটিই যথেষ্ট।'"

এ হাদীসটির ব্যাখ্যায় বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল খাত্তাবী লিখেছেন ঃ

এ কথা স্পষ্ট যে, কেবল একটি আংটির ওজন নেসাব পরিমাণ হতে পারেনা। এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো, হে আয়েশা ! তোমার কাছে এ আংটি ছাড়াও আরো যেসব অলংকার আছে, সবগুলো একত্র করে অলংকারের যাকাত পরিশোধ করো।

(৪) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বিশুদ্ধ সূত্রে আসমা বিনতে ইয়াযীদের (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আসমা বলেন, একবার আমি এবং আমার খালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হই। এ সময় আমাদের হাতে ছিলো সোনার চুঁড়ি। তিনি আমাদের নিকট জানতে চাইলেন ঃ

أتعطيان زكوته ؟

'তোমরা কি এগুলোর যাকাত প্রদান করো ?'

আমরা বললাম ঃ 'জী–না।'

তখন তিনি বললেন ঃ

(أما تخا فان ان يسور كما الله اسورة من نار ؟ اديا زكوته)

"এজন্যে যে আল্লাহ তোমাদেরকে আগুনের চুড়ি পরাবেন, তোমাদের কি সেই ভয় নেই ? এগুলোর যাকাত দিয়ে দাও।"

মহিলাদের অলংকারের যাকাত

মহিলারা সোনারূপার যেসব অলংকার পরে, সেগুলোর যাকাত দিতে হবে কি হবেনা ? আর দিতে হলেইবা কখন দিবে, সে বিষয়ে বিভিন্ন মযহাবের ইমাম ও ফকীহগণের মতভেদ আছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন মযহাবের মতামত নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

www.bjilibrary.com

*** হানাফী মযহাব ঃ** ইমাম আবু হানীফা (র) এবং ইমাম ইবনে হাযমের (র) মতে, সোনারূপার অলংকারের ওজন যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তবে যাকাত দেয়া ওয়াজিব। উভয় ইমামই তাদের মতের সপক্ষে দলিল পেশ করেছেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকে। আমরা একটু আগেই এ প্রসংগে যে হাদীসগুলো উল্লেখ করেছি, এই সম্মানিত ইমামদ্বয় সেগুলোকেই নিজেদের বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। উপরোক্ত হাদীসগুলোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মু'মিনীন আয়েশাকে (রা) তাঁর আংটির যাকাত দিতে বলেছেন। আসমা এবং তাঁর খালাকে (রা) তাদের সোনার বলয়ের যাকাত দিতে বলেছেন। অপর দু'জন মহিলাকেও তাদের সোনার চুঁড়ির যাকাত দিতে বলেছেন।

*** মালেকী মযহাব ঃ** মালেকী মযহাবের ইমাম ও ফকীহগণের মতে, মহিলাদের সোনারূপার অলংকারের যাকাত দেয়া ওয়াজিব নয়। তবে নিম্নোক্ত অবস্থাসমূহে যাকাত দিতে হবে ঃ

১. অলংকার যদি ভেংগে চুরে গিয়ে থাকে এবং নতুনভাবে গড়া ছাড়া আর তার আসল অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব না হয়।

২. কিংবা অলংকার ভেংগে চুরে গিয়েছে এবং নতুনভাবে গড়ানো ছাড়া সেটা আর ব্যবহার যোগ্যও হবেনা, কিন্তু স্বত্ত্বাধিকারিণী নতুন করে গড়াবার ইচ্ছা রাখেনা।

৩. অলংকার আছে, তবে তা পরার জন্যে নয়, বরং দুরাবস্থায় কাজে লাগানোর জন্যে যত্ন করে তুলে রাখা হয়েছে।

৪. যদি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে অলংকার বানিয়ে রাখা হয়। যেমন, যদি মেয়ে হয় তবে তার কাজে লাগবে।

৫. যদি ছেলের বিয়েতে মোহরানা হিসেবে দেয়ার নিয়তে অলংকার কিনে বা গড়িয়ে রাখে।

৬. লাভ করা বা ব্যবসা করার নিয়েতে অলংকার কিনে রাখলে।

মালেকী মযহাবের মতে উপরোক্ত সকল অবস্থায় অলংকারের যাকাত দেয়া ওয়াজিব।

শাফেয়ী মযহাব ঃ শাফেয়ী মযহাবের মতে, বছর পূরা হলেও কোনো মহিলার জন্যে বৈধ অলংকারের যাকাত দেয়া ওয়াজিব নয়। তবে শর্ত হলো

www.bjilibrary.com

সে যে ঐ অলংকারের মালিক সেটা তার জানা থাকতে হবে। কিন্তু কোনো মহিলা অলংকারের মালিক হওয়া সত্ত্বেও সে যে মালিক, তা যদি তার জানা না থাকে তবে পরে জানলে তার যাকাত দিতে হবে। যেমন কোনো মহিলা ওয়ারিশ হিসেবে নিসাব পরিমাণ অলংকারের ভাগ পেলো, কিন্তু সে এক বছরের মধ্যে জানতে পারে নাই যে, সে এই অলংকারের মালিক হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এই অলংকারের বিগত বছরের যাকাত দিতে হবে।

একই ভাবে কোনো মহিলার যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত অলংকার থাকে, যাকে 'অপচয়' বলা চলে, তবে এই অতিরিক্ত অলংকারের যাকাত দেয়া ওয়াজিব।

শাফেয়ীদের মতে এমন কণ্ঠহারের যাকাত দেয়া ওয়াজিব যা সোনার তৈরী। কিন্তু শর্ত হলো যে শিকলে তা গাঁথা হয়েছে তা সোনার হোক কিংবা তামার হোক তাতে যেনো আটকানো না থাকে। তবে কণ্ঠহারের শিকল সোনার হোক কিংবা তামার, সেটার যাকাত দিতে হবেনা। অলংকার যদি ভেংগে যায় আর সে অলংকারের মালিক যদি সেটা মেরামত করাবার ইচ্ছা রাখে এবং গালানো ছাড়াই মেরামত করা সম্ভব হয়, তবে এরূপ ভাংগা অলংকারের যাকাত দিতে হবেনা। কিন্তু মেরামত করার নিয়ত না থাকলে এবং গালানো ছাড়া ঠিক করা না গেলে যাকাত দিতে হবে।

*** হাম্বলী মযহাব ঃ** হাম্বলী মযহাবের মতে, অলংকার যদি ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে, কিংবা ধার কর্য দেয়ার উদ্দেশ্যে তৈরী করানো হয় এবং যার অধিকারে আছে তার জন্যে তা ব্যবহার করাও বৈধ হয়। তবে সেই অলংকারের যাকাত নেই। কিন্তু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নাহলেও যাকাত দিতে হবে। অলংকার যদি ভেংগে যাওয়া সত্ত্বেও পরা যায়, তবে তার বিধান ভাল অলংকারের মতোই। অর্থাৎ যাকাত দিতে হবেনা। কিন্তু ভাংগা অলংকার যদি পরার মতো না হয় এবং গালানো ছাড়া যদি সেটা ঠিক করা না যায়, তবে তার যাকাত দিতে হবে। তবে গালানো ছাড়াই যদি মেরামত করা যায় এবং অধিকারিনী যদি মেরামত করার ইচ্ছা রাখেন, তবে যাকাত দিতে হবেনা।

চার মযহাবের মতামতের পর্যালোচনা

হানাফী মযহাবের মত তো সুস্পষ্ট। তাদের মতে, মহিলাদের অলংকার এবং মহিলার অধিকারে থাকা সোনারূপা নিসাব পরিমাণ হলেই সেগুলোর যাকাত দিতে হবে।

www.bjilibrary.com

কিন্তু বাকী তিন মযহাবের মতে, পরিমাণ যাই হোক না কেন, মহিলাদের অলংকারের যাকাত ওয়াজিব নয়। এ প্রসংগে তাদের দলিল নিম্নরূপ ঃ

১. বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, আসমা বিনতে আবু বকর নিজের কন্যাকে সোনার অলংকার পরাতেন, যার মূল্য ছিলো প্রায় পঞ্চাশ হাজার দিরহাম। তিনি এ অলংকারের যাকাত দিতেননা।

২. ইমাম মালিকের মুআত্তা গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে, আবদুর রহমান ইবনে কাসিম তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর ভাইয়ের কয়েকটি এতীম কন্যা ছিলো। তিনি ওদের অভিভাবকও ছিলেন। মেয়েগুলোর বেশ কিছু অলংকার ছিলো। কিন্তু আয়েশা (রা) সেই অলংকারগুলোর যাকাত প্রদান করতেননা।

মুআত্তা গ্রন্থেই বর্ণিত হয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাঁর কন্যা এবং দাসীদেরকে সোনার অলংকার পরাতেন। কিন্তু সেগুলোর যাকাত দিতেননা। তাঁর প্রত্যেক কন্যার অলংকারের মূল্য ছিলো চারশ দিনার।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল খাত্তাবী বলেছেন, যেসব আলিম মহিলাদের অলংকারের যাকাত প্রদান করা ওয়াজিব মনে করেন, কুরআন মজীদ থেকে স্পষ্টত তাদের মতের সপক্ষেই সাক্ষ্য পাওয়া যায়। তাছাড়া মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস এবং সাহাবায়ে কিরামের বাণী থেকেও তাদের মতের সপক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়।

পক্ষান্তরে যেসব ওলামা মনে করেন অলংকারের যাকাত দেয়া ওয়াজিব নয়, তারা মূলত ইজতিহাদ এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে মত প্রতিষ্ঠা করেছেন। কোনো কোনো সাহাবীর আমল থেকে তাদের মতের সপক্ষেও সমর্থন পাওয়া যায়।

আমরা মনে করি, মহিলাদের অলংকারের যাকাত দিয়ে দেয়াই সতর্কতার দাবী।

এসব মতভেদ কেবল সেইসব অলংকারের ক্ষেত্রে যেগুলো ব্যবহার করা মহিলাদের জন্যে বৈধ। কিন্তু যেগুলো ব্যবহার করা মহিলাদের জন্যে বৈধ নয়, সেগুলোর যাকাত দেয়া ওয়াজিব। পুরুষদের সাজ সজ্জার সামগ্রী মহিলাদের জন্যে হারাম। যেমন তলোয়ারের সাজ সজ্জার সোনারূপা ইত্যাদি। সোনা রূপার বরতনেরও এই একই হুকুম। অর্থাৎ এগুলোরও যাকাত দিতে হবে।[১]

১. শাইখ সাইয়েদ সাবেক ঃ ফিকহুস সুন্নাহ, ১ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা। বৈরুতের দারুল কুতুব আরবী সংস্করণ।

www.bjilibrary.com

আলোচনার সারকথা

মহিলাদের অলংকারের যাকাত প্রসংগে যেসব হাদীস, সাহাবায়ে কিরামের বাণী এবং মুজতাহিদ ইমামগণের মতামত বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোর উপর সামগ্রিকভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে যে ধারণা লাভ করা যায়, তাহলো সাজ সজ্জা হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মহিলাদের কাছে যেসব অলংকার থাকে, পরিমাণ যা-ই হোকনা কেন, সেগুলোর উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না। কারণ এগুলো তাদের প্রকৃত প্রয়োজনের জিনিষ।

কিন্তু অলংকার যদি সঞ্চয় হিসেবে জমা করে রাখা হয়, কিংবা নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করবার জন্যে যত্ন করে তুলে রাখা হয়, তবে সেসব অলংকারের হুকুম হলো নগদ অর্থের মতো। কারণ এমতাবস্থায় সেগুলো প্রকৃত প্রয়োজন বা সাজ সৌন্দর্য হিসাবে ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত হয়না। সুতরাং এসব অলংকারের উপর যাকাত ওয়াজিব হয়। এ ধরনের অলংকারের যাকাত দিতে হবে।

মহিলাদের অলংকারের যাকাত প্রসংগে এই হলো ইমামগণের ফতোয়া। তবে এটা হলো অবকাশ (রুখসত)। যেসব মহিলা তাদের ব্যবহারের অলংকারের যাকাত দিতে চাননা, তারা এ ফতোয়ার উপর আমল করতে পারেন।

কিন্তু সতর্কতা ও তাকওয়ার দাবী হলো, ব্যবহারের অলংকার যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তবে ওয়াজিব মনে করে যাকাত দিয়ে দেয়া উচিত। কুরআন হাদীসের বক্তব্য এবং সাহাবায়ে কিরামের আমল থেকে বাহ্যত এরূপ ধারণাই পাওয়া যায়। ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম ইবনে হাযমও ব্যবহারের অলংকারের যাকাত দেয়া ওয়াজিব মনে করেন।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, অলংকার যদি নিজে ব্যবহার করা বা অপর কোনো মহিলাকে ব্যবহারের জন্যে ধার দেয়ার উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা হয়, তবে সেরূপ অলংকারের যাকাত জীবনে একবার প্রদান করাই যথেষ্ট। [১]

যেসব অলংকারের যাকাত হয়না

সকল ইমাম মুজতাহিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, হীরা জহরতের তৈরী অলংকারের যাকাত হয়না। যেমন ঃ মুক্তা, মারজান, জমরদ, পান্না প্রভৃতি মূল্যবান পাথর। এগুলোর তৈরী অলংকারের যাকাত দিতে হবেনা।

---

১. ইমাম শা'রানী ঃ কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খন্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

তবে কেউ যদি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে এগুলো সংগ্রহ করে, তবে যাকাত দিতে হবে।[১]

স্বর্ণের নিসাব

সোনার নিসাব বিশ মিসকাল সোনা। আধুনিককালের ওজনে বিশ মিসকাল ২০০.৮৯ গ্রামের সমতুল্য।

রৌপ্যের নিসাব

রূপার নিসাব দু'শ দিরহাম। আধুনিককালের হিসাবে এর ওজন ৬২৪ গ্রাম।

সোনা রূপার নিসাবের দলিল

সোনা রূপার নিসাব নির্ণয় করা হয়েছে একটি হাদীসের ভিত্তিতে। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اذ كانت لك مأتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهمُ ، وليس عليك شئ - يعنى فى الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً فاذا كانت لك عشرون دينارا و حال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك وليس فى مال زكوة حتى يحول عليه الحول -

"যখন তোমার কাছে দু'শ দিরহাম থাকবে এবং এ থাকার মেয়াদ এক বছর পূর্ণ হবে, তখন সেগুলো থেকে পাঁচ দিরহাম যাকাত দেবে। এছাড়া আর কিছু তোমার উপর ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে না, যদি তোমার কাছে বিশ দীনার পূর্ণ না হয়। যখন তোমার কাছে বিশ দীনার পূর্ণ হবে এবং এক বছর মেয়াদ অতিক্রান্ত হবে, তখন তা থেকে অর্ধ দীনার যাকাত দিতে হবে। এর চাইতে বেশী হলে এই হিসেবে যাকাত দিয়ে যেতে হবে। কোনো অর্থ সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয়না, যদি তার বয়স এক বছর পূর্ণ না হয়।"

---

১. শাইখ সাইয়েদ সাবেক ঃ ফিকহুস সুন্নাহ, প্রথম খন্ড, যাকাত অধ্যায়, ৩৪১-৩৪২ পৃষ্ঠা, বৈরুত সংস্করণ।

www.bjilibrary.com

হাদীসটি সুনানে আবু দাউদ এবং বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী এটিকে সহীহ হাদীস বলেছেন। হাফিয ইবনে হাজর আসকালানী বলেছেন হাদীসটি হাসান।

এক দীনার এক মিসকালের সমতুল্য। মিসকালকে গ্রামের ওজনে হিসাব করার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ আছে, যা নিম্নে আলোচিত হলো ঃ

শাইখ মাহমুদ খাত্তাব তাঁর 'আদদীনুল খালিস' গ্রন্থে লিখেছেন মিসকাল এবং দীনার ৪০.৪৪ গ্রামের সমতুল্য। সাইয়েদ সাবেক তাঁর ফিকহুস সুন্নাতে লিখেছেন, ২০ দীনার ২৮ মিসরী দিরহামের সমতুল্য। আর হাদীসে যে দিরহামের কথা উল্লেখ হয়েছে, তার এক দিরহাম = ৩.১২ গ্রাম। অর্থাৎ দুইশ দিরহামে ৬২৪ গ্রাম।

যাকাতের হার

সোনা রূপার যাকাত শতকরা আড়াই বা প্রতি চল্লিশে এক ভাগ। একইভাবে ব্যবসায়ের পুঁজি, ধাতব মুদ্রা, কাগজের নোট এবং অলংকারের যাকাত শতকরা আড়াই হারে দিতে হবে।

যাকাত যে সোনা রূপা এবং ব্যবসায়ের মালই দিতে হবে এমনটি জরুরী নয়। বরং এগুলোর বাজার মূল্য হিসাব করে শতকরা আড়াই হারে যাকাত দিলেও চলবে।

কারো কাছে যদি কিছু সোনা, কিছু রূপা, কিছু নগদ বা জমা টাকা পয়সা এবং কিছু ব্যবসায়ের মাল থাকে তবে তার ব্যাপারে বিধান হলো, সে সবগুলোর মূল্য হিসাব করে দেখবে। যদি সবগুলোর একত্র মূল্য সোনা বা রূপার নিসাব পরিমাণ হয় তবে তাকে যাকাত দিতে হবে। আর সবগুলোর মূল্য মিলেও যদি সোনার বা রূপার নিসাব পরিমাণ না হয়, তবে তাকে যাকাত দিতে হবেনা।

গৃহপালিত পশুর যাকাত দিতে হবে। এগুলোর যাকাতের হার নিম্নরূপ ঃ

৩০টি গরু মহিষের জন্যে পূর্ণ এক বছরের একটি গরু-মহিষের বাচুর যাকাত দিতে হবে। ৪০টি ভেড়া-ছাগলের জন্যে একটি ভেড়া-ছাগল যাকাত দিতে হবে।

www.bjilibrary.com

জমির উৎপন্ন ফসলেরও যাকাত দিতে হবে। কারো কারো মতে ফসলের যাকাতের নিসাব নেই। অবশ্য ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেয়ীর মতে ফসলের নিসাব হলো 'বিশ ওসাক' (প্রায় ত্রিশ মণ)।

স্বাভাবিক বর্ষা বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন ফসলের যাকাত হলো উশর। উশর মানে দশভাগের একভাগ।

কৃত্রিম সেচের মাধ্যমে উৎপন্ন ফসলের যাকাত হলো ইশরীন। ইশরীন মানে বিশভাগের একভাগ।

ফসলের যাকাত 'উশর' হিসাবে বেশী পরিচিত।

[সোনা রূপা ও কাগুজে নোটের যাকাত সম্পর্কে জাস্টিস মালিক গোলাম আলী একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন তরজমানুল কুরআন পত্রিকায়। আধুনিককালের লোকদের মনে এ ধরনের প্রশ্ন জাগা অস্বাভাবিক নয়। এ বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে আমরা এখানে সেই প্রশ্নোত্তরটি উদ্ধৃত করে দিলাম।—অনুবাদক]

নগদ পুঁজির যাকাত ও তার নিসাব

প্রশ্ন ঃ যাকাত সম্পর্কে এবং বিশেষভাবে নগদ অর্থের যাকাত সম্পর্কে আমার মনে কিছু সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হয়েছে, যার কোনো সন্তোষজনক জবাব পাইনি। তাই সেগুলো নিরসনের জন্যে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আমার আপত্তিগুলোর সারসংক্ষেপ হলো, আজকাল সোনা রূপার আকারে কোন নিসাবধারীর হাতে নগদ অর্থ থাকেনা। বলা হয়, নগদ অর্থের বিনিময়ে সোনা কোষাগারে রক্ষিত আছে। কিন্তু আমাদের হাতে মুদ্রা নোট ছাড়া আর কিছু থাকেনা এবং চাহিবামাত্র প্রদানের ওয়াদা লেখা থাকে। প্রশ্ন হলো, এইসব কাগুজে মুদ্রার ওপর কিসের ভিত্তিতে যাকাত আরোপ করা হবে? তবু যদি ধরে নেই যে, এসব কাগুজে মুদ্রাকে সোনা রূপার সমতুল্য মেনে নিয়ে তার ওপর যাকাত ফরয হবে, তাহলে দ্বিতীয় প্রশ্ন জাগে যে, এসব কাগুজে নোটের নিসাব সোনার ভিত্তিতে ধার্য হবে, না রূপার ভিত্তিতে? উপমহাদেশের আলেম সমাজ সাধারণত নোটগুলোকে রূপার সমতুল্য মনে করেন এবং রূপার নিসাব পঞ্চাশ টাকাকে নগদ অর্থের নিসাব (ন্যূনতম যাকাতযোগ্য পরিমাণ) গণ্য করেন। সোনাকে বাদ দিয়ে মুদ্রাকে রূপার সমকক্ষ আখ্যায়িত করা আমাদের আলেমদের উদ্ভাবিত পদ্ধতি না পূর্বতন আলেমদেরও এরূপ ফতোয়া ছিল,

www.bjilibrary.com

আমার জানা নেই। মুদ্রা যদি রূপার হতো অথবা তাতে রূপার উপকরণ বেশী থাকতো, তাহলেও একে রূপার অধীন আনা ঠিক হতো। কিন্তু রূপাই যখন উধাও হয়ে গেছে, তখন মুদ্রাকে রূপার সাথে যুক্ত করার যুক্তি দুর্বোধ্য। এ ক্ষেত্রে রূপার পরিবর্তে সোনাকে নিসাবের ভিত্তি ধরলে ক্ষতি কি ?

জবাব ঃ নগদ অর্থ সোনা রূপার পরিবর্তে কাগুজে নোটে রূপান্তরিত হলে তার ওপর যাকাত আরোপিত হওয়া সন্দেহজনক হয়ে পড়বে—এ বক্তব্য এক অর্থহীন বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছু নয়। এটা একটা স্বীকৃত সত্য কথা যে, সোনা ও রূপার ওপর যাকাত আরোপিত হওয়ার মূল কারণ হলো, তার মাধ্যমে মানুষ নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত ও সঞ্চিত সম্পদ যেমন সংরক্ষণ করতে পারে এবং যখন যেখানে ইচ্ছে তা দ্বারা নিজের কিংবা অন্যের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। পবিত্র কুরআনের ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا......-

এই আয়াতটিতে সোনা ও রূপা সম্পর্কে يَكْنِزُوْنَ (জমা করে রাখে) এবং يُنْفِقُوْنَ (খরচ করে) এ শব্দ দু'টি সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এই দু'টো জিনিসকে পুঁজির আকারে সঞ্চিত করেও রাখা যায় এবং তার দ্বারা জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনও পূরণ করা যায়। দীর্ঘকাল ধরে সোনা রূপা বা সোনা রূপার তৈরী মুদ্রার সাহায্যে এই দু'টো কাজ সম্পন্ন হয়ে এসেছে। কিন্তু আজ কাগুজে মুদ্রা তার স্থান দখল করেছে। আপনি তা সঞ্চয়ও করতে পারেন, আবার তা খরচ করে আগের কালে যেসব প্রয়োজন পূরণ করতে সোনা রূপার দরকার হতো, সেসব প্রয়োজনও পূরণ করতে পারেন। আজ আপনি কাগুজে নোট নিয়ে যদি কোন দোকানদারের কাছে যান অথবা এমন কোন লোককে দেন যার টাকার প্রয়োজন, তবে সে একথা বলবেনা যে, এতো শুধু কাগুজে ওয়াদা, আমাকে এর বদলে সোনা দাও কিংবা রূপা দাও। বরঞ্চ কাগুজে নোটের পরিবর্তে যদি তাকে সোনা বা রূপা দিতে চান, তাহলে সে হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। মোদ্দাকথা, যে মুদ্রার মূল্যমান আছে এবং বাজারে চালু আছে, তা সর্বোতভাবেই সোনা ও রূপার স্থলাভিষিক্ত, চাই সে মুদ্রা লোহার হোক, চামড়ার হোক কিংবা কাগজের হোক। সোনা রূপার ওপরও যেমন যাকাত ফরয,এই কাগুজে নোটের ওপর ঠিক তেমনিভাবেই তা ফরয।

এ প্রশ্ন অবশ্য ভেবে দেখার মত যে, যে মুদ্রা নোট সোনা বা রূপা দিয়ে তৈরী নয় তার ক্ষেত্রে যাকাতের নিসাব কিভাবে নির্ণয় করা হবে। একথা তো

www.bjilibrary.com

সুবিদিত যে, এ ধরনের মুদ্রা যেহেতু সোনা ও রূপার পর্যায়ভুক্ত, তাই নিসাবের ব্যাপারেও তাকে সোনা ও রূপার সমতুল্যই মনে করতে হবে। মুসলিম ফকীহদের সিদ্ধান্ত হলো, যে মুদ্রা সোনার তৈরী অথবা অন্ততপক্ষে তাতে সোনার উপাদান বেশী, তার নিসাব তো সোনার নিসাবেরই সমান অর্থাৎ ২০ মিসকাল বা ২০ দীনার (সাড়ে সাত ভরি) হবে, আর অন্যান্য যাবতীয় মুদ্রায় রূপার নিসাব অর্থাৎ ২০০ দিরহাম বা তার সম ওজনের রূপার মূল্যের সমপরিমাণ ৫২.৫০ তোলা হবে। এটা আমাদের ফকীহগণের বিচক্ষণতা, সতর্কতা ও ইজতিহাদী প্রজ্ঞার নিদর্শন যে, সোনার ক্ষেত্রে তো তারা বিভিন্ন হাদীসে যে সোনার নিসাব উল্লিখিত হয়েছে, সেটাই গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সোনা ছাড়া আর যত সম্পদ রয়েছে, যার নিসাব কুরআন বা হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। সেগুলোকে রূপার সমতুল্য ধরেছেন। সোনার তৈরী নয় এমন মুদ্রাও এর অন্তর্ভুক্ত। ফাতওয়ায়ে আলমগীরীতে বলা হয়েছে ঃ

"দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) যদি মিশ্র ধাতুর তৈরী হয় কিন্তু রূপাই তার প্রধান উপাদান হয় তবে তাকে নির্ভেজাল রূপার মুদ্রা ধরা হবে। অর্থাৎ তাতে ওজনের দিক দিয়ে রূপার যাকাত ধার্য হবে। আর যদি ভেজাল উপাদানের প্রাধান্য থাকে, তাহলে তা রূপার মত হবেনা। সুতরাং দেখতে হবে, তা যদি চালু মুদ্রা হয় অথবা তা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তবে তার মূল্য ধর্তব্য হবে। যদি তার মূল্য যাকাতযোগ্য দিরহামের সর্বনিম্ন পরিমাণের সমান হয়ে যায়, তাহলে এসব ভেজাল মুদ্রারও যাকাত দিতে হবে।"

কাগুজে নোটসহ আজকালকার সকল চালু মুদ্রা, ভেজাল রৌপ্য মুদ্রার সংজ্ঞার আওতায় আসতে পারে। তাই তার আইনানুগ মূল্যের বিচারে তার ওপর যাকাত ধার্য হবে এবং তার নিসাব হবে রূপার নিসাবের মত। এগুলোতে সোনার পরিবর্তে রূপার নিসাব গ্রহণ করার একাধিক যুক্তি রয়েছে। প্রথম যুক্তি হলো, বাণিজ্যিক পণ্যে যাকাতের নিসাব যে ২০০ দিরহাম রূপার নিসাবের সমপরিমাণ, সে কথা বিভিন্ন হাদীস ও সাহাবীদের আচরণ থেকে জানা গেছে। আর নগদ অর্থ ও বাণিজ্যিক পণ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ জন্যে বাণিজ্যিক পণ্যের নিসাবে যদি সোনার পরিবর্তে রূপাকে মানদণ্ড ধরা হয়, তাহলে নগদ অর্থের ক্ষেত্রে সেটাই আপনাআপনি প্রযোজ্য হবে। দ্বিতীয় যুক্তি হলো, সনদ ও বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে রূপার নিসাব সম্বলিত হাদীসগুলোর মান অত্যন্ত উঁচু। এমনকি বুখারী ও মুসলিমে যেখানে পাঁচ উকিয়ার নিসাবের

www.bjilibrary.com

উল্লেখ রয়েছে। সেখানেও হাদীস বিশারদদের সর্বসম্মত রায় এই যে, পাঁচ উকিয়া দ্বারা ২০০ দিরহাম বুঝানো হয়েছে। যে হাদীসগুলোতে সোনার নিসাব বর্ণিত হয়েছে, তাতে এ বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। আরো একটা যুক্তি এই যে, যেসব জিনিসের নিসাব নির্ণিত হয়নি এবং সোনা ও রূপার উভয়ের সাথে তার সাদৃশ্য রয়েছে, তাতে রূপাকে নিসাব নির্ণয়ের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা এ জন্যে উত্তম বিবেচিত হয় যে, তা দ্বারা যাকাতের হকদাররা অধিকতর উপকৃত হবে।

মোদ্দাকথা, ইমাম ও ফকীহগণ যে নগদ অর্থে যাকাত দেয়া জরুরী বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এর নিসাব নির্ণয়ে সোনার পরিবর্তে রূপাকে মানদণ্ড ধরেছেন। এর সপক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি ও প্রমাণ রয়েছে এবং এটা উপমহাদেশের আলেমদের মনগড়া কোন ব্যাপার নয়। উপমহাদেশের আলেমগণ স্থায়ীভাবে ৫০ রূপিয়া নগদ অর্থের যাকাতের নিসাব ধার্য করেছেন—একথা ঠিক নয়। এ উক্তি ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত। প্রকৃত ব্যাপার হলো, যে যুগে আলেমগণ এই নিসাব ধার্য করেছিলেন, তখন রূপিয়া ছিল রূপার তৈরী মুদ্রা, অথবা রূপা তার প্রধান উপাদান ছিল। সেই মুদ্রার ওজন ছিল এক তোলা। এ হিসেবে তৎকালে ৫০ বা ৫২ রূপিয়া প্রায় ২০০ দিরহাম (৫২.৫০ তোলা) সম ওজনের ও সমমূল্যের ছিল। তাই জনসাধারণ যাতে সহজে বুঝতে পারে, সে জন্যে এভাবে মাসয়ালা প্রচার করা হলো যে, ৫০ রূপিয়ার ওপর যাকাত হবে। পরবর্তীকালে পরিস্থিতি একদম পাল্টে গেছে। এখন সেই রূপার মুদ্রাও নেই। পঞ্চাশ তোলা রূপার মূল্যও ৫০ রূপিয়া নেই। তাই এখন নগদ অর্থের নিসাবে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার প্রচলিত বাজার মূল্যকে মানদণ্ড ধরতে হবে এবং তা প্রতিদিনের সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানা যেতে পারে। যার কাছে সারা বছর এই পরিমাণ নগদ অর্থ থাকবে সে যাকাত দেবে। [তরজমানুল কুরআন, মার্চ, ১৯৬৮]

যাকাত কাদের দেবেন ?[১]

কুরআন মজীদে যাকাত লাভের আট ধরনের হকদারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা তাওবার ষাট নম্বর আয়াতে তাদের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে নিম্নরূপঃ

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا

১. বিষয়বস্তু সামঞ্জস্যের কারণে এই উপশিরোনামের অধীনের বক্তব্যটি মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর 'মাআশিয়াতে ইসলাম' গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।—অনুবাদক

www.bjilibrary.com

وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ -

এই সাদাকাগুলো (যাকাত) মূলত ফকীর মিসকিনদের জন্যে। আর সেসব লোকদের জন্যে যারা সাদাকা সংক্রান্ত কর্মে নিযুক্ত হয়েছে। তাছাড়া ঐসব লোকদের জন্যে যাদের মনজয় করা উদ্দেশ্য। এছাড়া গরদান মুক্ত করা, ঋণগ্রস্তদের সাহায্য করা, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের সৌজন্যে ব্যয় করার জন্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি অপরিহার্য বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী এবং প্রজ্ঞাময়।"

[সূরা আত তাওবা ঃ ৬০]

এ আয়াতে যাকাতের খাত বর্ণনা করা হয়েছে। সমাজের যেসব লোক সাহায্যের মুখাপেক্ষী এখানে সবিস্তারে তাদের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এ অর্থ দ্বারা অন্য যেসব কাজ করা যেতে পারে সেগুলোও স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। এভাবে এ আয়াত মূলত ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পলিসির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছে। এখানে যেসব খাতের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ

১. ফকীর ঃ ফকীর মানে এমন প্রতিটি লোক, যে স্বীয় জীবিকার ব্যাপারে অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। এ শব্দটি সাধারণভাবে সকল মুখাপেক্ষী লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শারীরিক বৈকল্যের কারণে হোক, কিংবা বার্ধক্যজনিত কারণে স্থায়ীভাবে সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ার কারণে হোক, অথবা এমন ব্যক্তি কোনো কারণে যে সাময়িকভাবে সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে। তবে সাহায্য-সহযোগিতা পেলে পুনরায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, এ ধরনের সকল মুখাপেক্ষী লোকের জন্যে ফকীর শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন এতীম, বিধবা, বেকার এবং এমন লোক যারা সাময়িকভাবে দুর্ঘটনা কবলিত হয়েছে।

২. মিসকিন ঃ যাদের মধ্যে অভাব, দৈন্যতা এবং ভাগ্যাহত অবস্থা পাওয়া যায় এমনসব লোকই মিসকিন। এদিক থেকে সাধারণ মুখাপেক্ষী লোকদের তুলনায় অধিকতর শোচনীয় অবস্থার লোকেরাই মিসকিন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ শব্দটির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিশেষভাবে এমন লোকদের সাহায্যলাভের অধিকারী গণ্য করেছেন, যারা

www.bjilibrary.com

নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী উপায় উপকরণ লাভ করতে পারছে না এবং ঘোরতর শোচনীয় অবস্থায় নিমজ্জিত আছে। কিন্তু আত্মসম্মানবোধের কারণে তারা কারো কাছে হাত পাততেও পারছেনা আবার তাদের বাহ্যিক পজিশনও এমন নয় যে, অভাবী মনে করে লোকেরা তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াবে। হাদীসে মিসকিনের পরিচয় এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ

اَلْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ لاَ يَجِدُ غِنًى وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فيتصدق عَلَيْهَا وَلاَ يقوم فَيَسْأَلُ النَّاسَ -

"মিসকিন হলো সে, যে নিজের প্রয়োজন মেটাবার মতো অর্থ সম্পদ পায়না। তাকে যে সাহায্য করতে হবে তাও বুঝা যায় না এবং প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে মানুষের কাছে চাইতেও পারেনা।"

আসলে এরা হলেন সম্ভ্রান্ত মানুষ, তবে গরীব অসচ্ছল। সমাজের সৎলোকদের কর্তব্য নিজেদের আশেপাশে এ ধরনের যেসব লোক আছেন তাদের খোঁজ খবর নেয়া।

৩. আমেলীন ঃ অর্থাৎ সেইসব লোক যারা যাকাত আদায় করা, আদায়কৃত সম্পদ হিফাজত করা, সেগুলোর হিসাবকিতাব সংরক্ষণ করা এবং তা ব্যয় বন্টন করার কাজে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারী হয়েছে। এসব কর্মচারী নিজেরা ফকীর মিসকিন না হলেও যাকাতের খাত থেকেই তাদের বেতন ভাতা দেয়া হবে। যাকাত সংগ্রহ এবং বন্টন করা যে ইসলামী সরকারের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য তা আলোচ্য আয়াত এবং সূরা তাওবার নিম্নোক্ত আয়াতের শব্দাবলী থেকে সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً - (اياات : ١٠٣)

"তাদের অর্থ সম্পদ থেকে সাদাকা (যাকাত) উসূল করো।"

প্রসংগক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জন্যে এবং নিজ বংশের (বনি হাশিম) জন্যে যাকাতের অর্থ সম্পদ গ্রহণ করা হারাম ঘোষণা করে দেন। তিনি নিজে বিনা পারিশ্রমিকেই সবসময় যাকাত আদায়-বন্টনের কাজ করেছেন। বনি হাশিমের অন্য সকলের জন্যেও তিনি এই একই বিধান চালু করেন। তিনি তাদের বলে দেন, তারা যদি বিনা পারিশ্রমিকে যাকাত আদায় বন্টনের কাজ করে তবে সেটা তাদের জন্যে জায়েজ। কিন্তু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যাকাত বিভাগের

কোনো কাজ করা তাদের জন্যে বৈধ নয়। তাঁর বংশের কোনো ব্যক্তি যদি 'সাহেবে নিসাব' হয় তবে যাকাত প্রদান করা তার উপর ফরয। কিন্তু সে যদি গরীব, অভাবী, ঋণগ্রস্ত এবং মুসাফিরও হয়, তবুও তার জন্যে যাকাত গ্রহণ করা বৈধ নয়। এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় নিয়ে মতভেদ হয়েছে। তাহলো বনি হাশেমের প্রদান করা যাকাত বনি হাশেমের কোনো ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারবে কিনা ? ইমাম আবু ইউসুফের মতে পারবে। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহ তাও বৈধ নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন।

৪. মুয়াল্লিফাতুল কুলুব ঃ 'তালিফে কলব' মানে মনজয় করা। 'মুয়াল্লিফাতুল কুলুব' মানে সেইসব লোক যাদের মনজয় করা উদ্দেশ্য। মনজয় করার জন্যে যাকাতের অর্থ ব্যয় করবার যে নির্দেশ এখানে দেয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্য হলো, যেসব লোক ইসলামের বিরোধিতায় তৎপর, তবে অর্থ দিয়ে বিরোধিতা থেকে নিবৃত করা যেতে পারে ; কিংবা কাফেরদের দলের এমন লোক যাদেরকে অর্থ দিলে দল ভেংগে এসে মুসলিমদের সাহায্যকারী হতে পারে ; অথবা এমন লোক যারা সবেমাত্র ইসলামে প্রবেশ করেছে তবে তাদের পূর্বের শত্রুতা কিংবা দুর্বলতা দেখে আশংকা হয় যে, অর্থ দিয়ে বশীভূত না করলে তারা আবার কুফরীতে ফিরে যেতে পারে—এসব ধরনের লোকদের স্থায়ী ভাতাবৃত্তি কিংবা সাময়িকভাবে অর্থদান করে ইসলামের সমর্থক ও সাহায্যকারী বা অনুগত কিংবা অক্ষতিকর শত্রুতে পরিণত করা। গনীমতের মাল এবং অন্যান্য উপায়ে অর্জিত অর্থ সম্পদ থেকেও এ খাতে ব্যয় করা যেতে পারে এবং প্রয়োজনে যাকাতের তহবিল থেকেও এ খাতে ব্যয় করা যায়। এ ধরনের লোকদের যাকাত পেতে ফকীর, মিসকীন বা মুসাফির হবার শর্ত নেই। বরঞ্চ তারা ধনী-সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্যে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা সম্পূর্ণ বৈধ।

এতে কোন মতভেদ নেই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় বহু লোককে 'মনজয়' করার জন্যে ভাতা প্রদান করা হতো এবং অর্থদান করা হতো। কিন্তু মতভেদ দেখা দিয়েছে এই ব্যাপারে যে, নবী করীম (সা)-এর পরেও এই খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে কিনা ? ইমাম আবু হানীফা এবং তার সাথীদের মত হলো, আবু বকর এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার খেলাফতকালে এই খাত রহিত করে দেয়া হয়। অতএব 'মুয়াল্লিফাতুল কুলুব' খাতে অর্থ ব্যয় করা জায়েজ নয়। ইমাম শাফেয়ীর মতে ফাসিক মুসলমানের 'মনজয়' করার জন্যে যাকাতের খাত

www.bjilibrary.com

থেকে অর্থ দেয়া যেতে পারে। কিন্তু কাফিরকে দেয়া যেতে পারেনা। অপরাপর ফকীহদের মতে, প্রয়োজন দেখা দিলে 'মুয়াল্লিফাতুল কুলুব' খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা সবসময়ই জায়েজ।

নিজেদের মতের সপক্ষে হানাফীদের দলিল হলো একটি ঘটনা। তাহলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতেকালের পরে উয়াইনা ইবনে হিস্‌ন এবং আকরা ইবনে হারিস খলীফা আবু বকর (রা)-এর কাছে এসে একখণ্ড জমি দাবী করে। তিনি তাদের দানপত্র লিখে দেন। তারা দানপত্রকে মজবুত করার জন্যে সাক্ষী হিসাবে অন্যান্য বড় সাহাবীর স্বাক্ষর পেতে চাইল। ফলে স্বাক্ষর সংগ্রহ হয়ে গেলো। কিন্তু তারা যখন সাক্ষী হযরত উমরের স্বাক্ষর নিতে গেলো, তিনি দানপত্রটি পড়ে তাদের সামনেই তা টুকরা টুকরা করে ছিড়ে ফেললেন এবং তাদের বললেন ঃ "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'তালীফে কলব'-এর জন্যে তোদের অনেক কিছু দিয়েছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সে সময়টি ছিলো ইসলামের দুর্বল অবস্থার সময়। এখন আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে তোদের মতো লোকদের সাহায্য থেকে মুখাপেক্ষীহীন করে দিয়েছেন।"

এ ঘটনার পর তারা আবু বকরের (রা) কাছে ফিরে এসে অভিযোগ করলো এবং তাকে টিটকারী দিয়ে বললো ঃ 'খলীফা কি আপনি না উমর'? কিন্তু হযরত আবু বকর নিজেও এর কোনো প্রতিবাদ করেননি আর সাহাবীদের একজনও উমরের (রা) এই মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করেননি। এটাই হানাফীদের দলিল। তারা বলেন, মুসলমানরা যখন সংখ্যায় বিপুল হয়ে গেলো এবং মজবুতভাবে নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার যোগ্য হলো তখন যেসব কারণে 'তালীফে কলব'-এর জন্যে অংশ ধার্য করা হয়েছিল। সেসব কারণ আর বাকী রইলনা। সুতরাং সাহাবীদের ইজমার ভিত্তিতেই 'তালীফে কলব'-এর খাত রহিত হয়ে গেছে।

ইমাম শাফেয়ীর যুক্তি হলো, 'মনজয়' করার উদ্দেশ্যে কাফিরদের যাকাত দেয়া রাসূলুল্লাহর আমল থেকে প্রমাণিত নয়। হাদীসে যতো ঘটনারই উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলো থেকে জানা যায় তিনি মনজয় করার উদ্দেশ্যে কাফিরদের দান করেছেন গনীমতের মাল থেকে, যাকাতের মাল থেকে নয়।

আমাদের মতে, 'মুয়াল্লিফাতুল কুলুব'-এর অংশ কিয়ামত পর্যন্ত রহিত হয়ে যাবার পক্ষে কোনো দলিল-প্রমাণ নেই। হযরত উমর (রা) যা কিছু

www.bjilibrary.com

বলেছিলেন তা যথার্থই ছিলো। ইসলামী রাষ্ট্র যদি 'মনজয়' করার জন্যে অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন মনে না করে, তবে বাধ্যতামূলকভাবে তা ব্যয় করার জন্যে কেউ ফরয করে দেয়নি। কিন্তু কখনো যদি এ খাতে অর্থ ব্যয় করার জরুরত দেখা দেয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা সে অবকাশ রেখে দিয়েছেন। এ খাত অবশিষ্ট থাকা জরুরীও বটে। হযরত উমর এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা) যে বিষয়ে একমত হয়েছিলেন, তা কেবল এতোটুকু যে, তারা তাদের সময়ে এ খাতে ব্যয় করার প্রয়োজন বোধ করেননি। কিন্তু তাদের সেই মতৈক্যের কারণে কিয়ামত পর্যন্ত এ খাতটি রহিত হয়েছে বলে ধারণা করার কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। কারণ, কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ দীনি কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই কুরআনে এ খাতে ব্যয়ের বিধান দেয়া হয়েছে।

এবার ইমাম শাফেয়ীর মতটি বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। তাঁর মত একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সঠিক মনে হয়। তাহলো, সরকারের যখন অন্যান্য খাতে যথেষ্ট অর্থ মওজুদ থাকবে, তখন মনজয় করার উদ্দেশ্যে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা ঠিক নয়। কিন্তু যখন এই খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করার জরুরত দেখা দেবে, তখন যাকাতের টাকা ফাসিককে দেয়া যাবে আর কাফিরকে দেয়া যাবেনা, এরূপ পার্থক্য করার কোনো কারণ থাকতে পারেনা। কেননা কুরআন মজীদ এই খাতে ঈমানের কারণে ব্যয় করার নির্দেশ দেয়নি বরং নির্দেশ দিয়েছে ইসলামের সার্থে ব্যয় করার এবং মনজয় করার। আর এমন লোকদেরই দিতে বলা হয়েছে, কেবল অর্থ দিয়েই যাদের মনজয় করা যায়। কুরআনের বিধান অনুযায়ী ইসলামী সরকার যেখানেই এই প্রয়োজন এবং এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবেন সেখানেই যাকাতের অর্থ এই খাতে ব্যয় করার অধিকার রাখবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খাত থেকে যদি কাফিরদের জন্যে ব্যয় না করে থাকেন, তবে তা করেছেন অন্যান্য খাতে প্রচুর অর্থ সম্পদ মওজুদ থাকার কারণে। নতুবা এই যাকাতের অর্থ থেকে যদি এই খাতে ব্যয় কাফেরদেরকে অর্থদান করা তার দৃষ্টিতে বৈধ না-ই হতো, তবে তিনি অবশ্যি এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে যেতেন।

৫. ফীর রিকাব ঃ অর্থাৎ গলদেশ মুক্ত করার কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা। 'গলদেশ মুক্ত' করার অর্থ মানুষকে দাসত্বের জিঞ্জির থেকে মুক্ত করার জন্যে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা। এর দুইটি পন্থা রয়েছে। একটি পন্থা হলো এই যে, কোনো দাস যদি তার মনিবের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে থাকে যে,

আমি আপনাকে এই পরিমাণ অর্থদান করলে আপনি আমাকে মুক্ত করে দেবেন, তবে তার মুক্তির মূল্য পরিশোধের জন্যে তাকে সাহায্য করা। দ্বিতীয় পন্থা হলো, নিজেই যাকাতের অর্থ দিয়ে দাস ক্রয় করে মুক্ত করে দেয়া।

এ দু'টি পন্থার মধ্যে প্রথমটির ব্যাপারে সকল ফকীহ্ই একমত। কিন্তু দ্বিতীয় পন্থাটি হযরত আলী, সায়ীদ ইবনে জুবায়ের, লাইছ, সওরী, ইবরাহীম নখয়ী, শা'বী, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন এবং হানাফী ও শাফেয়ীগণ অবৈধ মনে করেন। পক্ষান্তরে ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী, মালিক, আহমদ ইবনে হাম্বল এবং আবু সওর বৈধ বলে মনে করেন।

৬. গারেমীন ঃ অর্থাৎ ঋণগ্রস্ত লোক। তারা এমন ঋণগ্রস্ত যে, নিজের অর্থ সম্পদ দিয়ে নিজের ঋণ পরিশোধ করে দিলে আর নেসাব পরিমাণ অর্থ নিজের কাছে থাকেনা। এমন ব্যক্তি উপার্জনশীল হোক, বেকার হোক, সাধারণভাবে ফকীর বলে পরিচিত হোক, কিংবা হোক ধনী বলে পরিচিত। সর্বাবস্থায় তাকে যাকাতের খাত থেকে সাহায্য করা যেতে পারে । তবে কিছু সংখ্যক ফকীহর মতে যে ব্যক্তি অসৎকাজে এবং বাহুল্য ব্যয় করে নিজের অর্থকড়ি উড়িয়ে দিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, তওবা না করা পর্যন্ত তার সাহায্য করা যাবেনা।

৭. ফী সাবীলিল্লাহ ঃ অর্থাৎ 'আল্লাহর পথে' যাকাতের অর্থ ব্যয় করা। 'আল্লাহর পথে' কথাটি সাধারণ অর্থবোধক। আল্লাহর পথে বলতে এমন সকল নেক কাজই বুঝায়, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হন। এ কারণে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন যে, এ নির্দেশের আলোকে যাকাতের অর্থ সব ধরনের সৎকাজেই ব্যয় করা যেতে পারে। কিন্তু সঠিক কথা হলো, পূর্বতম ইমামদের অধিকাংশেরই মত হলো এখানে 'আল্লাহর পথের' অর্থ 'আল্লাহর পথে জিহাদ।' অর্থাৎ সেই চেষ্টা-সংগ্রাম যার উদ্দেশ্য কুফরী সমাজ ব্যবস্থাকে নির্মূল করে তদস্থলে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা করা। এই আন্দোলন ও সংগ্রামে যারা অংশ গ্রহণ করে তাদের সফর খরচের জন্যে, যানবাহনের জন্যে এবং অস্ত্র-শস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম ও উপায় উপকরণ সংগ্রহ করার জন্যে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। সে লোকেরা নিজেরা সচ্ছল হলেও এবং প্রয়োজন পূরণের জন্যে সাহায্যের প্রয়োজন না হলেও যাকাত গ্রহণ করতে তাদের কোনো দোষ নেই। অনুরূপ যারা স্বেচ্ছায় নিজেদের সমস্ত শ্রম এবং সময় সাময়িক বা স্থায়ীভাবে এ কাজে নিয়োগ করে তাদের প্রয়োজন পূরণের

www.bjilibrary.com

জন্যেও যাকাতের অর্থ থেকে এককালীন বা নিয়মিত সাহায্য দেয়া যেতে পারে।

এখানে আরেকটি কথা বিশেষভাবে বুঝে নেয়া দরকার। তাহলো অতীত ইমাম প্রায়শই এ ক্ষেত্রে 'গুজওয়া' শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা সশস্ত্র যুদ্ধের সমার্থক। এ কারণে লোকেরা এই ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয় যে, যাকাত ব্যয়ে ফী সাবীলিল্লাহর যে খাত রয়েছে. তা কেবল সশস্ত্র যুদ্ধের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' সশস্ত্র যুদ্ধের চাইতেও ব্যাপকতর জিনিসের নাম। 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' বলতে এমন সকল চেষ্টা-সাধনা ও সংগ্রামকেই বুঝায়, যা কুফরীকে পরাভূত করে আল্লাহর বাণীকে বিজয়ী করার এবং তাঁর দীনকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে উত্থিত হয়। চাই তা দাওয়াত ও তাবলীগের প্রাথমিক অবস্থায় থাকুক, কিংবা সশস্ত্র লড়াইয়ের চূড়ান্ত অধ্যায়ে, তাতে কিছু যায় আসে না।

৮. মুসাফির ঃ মুসাফির নিজের ঘরে ধনী হলেও সফরকালে যদি সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়, তবে যাকাতের খাত থেকে তাকে সাহায্য করা যাবে। এ ক্ষেত্রে কোনো কোনো ফকীহ্ এ শর্তারোপ করেছেন যে, কেবল ঐ মুসাফিরের জন্যেই এ নির্দেশটি প্রযোজ্য হবে, যে কোনো পাপ কাজের জন্যে সফরে বের হয়নি। অবশ্য কুরআন এবং হাদীসে এ ধরনের কোনো শর্ত বর্তমান নেই। তাছাড়া দীনের আদর্শিক শিক্ষা থেকেও আমরা জানতে পারি যে, কেউ সাহায্যের মুখাপেক্ষী হলে তাকে সাহায্য করার ব্যাপারে তার পাপী বা গুনাহগার হওয়াটা কোনরূপ বাধা নয়। বরঞ্চ সত্য কথা পাপী, গুনাহগার এবং নৈতিক অধঃপতিত ব্যক্তিদের সংশোধন করার একটি বড় উপায় হলো বিপদের সময় তাদের সাহায্য করা, আশ্রয় প্রদান করা এবং উত্তম আচরণের মাধ্যমে তাদের আত্মাকে পবিত্র করার চেষ্টা করা।

এখন প্রশ্ন হলো, এই যে আট ধরনের লোকের কথা বলা হলো, তাদের মধ্যে কাকে কোন্ অবস্থায় যাকাত দেয়া উচিত আর কোন্ অবস্থায় উচিত নয় ?—তার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে পেশ করা যাচ্ছে ঃ

১–কোনো ব্যক্তি নিজের পিতা কিংবা পুত্রকে যাকাত দিতে পারবেনা। স্বামী তার স্ত্রীকে এবং স্ত্রী তার স্বামীকে যাকাত দিতে পারবেনা।[১]

১. এ বিষয়ে সম্মুখে আরো বিস্তারিত আলোচনা আসছে—অনুবাদক

www.bjilibrary.com

২–যাকাত কেবল মুসলামনদেরই হক। অমুসলিমরা যাকাত পাবেনা। হাদীসে যাকাতের পরিচয় দেয়া হয়েছে এভাবে ঃ

تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَاءِ كُمْ وَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَاءِ كُمْ

"যাকাত তোমাদের ধনীদের কাছ থেকে আদায় করা হবে এবং তোমাদের গরীবদের মাঝে বন্টন করা হবে।"

তবে অমুসলিমদেরকে সাধারণ দান-খয়রাত অবশ্যি দেয়া যাবে। বরঞ্চ সাধারণ দান খয়রাতের ক্ষেত্রে কেবল মুসলমানকে দিতে হবে অমুসলিম সাহায্যের মুখাপেক্ষীকে দেয়া যাবেনা, এমন তারতম্য করা উচিত নয়।

৩–ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ বলেছেন, প্রতিটি অঞ্চলের যাকাত সেই এলাকার দরিদ্রদের মধ্যেই ব্যয় হওয়া উচিত। এক অঞ্চলের যাকাত অন্য অঞ্চলে পাঠানো ঠিক নয়। তবে, যে অঞ্চলের যাকাত, সেই এলাকায় যদি যাকাত লাভের যোগ্য লোক না থাকে কিংবা অন্য এলাকায় যদি কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন প্লাবন, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দেখা দেয় এবং দূরের ও কাছের এলাকা থেকে সাহায্য পাঠানো জরুরী হয়ে পড়ে, সে ক্ষেত্রে এক এলাকার যাকাত অন্য এলাকায় পাঠাতে দোষ নেই। ইমাম মালিক এবং সুফিয়ান সওরীও প্রায় অনুরূপ মতই দিয়েছেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে, এক অঞ্চলের যাকাত অন্য অঞ্চলে পাঠানো নাজায়েয।

৪–কারো কারো মতে, যে ব্যক্তির কাছে দু'বেলার খাবার সামগ্রী আছে, তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ করা উচিত নয়। কেউ কেউ বলেছেন, যার কাছে দশ টাকা আছে, আবার অপর কেউ কেউ বলেছেন, যার কাছে সাড়ে বার টাকা আছে, তার পক্ষে যাকাত নেয়া উচিত নয়। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র) এবং সকল হানাফী ইমামদের মতে, যার কাছে পঞ্চাশ টাকার কম অর্থ আছে, সে যাকাত গ্রহণ করতে পারে। এ পঞ্চাশ টাকার মধ্যে ঘরের আসবাব পত্র, ঘোড়া (যানবাহন) এবং চাকর-বাকর অন্তর্ভুক্ত হবে না। অর্থাৎ এসব সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও যার কাছে পঞ্চাশ টাকার কম আছে, সে যাকাত লাভের অধিকার রাখে। এ ক্ষেত্রে একটি জিনিস হলো আইন এবং আরেকটি জিনিস হলো মর্যাদার স্তর। এ দু'টি জিনিসের পার্থক্য আছে।

মর্যাদার স্তর হলো এই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যার কাছে সকাল ও সন্ধ্যার খাবার সামগ্রী আছে, সে যদি

www.bjilibrary.com

মানুষের কাছে চাওয়ার জন্যে হাত পাতে, তবে সে নিজের জন্যে আগুন জমা করে।" অপর একটি হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মানুষের কাছে হাত পাতার চাইতে কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহ করাকে আমি অধিকতর পসন্দ করি।" তৃতীয় একটি হাদীসে বলা হয়েছে , "যার কাছে খাবার আছে, অথবা যে ব্যক্তি উপার্জন করার সামর্থ রাখে, তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ করা অনুচিত।" এগুলো হলো মর্যাদাবোধের কথা। আত্মমর্যাবোধ সম্পন্ন লোকদের জন্যে এগুলো উপদেশ। এগুলো আইন নয়।

বাকী থাকলো আইনের কথা। কতদূর পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি যাকাত গ্রহণ করার অধিকার রাখে, এ ব্যাপারে একটি শেষ সীমা বলে দেয়া জরুরী। এ ব্যাপারেও হাদীস থেকেই নির্দেশিকা পাওয়া যায়। যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى الْفَرَسِ

"ঘোড়ায় চড়ে এলেও ভিক্ষাপ্রার্থী ভিক্ষা পাওয়ার অধিকার রাখে।"

এক ব্যক্তি এসে নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করলো, আমার কাছে দশ টাকা থাকলে আমি কি মিসকীন বলে গণ্য হবো ? তিনি বললেন ঃ 'হাঁ'।

একবার দু'ব্যক্তি এসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যাকাত চাইলো। তিনি কিছুক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেনঃ তোমরা নিতে চাইলে আমি দেবো, তবে যাকাতের মালে ধনী এবং উপার্জনক্ষম লোকদের অংশ নেই।

এসব হাদীস থেকে জানা গেলো, যার কাছে নিসাবের চাইতে কম পরিমাণ অর্থ সম্পদ আছে, সে ফকীর বলে গণ্য হবে এবং তাকে যাকাত দেয়া যেতে পারে। তবে প্রকৃত অভাবী এবং মুখাপেক্ষী লোকেরাই আসলে যাকাত পাওয়ার হকদার।

এখানে আমি যাকাতের জরুরী বিধি-বিধান বর্ণনা করলাম। তবে এ প্রসংগে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যা মুসলমানরা বর্তমানে ভুলেই গিয়েছে। তাহলো, ইসলামের সব কাজই সাংগঠনিক ও সামষ্টিক ব্যবস্থাপনায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। ইসলাম ব্যক্তিতান্ত্রিকতাকে সমর্থন করেনা। আপনি মসজিদ থেকে দূরে অবস্থান করা অবস্থায় একাকী নামায পড়লে নামায হয়ে যাবে বটে, তবে শরীয়তের দাবী তো হলো আপনি যেনো জামায়াতের সাথে নামায পড়েন।

www.bjilibrary.com

একইভাবে মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ও দলীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না থাকলে ব্যক্তিগতভাবে যাকাত বের করে ব্যয় করাও জায়েয। তবে প্রচেষ্টা তো এই থাকা উচিত যে, যাকাত একটি কেন্দ্রীয় স্থানে জমা করা হবে এবং সেখান থেকে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে ব্যয় হবে। এ বিষয়টির প্রতিই কুরআন মজীদ ইংগিত করেছে নিম্নোক্ত আয়াতে ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ

(তাদেরকে পবিত্র পরিশুদ্ধ করার জন্যে তাদের অর্থ সম্পদ থেকে সাদাকা [যাকাত] আদায় করো)।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাকাত উসূল করার নির্দেশ দিয়েছেন। মুসলমানদেরকে ব্যক্তিগতভাবে নিজ যাকাত বের করে তা ব্যয় করতে বলেননি। তাছাড়া যাকাত বিভাগের কর্মচারীদের অধিকার যাকাতের খাত থেকে নির্ধারণ করা দ্বারাও একথা পরিষ্কার হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় তা উসূল ও ব্যয় করবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اُمِرْتُ اَنْ اٰخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ اَغْنِيَاءِ كُمْ وَ اَرُدُّهَا فِى فُقَرَاءِ كُمْ

"আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেনো তোমাদের ধনীদের কাছ থেকে যাকাত উসূল করি এবং তোমাদের গরীবদের মাঝে তা বন্টন করি।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খুলাফায়ে রাশেদীন এই পন্থায়ই যাকাত উসূল ও বন্টন করতেন। ইসলামী রাষ্ট্রের কর্মচারীরা সমস্ত যাকাত উসূল করে এক জায়গায় জমা করতেন এবং নিয়মমাফিক বন্টনের ব্যবস্থা করতেন।

বর্তমানে যেহেতু আমাদের দেশে ইসলামী রাষ্ট্র নেই এবং ইসলামী সরকারের মাধ্যমে যাকাত আদায় করে বন্টন করার ব্যবস্থাও নেই, সে কারণে আপনারা ব্যক্তিগতভাবে হিসেব করে নিজেদের যাকাত বের করে তা শরীয়ত নির্ধারিত খাতে ব্যয় করতে পারেন। তবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যাকাত উসূল ও বন্টন করার উদ্দেশ্যে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করা সকল মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। কারণ এছাড়া যাকাত ফরয করার উপকারিতা পূর্ণরূপে লাভ করা সম্ভব নয়।

www.bjilibrary.com

মহিলাদের দেনমোহরের যাকাত

মহিলারা বিয়েতে যে দেন মোহর লাভ করে তার যাকাত দিতে হবে কি ? যদি দিতে হয়, তবে কখন দেয়া ওয়াজিব ? এ বিষয়ে বিভিন্ন মযহাবের ইমাম ও আলিমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। নিম্নে চার মযহাবের মতামত উল্লেখ করা হলো ঃ

*** হানাফী মযহাব ঃ** হানাফী মযহাবের যুক্তি হলো, মোহর এমন এক জিনিসের বিনিময় যা আসলে কোনো মাল বা সম্পদ নয়। সুতরাং হস্তগত হবার পূর্বে মোহরের উপর যাকাত ওয়াজিব হয়না। মোহর যতোদিন স্বামীর হাতে থাকবে, ততোদিন তা এমন ঋণের সমতুল্য যা উসূল হবার সম্ভবনা কম থাকে। তাই স্ত্রী যখন নিসাব পরিমাণ মোহর হস্তগত করবে এবং তার হাতে তা এক বছর থাকবে, কেবল তখনই মোহরের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। কিন্তু মোহর ছাড়াও যদি তার অধিকারে অন্য কোনো অর্থ-সম্পদ থাকে, তবে মোহরের অর্থ যে পরিামণই তার হাতে আসুক না কেন তা ঐ অর্থ সম্পদের সাথে যোগ করে নিসাব হিসাব করতে হবে। এ ক্ষেত্রে মোহর যতো কমই তার হাতে আসুক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। এটাকে লাভ লোকসানের ব্যবসায়ের মতো ধরতে হবে। ব্যবসায়ের লাভ (Profit) যেমন মূল পুঁজির সাথে যোগ করে সমূদয় অর্থের যাকাত দিতে হয়, ঠিক তেমনি মোহরানার যে অংশই হাতে আসুক না কেন তা নিজের অন্যান্য যাকাত দেয় অর্থ সম্পদের সাথে যোগ করে বছরান্তে সমূদয় অর্থ সম্পদের যাকাত দেয়া ওয়াজিব।

*** শাফেয়ী মযহাব ঃ** শাফেয়ী মযহাবের মতে, মহিলাদের উপর বছরান্তে মোহরের যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। বাসরের পূর্বেই মোহর উসূল হোক বা না হোক তাতে কিছু যায় আসেনা। শাফেয়ীদের মতে, মোহর উসূল না হয়ে থাকলে তা স্বামীর কাছে ঋণ হিসেবে থাকে। তাদের মতে ঋণ যখনই উসূল হোকনা কেন, উসূল হবার সাথে সাথে পূর্বের সমস্ত বছরের যাকাত দিয়ে দিতে হবে।

*** মালেকী মযহাব ঃ** মালেকীদের মতে, মহিলা যদি মোহর হিসেবে কিছু অর্থের মালিক হয়। কিন্তু সেটা যদি উসূল হয়ে তার হাতে না আসে, তবে সেটা উসূল যোগ্য ঋণ হিসেবে গণ্য হবে। আর এরূপ ঋণের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে তখন যখন উসূল হবে এবং উসূল হবার পর পুরো একবছর অতিক্রান্ত হবে।

www.bjilibrary.com

* **হাম্বলী মযহাব ঃ** হাম্বলীদের মতে, মোহর উসূল না হয়ে থাকলে, তা স্বামীর কাছে স্ত্রী প্রদত্ত ঋণ হিসেবে থাকে। এই ঋণের বিধান অন্যান্য ঋণের মতোই। স্বামী যদি সম্পদশালী হয় তবে তো তার উপর যাকাত দেয়া ওয়াজিব। সুতরাং মোহরের অর্থ যখন স্ত্রীর হস্তগত হবে, তখন অতীতের বছরগুলোর যাকাতসহ আদায় করে দিতে হবে। কিন্তু স্বামী যদি দরিদ্র হয়, কিংবা মোহর দিতে অস্বীকার করে, সে ক্ষেত্রেও এই মযহাবের আল্লামা খরকীর মতে যাকাত ওয়াজিব হবে। এমনকি বাসর না হয়ে থাকলেও যাকাত ওয়াজিব হবে। তবে যাকাত আদায় করতে হবে তখন, যখন তা হস্তগত হবে। বাসরের পূর্বে যদি তালাক হয়ে যায়, এ ক্ষেত্রে স্ত্রী অর্ধেক মোহর পাবে। এই অর্ধেক মোহার হস্তগত হবার সাথে সাথে বছর গণনা করে যতো বছর হয় তার যাকাত দিয়ে দিতে হবে। একইভাবে মোহর হস্তগত হবার পূর্বেই যদি কোনো কারণে বিবাহ ভেংগে যায় এবং মোহর রহিত হয়ে যায়, তবে সে ক্ষেত্রে যাকাত ওয়াজিব হবেনা।

আমাদের মতে, এ ক্ষেত্রে সবচাইতে বিশুদ্ধ মত হলো হানাফী এবং মালেকী মযহাবের মত। অর্থাৎ একজন মহিলার মোহরের যাকাত কেবল তখনই ওয়াজিব যখন মোহর তার হস্তগত হবে এবং হস্তগত হবার দিন থেকে একবছর অতিবাহিত হবে।

মোহরের যাকাতের হিসাব

মোহর যদি সোনা রূপা আকারে থাকে, তবে সোনার যাকাত সোনার নিসাব অনুযায়ী এবং রূপার যাকাত রূপার নিসাব অনুযায়ী দিতে হবে। সোনারূপার নিসাবের কথা আগেই আলোচনা করে এসেছি। কিন্তু মোহর যদি নোট আকারে থাকে, সে ক্ষেত্রে মোহরের নিসাব কি হবে ? নিসাব কি সোনার মূল্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে, নাকি রূপার মূল্যের ভিত্তিতে ? এ ব্যাপারেও মতভেদ আছে।

* একটি মত হলো, মোহর হিসাবে যেসব নোট পাওয়া যাবে, সেগুলোর মূল্যমান যদি সোনার নিসাব পরিমাণ হয়, তবে যাকাত ওয়াজিব হবে।

অর্থাৎ বাজার থেকে জেনে নিতে হবে, বিশ দীনার বা ২০০.৮৯ গ্রাম সোনার মূল্য প্রচলিত কারেন্সীর হিসাবে কত হয় ? যদি দেখা যায়, মোহর হিসাবে প্রাপ্ত নোটের মূল্যমান নিসাব পরিমাণ হয়, কিংবা বেশী হয়, তবে

www.bjilibrary.com

যাকাত ওয়াজিব হবে। নোটগুলোর মূল্যমান যদি সোনার নিসাবের চেয়ে কম হয়, কিন্তু তার কাছে যদি মোহর ছাড়াও অর্থকড়ি থাকে এবং সব মিলিয়ে সোনার নিসাবের পরিমাণ নোট থাকে, তবে যাকাত ওয়াজিব হবে। তবে শর্ত হলো, মোহরের অর্থই হোক কিংবা অন্য যে অর্থই হোক, সেগুলোর উপর যাকাত কেবল তখনই ওয়াজিব হবে, যখন সেগুলো হস্তগত হবার পর একবছর মেয়াদ পূর্ণ হবে।

* আরেকটি মত হলো, মোহর হিসাবে প্রাপ্ত নোটের মূল্যমান নির্ধারণ করতে হবে রূপার মূল্যের ভিত্তিতে। অর্থাৎ বাজার থেকে জেনে নিতে হবে ২০০ দিরহাম বা ৬২৪ গ্রাম রূপার মূল্য প্রচলিত কারেন্সীতে কত আসে? যদি দেখা যায়, মোহর হিসাবে প্রাপ্ত নোটের মূল্যমান ৪২৪ গ্রাম রূপার মূল্যের বরাবর বা তার চেয়ে বেশী হয়, তবে যাকাত ওয়াজিব হবে। নোটগুলোর মূল্যমান যদি রূপার নিসাবের চেয়ে কম হয়, কিন্তু মোহর ছাড়াও যদি তার কাছে আরো অর্থ কড়ি থাকে, সেগুলোর সাথে এগুলোকে মিলিয়ে দেখতে হবে রূপার নিসাবের সমমূল্য পরিমাণ হয় কিনা। যদি নিসাব পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশী হয়, তবে যাকাত ওয়াজিব হবে। কম হলে হবেনা। তবে যাকাত ওয়াজিব হবার জন্যে এক বছর নিজের কব্জায় থাকা শর্ত।

একদল আলিম সোনার নিসাবের ভিত্তিতে যাকাত নির্ধারণের পক্ষপাতী, আরেক দল আলিম রূপার নিসাবের ভিত্তিতে যাকাত নির্ধারণের পক্ষপাতী। মোহরের নোটের যাকাত সোনার নিসাবের ভিত্তিতে ধরা হবে, নাকি রূপার নিসাবের ভিত্তিতে, এই মতভেদ সৃষ্টি হবার কারণ উপরোক্ত দৃষ্টিভংগি।

যেসব আলিম রৌপ্যের নিসাবের ভিত্তিতে যাকাত নির্ধারণের পক্ষপাতী, তাদের যুক্তি হলো, এ প্রক্রিয়াতেই দরিদ্র লোকেরা অধিক উপকৃত হবে। পক্ষান্তরে যেসব আলিম সোনার নিসাবের ভিত্তিতে যাকাত নির্ধারণের পক্ষপাতী, তাদের যুক্তি হলো, সম্পদের মূল্যমান নির্ধারিত হয় সোনার ভিত্তিতে। তাছাড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এক মিসকাল সোনা দশ দিরহাম রৌপ্যের সমপরিমাণ ছিলো। সে হিসাবেই রৌপ্যের নিসাব নির্ধারণ করা হয়েছিল দু'শ দিরহাম। যুগ ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে সোনার দাম রূপার দামের চাইতে অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু যুগ ও কালের পরিবর্তনের পরও সম্পদের মূল্যমান সোনার ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। সোনাই সম্পদের মানদণ্ড।

www.bjilibrary.com

* অপর একটি মত হলো এই যে, ইসলাম এই ব্যাপারে অবকাশ দিয়েছে। রূপার নিসাবের ভিত্তিতে যাকাত দেয়াই দৃঢ় মনোবৃত্তির পরিচায়ক। আর সোনার নিসাবের ভিত্তিতে যাকাত দেয়াটা একটা অবকাশ। কেউ ইচ্ছে করলে এই অবকাশ গ্রহণ করতে পারে। তবে দৃঢ়তা (আযীমত) অবলম্বন করা উচ্চমর্যাদার প্রতীক। আল্লাহই সর্বজ্ঞানী। তিনি সঠিক পথের অনুসারী হবার তৌফিক দিন।

মহিলাদেরকে সোনার অলংকার পরার ব্যাপারে সর্তক করা এবং প্রাসংগিক হাদীস ও মতামতের আলোচনা।

হাদীস গ্রন্থাবলীতে এমন কিছু হাদীস উল্লেখ আছে, যেগুলোতে সোনার অলংকার পরার ব্যাপারে মহিলাদেরকে সর্তক করা হয়েছে। এখানে সেরকম কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) ইমাম নাসায়ী তাঁর সুনানে নাসায়ীতে বিশুদ্ধ সূত্রে সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার হিন্দ বিনতে হুবাইরা [রাদিয়াল্লাহু আনহা] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হন। এ সময় তার হাতে মোটা সোনার বালা পরা ছিলো। এটা পরা দেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতে বেত্রাঘাত করলেন। হিন্দ বিনতে হুবাইরা রাসূলের কন্যা ফাতিমার কাছে এসে তাকে বিষয়টি জানালেন। এ সময় ফাতিমার গলায় পরা ছিলো একটি সোনার হার। ঘটনাটি শুনে ফাতিমা [রাদিয়াল্লাহু আনাহা] তার গলার হারটি খুলে নিয়ে বললেন ঃ "আলী আমাকে এ হারটি উপহার দিয়েছেন।" হারটি এখনো ফাতিমার হাতেই ছিলো, এমন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে উপস্থিত হন। তিনি ফাতিমার হাতে সোনার হার দেখে বললেন ঃ

يا فاطمة ! أيغرك ان يقول الناس ابنة رسول الله وفى يدك سلسة من النار

"ফাতিমা ! তুমি কি এই ভেবে গর্ববোধ করছো যে, লোকেরা বলবে রাসূলুল্লাহর কন্যা আগুনের হার হাতে নিয়েছে?

www.bjilibrary.com

একথা বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলে যান। ফাতিমা হারটি বাজারে বিক্রি করে দেন এবং সেই অর্থ দিয়ে একটি দাস ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে এলে তিনি বলে উঠেন ঃ

الحمد الله الذى أنجى فاطمة من النار

"শোকর সেই আল্লাহর, যিনি ফাতিমাকে আগুন থেকে রক্ষা করলেন।"

(২) সুনানে আবু দাউদ এবং সুনানে নাসায়ীতে বিশুদ্ধ সূত্রে আসমা বিনতে ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

ايما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت فى عنقها مثلها من النار يوم القيامة و ايما امرأة جعلت فى اذنها قرطا من ذهب جعل فى اذنها مثلها من النار يوم القيامة –

"যে নারী তার গলায় সোনার হার পরবে, কিয়ামতের দিন তার গলায় অনুরূপ একটি আগুনের হার পরানো হবে। আর যে নারী কানে সোনার দুল পরবে, কিয়ামতের দিন অনুরূপ একটি আগুনের দুল তার কানে পরানো হবে।"

(৩) আবু দাউদ এবং নাসায়ী রিবয়ী বিন হারাশ থেকে, তিনি তাঁর স্ত্রী থেকে এবং তাঁর স্ত্রী হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বোনের নিকট থেকে শুনে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

يا معشر النساء ! ما لكن فى الفضة تخلين جه اما انه ليس منكن امرأة تتحلى ذهبا و تظهره الاعذبت جه -

"হে মহিলা সমাজ ! রূপার অলংকার পরাতে তোমাদের জন্যে ক্ষতি নেই। কিন্তু তোমাদের মাঝে যে কোনো মহিলাই সোনার অলংকার পরবে এবং তা প্রদর্শন করে বেড়াবে, সে অবশ্যি এ কারণে শাস্তি ভোগ করবে।"

এ হাদীসে হুযাইফার যে বোনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর নাম ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)।

www.bjilibrary.com

(৪) সুনানে নাসায়ীতে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, জনৈক মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে জিজ্ঞেস করলো ঃ

يا رسول اللّه سوارين من ذهب ؟

"সোনার দু'টি চুঁড়িও হে আল্লাহর রাসূল ?"

তিনি বললেন ঃ سوارين من نار "আগুনের দু'টি চুড়ি।"

মহিলাটি জিজ্ঞেস করলো ঃ طوقًا من ذهب "সোনার একটি হার ?"

তিনি বললেন ঃ طوقًا من نار "আগুনের একটি হার।"

মহিলাটি আবার জানতে চাইলো ঃ قرطين من ذهب "সোনার দু'টি দুল ?"

তিনি বললেন ঃ قرطين من نار "আগুনের দু'টি দুল।"

মহিলাটির হাতে ছিলো সোনার দু'টি কংকন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য শুনে সে দু'টি খুলে ফেলে দিয়ে বললো ঃ 'সাজসজ্জা না করলে তো স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আকর্ষণ কমে যায়।' তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

ما يمنع احدا كن ان تصنع قرطين من فضت ثم تصفره بز عفران - او قال بعبير-

"কেন রূপোর দুল বানিয়ে নিয়ে তাতে জাফরান কিংবা আবীর লাগিয়ে হলুদ করে নিতে পারনা ?"

(৫) সুনানে নাসায়ীতে উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবার পরিজনকে সোনার অলংকার এবং রেশমের পোশাক পরতে নিষেধ করতেন এবং বলতেন ঃ

ان كنتم تحبون حلية الجنة وحرير ها فلا تلبسوها فى الدنيا-

"তোমরা যদি জান্নাতের অলংকার এবং সেখানকার রেশম পরতে চাও, তবে পৃথিবীর জীবনে সোনার অলংকার এবং রেশমের পোশাক পরোনা।"

www.bjilibrary.com

(৬) সুনানে নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোনার অলংকার পরতে নিষেধ করেছেন। তবে অল্প স্বল্প হলে নিষেধ করতেননা। যেমন, মহিলাদের কানের দুল বা আংটি।

(৭) আবু দাউদ বানানা (র) (আবদুর রহমান ইবনে হাইয়ান আনসারীর দাসী) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার আমি একটি মেয়ের সাথে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট গিয়েছিলাম। মেয়েটির পায়ে পদালংকার পরা ছিলো এবং সেগুলো থেকে আওয়াজ হচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে আয়েশা (রা) বললেন ঃ ওর নুপুর কেটে ফেলো। তা না হলে ওকে আমার কাছে আসতে দিওনা। তিনি আরো বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس -

"যে ঘরে ঘন্টা বাজে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করেনা।"

সেসব হাদীসের ব্যাখ্যা, যেগুলোতে মহিলাদেরকে স্বর্ণালংকার পরার ব্যাপারে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে।

যেসব হাদীসে স্বর্ণালংকার পরার ব্যাপারে মহিলাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে, আলমুনযেরী তার 'আততারহীব ওয়াত তারগীব' গ্রন্থে সেগুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, এ হাদীসগুলোর বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা করার অবকাশ রয়েছে।

(১) একটি ব্যাখ্যা হলো এই যে, এই হাদীসগুলো সবই মনসুখ (রহিত) হয়ে গেছে। কেননা, মহিলাদের জন্যে সোনার অলংকার পরা যে বৈধ (মুবাহ), তা একটি প্রমাণিত বিষয়।

(২) দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো, এসব হাদীসে যে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে, তা ঐসব মহিলাদের জন্যে প্রযোজ্য, যারা অলংকারের যাকাত দেয়না। যারা অলংকারের যাকাত প্রদান করে, তাদের সাথে এ শাস্তির কোনো সম্পর্ক নেই।

(৩) তৃতীয় ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, এসব হাদীসে যে শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে, তা সেসব মহিলাদের জন্যে, যারা সাজগোজ প্রদর্শন করে

www.bjilibrary.com

বেড়ায়। উপরে উল্লেখিত তৃতীয় হাদীসটি থেকেও একথারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

(৪) চতুর্থ ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব হাদীসে মহিলাদেরকে স্বর্ণালংকার পরতে নিষেধ করেছেন সেগুলো বিশেষ পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ হয়তো তিনি দেখছিলেন ঐসব মহিলারা যেসব মোটা মোটা অলংকার পরে রাখছিলো, তাতে তাদের মনে অহম্বোধ সৃষ্টি হতে পারে। এ কারণেই তিনি তাদের নিষেধ করেন এবং শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেন।

আমরা আল্লামা মুনযেরীর এসব ব্যাখ্যার সাথে একমত। কারণ, একথা তো সুপ্রমাণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত সাহাবীগণ তাঁর ইন্তেকালের পর নিজেদের স্ত্রী ও কন্যাদেরকে স্বর্ণালংকার পরিয়েছেন। তিনি যদি জীবনের শেষের দিকে স্বর্ণালংকার পরতে নিষেধ করতেন, তবে সম্মানিত সাহাবায়ে কিরাম কখনো তাদের স্ত্রী ও কন্যাদেরকে স্বর্ণালংকার পরাতেননা। বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা স্বীয় কন্যাদেরকে সোনার অলংকার পরাতেন। মুআত্তায়ে ইমাম মালিকে বর্ণিত হয়েছে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর ভাইয়ের এতীম কন্যাদের অভিভাবিকা ছিলেন এবং ওদের কাছে সোনার অলংকার ছিলো। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কন্যা ও দাসীদেরকে সোনার অলংকার পরাতেন। প্রত্যেক কন্যাকে তিনি চার দীনারের স্বর্ণালংকার দিয়েছিলেন।

সুতরাং এ প্রসংগে শেষ কথা হলো, সোনার অলংকার পরা মহিলাদের জন্যে নিষেধ নয়। নিষেধ হলো অলংকারের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি এবং অপব্যয়। নিষেধ হলো অলংকার প্রদর্শন করে বেড়ানো এবং অন্যদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হতে দেয়া যে, অমুকে অলংকার পরে অহংকার করছে।

www.bjilibrary.com

অনুমতি থাকলে স্বামীর অর্থ সম্পদ থেকে দান করা জায়েয

স্ত্রী যদি বুঝতে পারে যে, স্বামীর অর্থ সম্পদ থেকে দান সদকা করাটাকে স্বামী পসন্দ করেন, তবে স্বামীর অর্থ সম্পদ থেকে দান সদকা করা স্ত্রীর জন্যে বৈধ। আর যদি স্বামী পসন্দ করবে বলে জানা না থাকে, তবে স্বামীর অর্থ সম্পদ থেকে দান করা স্ত্রীর জন্যে নাজায়েয। এ মতের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায় নিম্নোক্ত হাদীসগুলো থেকে ঃ

১-উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اذا انفقت المرأة من طعام بيتها - وفى رواية- من بيت زوجها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما كسب و للخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من اجر بعض - (بخارى رحـ و مسلم رحـ ومسند ابو يعلى رحـ)

কোনো নারী যখন তার স্বামীর খাবার থেকে, অপর বর্ণনায় স্বামীর ঘর থেকে কিছু দান করে এবং এতে তার কোনো খারাপ নিয়ত না থাকে অর্থাৎ স্বামীকে ক্ষতিগ্রস্ত করবার ইচ্ছা না থাকে, তবে এ দান করার জন্যে সে শুভ প্রতিফল লাভ করবে। তার স্বামীও উপার্জন করার কারণে শুভ প্রতিফল লাভ করবে। খাজাঞ্চীও অনুরূপ প্রতিফল লাভ করবে এবং একজনের প্রতিফল লাভের জন্যে আরেকজন প্রতিফল কমবেনা।" [বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আবু ইয়ালী]

২-আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اذ انفقت المرأة من بيت زوجها عن غير امره فلها نصف اجره - (بخارى رحـو مسلم رحـ و ابو داؤد رحـ)

www.bjilibrary.com

"নারী যদি স্বামীর অনুমতি ছাড়াই স্বামীর অর্থ সম্পদ থেকে দান সদকা করে, তবে সে অর্ধেক সওয়াব লাভ করে।"[বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ]

সহীহ্ মুসলিমের ব্যাখ্যাতা ইমাম নববী এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

"এ প্রসংগে মনে রাখতে হবে যে, স্ত্রী যদি স্বামীর, খাজাঞ্জী যদি মালিকের এবং গোলাম যদি মনিবের অর্থ সম্পদ থেকে দান সদকা করে, তবে তাদেরকে অবশ্যি অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। অনুমতি লাভ করা ছাড়াই যদি দান করে, তবে তারা কেউই এ দানের জন্যে সওয়াব পাবেনা। বরং বিনা অনুমতিতে ব্যয় করার জন্যে দায়ী হবে।

অবশ্য অনুমতি দুই প্রকার ঃ

১. ব্যয় করা ও দান সদকা করার জন্যে সুস্পষ্ট অনুমতি।

২. সাধারণ ও প্রচলিত নিয়মে অনুমতি আছে বলে ধরে নেয়া। যেমন ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেয়া। সাধারণত স্ত্রী বা অধীনস্থরা স্বামী বা মনিবের সুস্পষ্ট নির্দেশ ও মৌখিক অনুমতি ছাড়াই ভিক্ষা দিয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে স্বভাবত এবং প্রচলিত নিয়মে তার অনুমতি আছে বলে ধরে নেয়া হয়। কিন্তু এভাবে অনুমতি আছে বলে ধরে নেয়াটা তখনই বৈধ হবে, যখন দৈনন্দিন কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝা যাবে যে, স্বামী এরূপ দান খয়রাত করাকে অপসন্দ করেনা এবং এরূপ দান সদকা করার ক্ষেত্রে তার স্বভাব সাধারণ লোকদের মতো। সেইসব লোকদের মতো যারা এভাবে দান সদকা করাকে অপসন্দ করেনা।

কিন্তু সেসব অবস্থায় স্বামীর অর্থ সম্পদ থেকে স্ত্রীর জন্যে এবং মনিবের অর্থ সম্পদ থেকে অধীনস্থদের জন্যে দান খয়রাত করা বৈধ নয়, যখন একাজ তিনি পসন্দ করেন কিনা সেই ব্যাপারে সন্দেহ হবে, কিংবা তিনি যদি চরম কৃপণ বা লোভী হয়ে থাকেন এবং তার স্বভাব ও কার্যক্রম দেখে তার কৃপণ হবার বিষয়টি বুঝা যায়, অথবা যদি তাকে কৃপণ বলে সন্দেহ হয়।

সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

وما انفقت من كسبه من غير امره فان نصف اجره له –

www.bjilibrary.com

"স্ত্রী স্বামীর উপার্জন থেকে অনুমতি ছাড়া যা কিছু দান করে তার অর্ধেক সওয়াব স্বামী লাভ করবে।"—এ ব্যাপারে প্রমাণিত হলো যে, স্ত্রী স্বামীর অর্থ সম্পদ থেকে তার সুস্পষ্ট বা প্রচলিত অনুমতি ছাড়া ব্যয় করলে সে কোনো সওয়াব পাবেনা, বরং বিনা অনুমতিতে ব্যয় করার দায়দায়িত্ব তার ঘাড়েই চাপবে।

এ প্রসংগে আরেকটি কথা মনে রাখা দরকার। তাহলো, প্রচলিত নিয়ম বা অভ্যাস থেকে যদি অনুমতি আছে বলে ধরে নেয়াও হয়, তবু এ অনুমতি কেবল সামান্য পরিমাণ দান সদকার ব্যাপারই প্রযোজ্য হবে। যেমন সাধারণ ভাবে লোকেরা ভিক্ষুককে যে পরিমাণ ভিক্ষা দিয়ে থাকে। কিন্তু প্রচলিত অনুমতিতে কেউ এর চাইতে অধিক ব্যয় করলে তা বৈধ হবেনা। আসলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছেন ঃ

اذ انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة–

"কোনো নারী যদি পরিবারের খাবার সামগ্রী থেকে বিপর্যয় সৃষ্টি না করে (অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য যদি ক্ষতিকর না হয়), তবে সে সওয়াব লাভ করবে।"

—এ থেকে বুঝা যায়, এ ধরনের দান বা ব্যয় এমন পরিমাণের হতে হবে, যে সম্পর্কে প্রচলিত নিয়ম ও অভ্যাস থেকে বুঝা যাবে যে, এতে স্বামী সন্তুষ্ট আছে। 'খাবার সামগ্রী' কথাটি থেকেও পরিমাণ খুব অল্প হওয়াই বুঝায়।[১]

আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু বর্ণনা করেন, বিদায় হজ্জের বছর আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ভাষণে একথাটিও বলতে শুনেছি যে ঃ

لا تنفق المرأة شيأ من بيت زوجها الا باذن زوجها–

"কোনো মহিলা তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্বামীর ঘর থেকে কিছু ব্যয় করবেনা।" একথা শুনে একজন উঠে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল, "খাবার সামগ্রীও নয়?"

তখন তিনি জবাব দিলেন ঃ

১. মুসলিম ঃ ইমাম নববীর শরাহ থেকে।

www.bjilibrary.com

ذلك افضل اموالنا-

"এতো আমাদের সম্পদের সর্বোত্তম অংশ।"

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তিরমিযী। তিনি বলেছেন হাদীসটি হাসান।

আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিবেদন করলাম ঃ "যুবায়ের [আসমার স্বামী] তো বড় কড়া মেজাজের মানুষ। এদিকে আমার কাছে প্রায়শই ভিক্ষুক, মিসকীন এবং অভাবী লোকেরা আসে। আমি কি যুবায়েরের অনুমতি ছাড়া তাঁর ঘর থেকে দান খয়রাত করবো ?" নবী করীম (সা) বললেন ঃ

ارضخي ولا توعي فيوعى الله عليك ـ

"কিছু কিছু অবশ্যি ব্যয় করবে। সবকিছু একেবারে আকঁড়ে ধরে রেখোনা। তাহলে আল্লাহও তোমাকে দেয়া বন্ধ করে দেবেন।"

স্বামীর অনুমতি ছাড়া মহিলারা নিজের অর্থ ব্যয় করতে পারে

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, মাইমুনা[১] বিনতে হারিছা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেঁচে থাকতে আমি আমার এক দাসীকে মুক্ত করে দিই। অতপর বিষয়টি তাঁকে জানালে তিনি বললেন ঃ

لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك -

"তুমি যদি ওকে তোমার মামাদের দিয়ে দিতে, তবে তোমার সওয়াব আরো বেশী হতো।"

সহীহ বুখারীতে 'মামাদের' পরিবর্তে 'বোনদের' এবং মু'আত্তায়ে মালিকে বোনকে শব্দ উল্লেখ হয়েছে।

ইমাম নববী লিখেছেন, বর্ণনার এ পার্থক্য দ্বারা মূল বক্তব্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। সকল বর্ণানারই মূল কথা এক। খুব সম্ভব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলেছেন। অর্থাৎ হয়তো তিনি বলে

১. ইনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন।

www.bjilibrary.com

থাকবেন ঃ 'তুমি যদি ওকে তোমার মামাদের বা বোনদের বা অমুক বোনকে দিয়ে দিতে।' হাদীসে মূলত দু'টি কথার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে ঃ

১. অর্থ ব্যয় ও দানের ক্ষেত্রে মায়ের আত্মীয়দের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী। কারণ, এতে মায়ের প্রতি উত্তম আচরণ করা হয়ে থাকে।

২. মহিলারা স্বামীর অনুমতি ছাড়া নিজের অর্থ সম্পদ থেকে দান খয়রাত করতে পারে।

মহিলাদের জন্যে কাদেরকে দান করা উত্তম ?

(১) ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ আল বুখারীতে আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী যয়নব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে নিবেদন করলো ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি আজ দান সদকার আদেশ করেছেন। আমার সামান্য কিছু অলংকার আছে। আমি সেগুলো দান খয়রাত করে দিতে চাই। কিন্তু ইবনে মাসউদ (অর্থাৎ তার স্বামী) বলেছেন, অন্যদের তুলনায় তিনি এবং তাঁর সন্তানরা আমার এ দান পাবার বেশী হকদার। এ ব্যাপারে আমি আপনার মত জানতে এসেছি। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

صدق ابن مسعود، زوجك وولدك احق من تصد قت به عليهم–

"ইবনে মাসউদ সঠিক বলেছে। তোমার স্বামী এবং তোমার সন্তানরাই তোমার দানলাভের সর্বাধিক হকদার।"

(২) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী যয়নব (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

تصد قن يا معشر النساء ولو من حليكن –

"হে মহিলা সমাজ ! নিজেদের অলংকার দিয়ে হলেও তোমরা দান সদকা করো।"

যয়নব বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উপদেশ শুনবার পর আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছে এসে বললামঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ আমাদের দান সদকা করবার আদেশ

www.bjilibrary.com

করেছেন। কিন্তু আপনি তো এখন খুবই আর্থিক দূরাবস্থার মধ্যে আছেন। সুতরাং আপনি নবী করীমের কাছে গিয়ে জেনে আসুন যে, আমার দানের অর্থ আপনাকে প্রদান করলে এটা আমার দান বলে গণ্য হবে কিনা ? নাকি অন্য কাউকেও দান করতে হবে ? আবদুল্লাহ বললেন, তুমি নিজেই গিয়ে জেনে এসো। সেমতে আমি নিজেই এলাম। এসে দেখি, আমার পূর্বেই নবী করীমের দরজায় এক আনসার মহিলা উপস্থিত রয়েছেন। আমি যে বিষয়টি জানতে এসেছি, তিনিও তাঁর ব্যাপারে হুবহু সে বিষয়টিই জানতে এসেছেন। নবী করীমের মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের কারণে আমরা সরাসরি তাঁর সাথে কথা বলতে সংকোচবোধ করছিলাম। এরি মধ্যে বিলাল বেরিয়ে এলেন। আমরা তাঁকে বললাম ঃ আপনি গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলুন, বাইরে দু'জন মহিলা অপেক্ষা করছে। তারা উভয়েই জানতে চাচ্ছে, নিজের অর্থ সম্পদ থেকে স্বামী এবং পোষ্যদের দান সদকা করলে সেটা দান সদকা বলে গণ্য হবে কিনা ? কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের পরিচয় বলবেন না।

বিলাল ভিতরে গিয়ে বিষয়টি জিজ্ঞেস করলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে জানতে চান, মহিলা দু'জন কে ? তখন বেলাল বললেন ঃ একজন তো কোনো আনসার সাহাবীর স্ত্রী হবেন আর অপরজন যয়নব।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোন্ যয়নব ?

বিলাল ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাদেরকে গিয়ে বলো ঃ

لهما اجران اجر القرابة واجر الصدقة-(بخارى رحـ و مسلم رحـ)

"তারা দু'টি করে সওয়াব লাভ করবে। একটি হলো দান করার সওয়াব আর অপরটি আত্মীয় ও আপনজনকে দান করার সওয়াব।"

উল্লেখিত হাদীসগুলোতে প্রমাণ হলো, স্ত্রী যদি সম্পদশালী হয় এবং তার উপর যদি যাকাত দেয়া ওয়াজিব হয়, তবে সে তার স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে। কিন্তু শর্ত হলো স্বামীকে যাকাত পাবার মতো অভাবী হতে হবে। এটা বৈধ হবার কারণ হলো, স্বামীর সংসার চালানোর জন্যে নিজের অর্থ ব্যয়

www.bjilibrary.com

করবার দায়িত্ব স্ত্রীর নেই। একই ভাবে মহিলারা নিজেদের সন্তানদেরকেও যাকাত দিতে পারে। এ ক্ষেত্রেও শর্ত হলো সন্তানরা যদি যাকাত পাবার মত দরিদ্র হয়, তবেই তাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে।

কিন্তু পুরুষরা নিজের যাকাত নিজের বাবা মা, দাদাদাদী, পরদাদাদাদী, নিজের পুত্র কন্যা এবং নাতী নাতনীদের প্রদান করতে পারবেনা। কেননা এদের ভরণ পোষণের ব্যাপারে এমনিতেই তার উপর দায়িত্ব রয়েছে। শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী ধনী ব্যক্তির এসব আত্মীয় স্বজনও ধনী। কারণ, তার উপর এদের দায় দায়িত্ব বর্তায়। সুতরাং এদেরকে যাকাত দেয়ার অর্থ ধনীকে যাকাত দেয়া এবং নিজের যাকাত দ্বারা নিজে লাভবান হওয়া। অন্য কথায় এমনটি করলে নিজের যাকাত নিজেকে দেয়া হয়। আর নিজের যাকাত নিজেকে দেয়া বৈধ নয়।

একইভাবে কোনো পুরুষ নিজের অর্থ সম্পদের যাকাত নিজের স্ত্রীকে দিতে পারেনা। এটাও বৈধ নয়। আল মুনযেরী লিখেছেন ঃ সমস্ত আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, কোনো পুরুষ তার অর্থ সম্পদের যাকাত তার স্ত্রীকে প্রদান করলে তা আদায় হবেনা। কেননা স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব তো স্বামীর। সুতরাং ধনীব্যক্তির স্ত্রীর যাকাতের কোনো প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ বিধান অনুযায়ী স্বামী ধনী হলে স্ত্রীও ধনী। তবে স্ত্রী যদি ঋণগ্রস্ত হয়ে থাকে, তবে, স্বামী তার যাকাতের অর্থ থেকে কেবল ঋণ পরিশোধ করবার মতো পরিমাণ যাকাত স্ত্রীকে দিতে পারে। এটা শুধুমাত্র ঋণ পরিশোধ করার জন্যে। অন্য কোনো কাজে লাগানো যাবেনা। ঋণগ্রস্তের ঋণ পরিশোধ করার জন্যে যাকাতের অর্থ ব্যয় করার একটি খাত আছে। এটা সেই খাতের অধীনে।[১]

স্বামীকে যাকাত প্রদানের ব্যাপারে মতভেদ

স্বামীকে যাকাত প্রদানের ব্যাপারে ফকীহগণের তিনটি মত পাওয়া যায় ঃ

* একটি মত অনুযায়ী মহিলারা তাদের স্বামী এবং সন্তানদের যাকাত প্রদান করতে পারে। তবে শর্ত হলো, স্বামী বা সন্তানকে যাকাত পাবার উপযুক্ত হতে হবে। এ মতের ফকীহরা আরো বলেছেন, অন্যদের যাকাত প্রদান করার চাইতে স্বামী এবং সন্তানকে যাকাত দিলে অধিক সওয়াব হবে।

---

১. ফিক্‌হুস সুন্নাহ, ঃ ১ম খন্ড, ৪০১ পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

এটি হলো ইমাম শাফেয়ীর মত। ইমাম আবু হানীফার শিষ্যদ্বয় অর্থাৎ ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসানেরও মত এটাই। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতও এটা বলেই বর্ণিত হয়েছে। এ ব্যাপারে ইমাম মালিকের দু'টি মত পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি হলো এই মত।

ইমাম সুফিয়ান সওরী এবং ইবনুল মুনযিরও এই মতই পোষণ করতেন। যাহেরী মযহাবের ইমাম ইবনে হাযম এবং দাউদ যাহেরীরও এটাই মত।[১]

কিন্তু ইমাম আবু হানীফা এবং অন্য কিছু ওলামার মতে স্ত্রী নিজ অর্থসম্পদের যাকাত নিজ স্বামীকে দিতে পারেনা। উপরে ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহার যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, যাতে স্ত্রী স্বামীকে সদকা দিতে পারে বলে বর্ণিত হয়েছে, সেটি সম্পর্কে এঁদের মত হলো, সেখানে বর্ণিত 'সাদাকা' শব্দের ফরয যাকাত নয়, বরং তার অর্থ নফল দান খয়রাত। নিজেদের মতের সপক্ষে তাঁদের যুক্তি হলো, স্বামীকে যাকাত দিলে খাদ্য, বস্ত্র বা অন্য কোনো জিনিসের আকারে নিজের যাকাত নিজের কাছে ফিরে আসবে।

* ইমাম মালিকের বক্তব্য হলো, স্বামী স্ত্রীর নিকট থেকে যাকাতের অর্থ নিয়ে তা থেকে যদি স্ত্রীর খোরপোষের জন্যে ব্যয় করে, তবে স্বামীর জন্যে স্ত্রীর যাকাত গ্রহণ করা এবং স্ত্রীর জন্যে স্বামীকে যাকাত প্রদান করা বৈধ নয়। কিন্তু স্বামী যদি স্ত্রীর কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করে অন্য কোনো খাতে ব্যয় করে, তবে স্বামীকে যাকাত প্রদান করা বৈধ।

সারকথা

স্ত্রী তার স্বামীকে যাকাত দিতে পারে কিনা, এ ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে। সেগুলো হলো ঃ

১. একটি মত অনুযায়ী স্ত্রী কর্তৃক তার স্বামীকে যাকাত প্রদান করা হারাম। এটি ইমাম আবু হানীফার মত।

২. দ্বিতীয় মতটি হলো, স্ত্রী কর্তৃক তার স্বামীকে যাকাত প্রদান করা এ মতটি হলো ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ[২] এবং ইমাম শাফেয়ীর।

---

১. নাইলুল আওতার ঃ ৫ম খন্ড ২৩৪ পৃষ্ঠা এবং ফিক্‌হুস সুন্নাহ ঃ ১ম খন্ড ৪০৬ পৃষ্ঠা।

২. এরা দু'জন হানাফী মযহাবের প্রধান তিন ইমামের দুইজন।

www.bjilibrary.com

আরেকটি বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলেরও এটাই মত। যাহেরী মযহাবের ইমামগণেরও এটাই মত। মালেকী মযহাবের ইমাম আশহাবের এটাই মত। এছাড়া ইমাম সুফিয়ান সওরী এবং ইবনুল মুনযিরও এই মতই দিয়েছেন।

৩. তৃতীয় মত অনুযায়ী স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে যাকাত প্রদান করা মাকরূহ। মালেকী মযহাবে এই মতটিই অগ্রাধিকার পেয়েছে।

আমাদের মতে স্বামী অভাবী বা ঋণী হয়ে পড়লে স্ত্রী নিজ অর্থের যাকাত স্বামীকে প্রদান করতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে স্বামীকে এই দায়িত্ব নিতে হবে যে, এ অর্থের কোনো অংশই যেনো কোনো আকারে স্ত্রীর দিকে প্রত্যাবর্তন না করে।

মা কি পুত্রকে যাকাত দিতে পারে ?

একটু আগেই আমরা বুখারীর এই হাদীসটি উল্লেখ করে এসেছি ঃ

زوجك وولدك احق من تصدقت عليهم -

"অন্যদের তুলনায় তোমার স্বামী এবং তোমার সন্তানরাই তোমার সাদাকা পাবার অধিক হকদার।"

এর ব্যাখ্যায় ইবনুল মুনযির লিখেছেন, এখানে সাদাকা বলে ওয়াজিব সাদাকা অর্থাৎ যাকাত বুঝানো হয়নি। এ ব্যাপারে আলিমদের ইজমা (ঐকমত্য) রয়েছে। এ প্রসংগে ইবনুল মুনযির আরো বলেন, মূলনীতি হলো, এমন কাউকেও ওয়াজিব সাদাকা (অর্থাৎ যাকাত) দেয়া যাবেনা, যার ভরণ পোষণের দায় দায়িত্ব যাকাত দাতার উপর রয়েছে। পিতার বতর্মানে সন্তানদের ভরণ পোষণের দায়দায়িত্ব মাতার উপর বর্তায়না।

কিন্তু যাকাত ফরয হয়েছে এমন মহিলার উপর যদি শরয়ীভাবে তার পুত্র কন্যা, বাপদাদা, কিংবা পরদাদা প্রভৃতি কারো ভরণ পোষণের দায়িত্ব বর্তায়, তবে এদের কাউকেও তিনি যাকাত দিতে পারবেননা। কারণ, তার উপর আইনত তাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব বর্তিয়েছে। যেমন ধরুন একটি শিশুর পিতা মারা গেলো এবং শিশুটি সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে পড়লো। কিন্তু তার মা আছে এবং মার অগাধ অর্থ সম্পদও আছে। এখন শিশুটির মা ছাড়া আর কেউ যদি তার কফীল (দায়িত্ব গ্রহণকারী) না থাকে, তবে এমতাবস্থায় মার

www.bjilibrary.com

উপরই তার দায় দায়িত্ব বর্তায়। সুতরাং মা তার জন্যে যাকাতের অর্থ ব্যয় করতে পারবেননা।

মুহাদ্দিস আছরাম (র) তাঁর সুনানে লিখেছেন যে, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, তোমাদের কোনো নিকটাত্মীয়ের প্রতিপালনের দায়দায়িত্ব যদি তোমাদের উপর না বর্তায়, তবে তোমরা নিজেদের অর্থ সম্পদের যাকাত তাকে দিতে পারো। কিন্তু কোনো নিকটাত্মীয়ের প্রতিপালনের দায় দায়িত্ব যদি তোমাদের উপর বর্তায়, তবে তোমাদের অর্থ সম্পদের যাকাত তাকে দিতে পারবেনা। কারণ, এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো, যেসব লোক কোনো ব্যক্তির পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়, তিনি তাদের যাকাত দিতে পারেন। কিন্তু কারো ভরণ পোষণ ও প্রতিপালনের দায় দায়িত্ব যদি কোনো ব্যক্তির উপর বর্তায়, তিনি তাকে যাকাত দিতে পারেননা।[১]

মহিলাদের সাদাকাতুল ফিতর

ঈদুল ফিতরের পূর্বে যে সাদাকা প্রদান করতে হয়, তাকে সদাকাতুল ফিতর বলা হয়। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের ঈদুল ফিতরের দিন সকল মুসলমানের উপর সদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব করে দিয়েছেন। স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ, নারী, শিশু সকলের উপর এ সদাকা প্রদান করা ওয়াজিব করেছেন। এর পরিমাণ নির্ধারিণ করেছেন এক সা' পরিমাণ খেজুর বা যব।

এ হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী এবং ইবনে মাজাতে বর্ণিত হয়েছে।

এ হাদীস থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, রমজানুল মুবারক সম্পন্ন হবার সাথে সাথে ফিতরা ওয়াজিব হয়। তাছাড়া এ ফিতরা প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ নারী, শিশু বৃদ্ধ এবং স্বাধীন গোলাম সকলের উপর ওয়াজিব।

ফিতরা এমন স্বাধীন মুসলামনের উপর ওয়াজিব, যিনি নিজ পরিবারের একদিন একরাতের খাদ্যের অতিরিক্ত এক সা' খেজুর কিংবা এক সা' যবের মালিক হবেন।

এটা হলো ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মত। ইমাম শওকানী লিখেছেন, এটাই হলো বিশুদ্ধ এবং সঠিক মত।

১.নাইলুল আওতার ৫ম খন্ড, ২৩৫ পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

হানাফী মযহাবে ফিতরা ওয়াজিব হবার জন্যে যাকাতের নিসাব পরিমাণ অর্থ সম্পদের মালিক হওয়া শর্ত।

এক সা' বলতে বুঝায় মধ্যম স্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তির দুই হাতের এক কোষ পরিমাণ।

প্রত্যেক স্বাধীন মুসলিম ব্যক্তির জন্যে নিজের এবং পোষ্যদের ফিতরা পরিশোধ করা ওয়াজিব। পোষ্য বলতে বুঝায় সেসব লোককে যাদের ভরণ পোষণের দায় দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত রয়েছে। যেমন ঃ স্ত্রী, সন্তান, চাকর বাকর ইত্যাদি।

উল্লেখিত হাদীসটি থেকে বাহ্যত একথাও বুঝা যায় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ নারী, স্বাধীন দাস, শিশু বৃদ্ধ সকলের উপর ফিতরা ওয়াজিব করেছেন এবং এরা সকলেই নিজ মাল থেকে নিজেরা ফিতরা পরিশোধ করবে।

সুতরাং হাদীসের শব্দাবলী থেকে বাহ্যিক অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কোনো মহিলার স্বামী থাকুক বা না থাকুক তার ফিতরা তার নিজেকেই পরিশোধ করতে হবে এবং নিজের অর্থ থেকেই পরিশোধ করতে হবে। তবে শর্ত হলো ফিতরা ওয়াজিব হবার অন্যান্য শর্ত বর্তমান থাকতে হবে। ইমাম দাউদ যাহেরী হাদীসের এই বাহ্যিক অর্থই গ্রহণ করেছেন। ইমাম সুফিয়ান সওরী, ইমাম আবু হানীফা এবং ইবনুল মুনযির থেকেও অনুরূপ মত বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইমাম লাইছ ও ইসহাকের মতে মহিলাদের ফিতরা প্রদান করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। কেননা তাদের সমস্ত ভরণ পোষণের দায় দায়িত্বই তো স্বামীর উপর ন্যস্ত থাকে। সুতরাং তাদের ফিতরা প্রদান করাও স্বামীর উপরই ন্যস্ত হবে।

হাফিয ইবনে হাজর লিখেছেন, অনেক আলিমের মতে সাধারণ ভরণ পোষণ এবং ফিতরার মধ্যে পার্থক্য আছে।

আমাদের মতে, মহিলাদের নিজের মাল সম্পদ থেকে নিজেই ফিতরা পরিশোধ করা কর্তব্য। অবশ্য ফিতরা ওয়াজিব হবার শর্তাবলী বর্তমান থাকতে হবে। স্বামী তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব পালন করছে, সেটি একটি ভিন্ন ব্যাপার। নিজের ফিতরা নিজের অর্থসম্পদ পরিশোধ করা দীনি দৃষ্টিভঙ্গির অধিকতর কাছাকাছি।

www.bjilibrary.com

২৫. মহিলাদের রোযার বিধান

রোযা ফারসী শব্দ। বাংলা ভাষায় রোযা শব্দই চালু হয়ে গেছে। মূল আরবী শব্দ হলো সাওম (صوم) 'সাওম' মানে থামানো, বাধা দেয়া, নিষেধ করা। যেমন কুরআন মজীদের এ আয়াতটির অর্থ হলো ঃ اِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا 'আমি রহমানের জন্যে সাওমের মান্নত মেনেছি।' অর্থাৎ আমি কথা না বলার মান্নত করেছি।

শরীয়তের পরিভাষায় 'সাওম' মানে–সূর্যদোয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পূর্ণ দিন এমনসব কাজ থেকে বিরত থাকা যেগুলোর দ্বারা রোযা ভংগ হয়ে যায় এবং এ প্রসংগে শরীয়ত প্রদত্ত যাবতীয় শর্তাবলীর অনুসরণ করা।

রোযার প্রকার ভেদ

রোযা চার প্রকার। যেমন ঃ

১. ফরয রোযা,

২. হারাম রোযা,

৩. মুস্তাহাব রোযা,

৪. মাকরূহ রোযা।

১. ফরয রোযা

রমযান মাসের রোযা হলো ফরয রোযা। ঐ মাসের মধ্যে রাখা যেমন ফরয, পরে কাযা করলেও তা ফরয।

এছাড়া কাফ্ফারা এবং মান্নতের রোযাও এই প্রকারের অন্তরভুক্ত। (শেষোক্ত দু'টিকে কেউ কেউ ওয়াজিব রোযা বলেছেন।—অনুবাদক)

২. হারাম রোযা

—ঈদুল ফিতরের দিন রোযা রাখা হারাম।

—ঈদুল আযহার দিন এবং ঈদুল আযহার পরবর্তী তিন দিন রোযা রাখা হারাম। অবশ্য কেউ যদি হজ্জে গিয়ে হজ্জে তামাত্তু কিংবা হজ্জে কিরান করে, তবে সে ঈদুল আযহার পরবর্তী দুই দিন রোযা রাখতে পারে। কিন্তু তৃতীয় দিন অর্থাৎ ঈদুল আযহার দিনসহ গুণে চতুর্থ দিন রোযা রাখা তার জন্যে মাকরূহ।

www.bjilibrary.com

—স্বামীর অনুমতি ছাড়া মহিলাদের জন্যে নফল রোযা রাখা হারাম। তবে স্বামী বাড়িতে অনুপস্থিত থাকলে, কিংবা ইহরাম অবস্থায় থাকলে, অথবা ই'তেকাফ অবস্থায় থাকলে হারাম হবেনা। (কেউ কেউ বলেছেন স্বামীর অনুমতি ছাড়া রোযা রাখা মাকরূহ।—অনুবাদক)

৩. মুস্তাহাব রোযা

—মহররম মাসের রোযা মুস্তাহাব। এ মাসের সর্বোত্তম রোযার দিন হলো ৯ ও ১০ তারিখের রোযা।

—প্রত্যেক চন্দ্রমাসের তের, চৌদ্দ ও পনর তারিখে রোযা রাখা মুস্তাহাব।

—যিল হজ্জমাসের নয় তারিখ অর্থাৎ বকরা ঈদের আগের দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব। তবে এটা তাদের জন্যে যারা হজ্জরত নয়।

—প্রত্যেক সাপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবার এই দুই দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব।

—শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখা মুস্তাহাব। তবে ঈদুল ফিতরের পরবর্তী ছয়দিন রাখা উত্তম।[১]

৪. মাকরূহ রোযা

—সন্দেহের দিন রোযা রাখা মাকরূহ। অর্থাৎ চাঁদ দেখার ব্যাপারে সন্দেহ থাকলে সেদিনকার রোযা মাকরূহ।

—কেবলমাত্র শুক্রবার কিংবা কেবলমাত্র শনিবার রোযা রাখা মাকরূহ।

—নববর্ষের দিন কিংবা বিধর্মীদের উৎসবের দিন রোযা রাখা মাকরূহ।

—রমজান মাস শুরু হবার এক বা দুই দিন পূর্বে রোযা রাখা মাকরূহ।

[অবশ্য রোযাকে আরেকটি ভাগে ভাগ করা যায়। সেটা হলো 'নফল রোযা।' উপরের চার প্রকার দিন ও রোযা ছাড়া বছরের যেকোনো দিন রোযা রাখা হলে সেটা নফল রোযা বলে গণ্য হবে। তবে বিরতিহীনভাবে ক্রমাগত নফল রোযা রাখা মাকরূহ।—অনুবাদক]

হায়েয ও নিফাস অবস্থায় রোযা রাখা হারাম

মহিলাদের হায়েয এবং নিফাস এমন প্রাকৃতিক বিপত্তি, যার ফলে তাদের জন্যে রোযা না রাখাটা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সুতরাং কোনো মহিলার

১. কোনো কোনো ফকীহ মুস্তাহাব রোযাকে সুন্নাত ও মুস্তাহাব এই দুইভাগে ভাগ করেছেন।—অনুবাদক

www.bjilibrary.com

যদি রোযা অবস্থায় মাসিক আরম্ভ হয়ে যায়, কিংবা সন্তান প্রসবের ঘটনা ঘটে, তবে তার রোযা ভংগ করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য। এমতাবস্থায় রোযা রাখা হারাম।

কোনো মহিলা যদি এরূপ অবস্থায় রোযা রাখে তবে তার রোযা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এ রোযার কাযা করতে হবে। কেননা মহিলাদের জন্যে রোযা রাখার অন্যতম শর্ত হলো হায়েয নিফাস থেকে পবিত্র থাকা। হায়েয নিফাস অবস্থায় রোযা রাখা যায়না।

যদিও রমযান মাসের রোযা রাখা তার জন্যে ফরয, কিন্তু শরীয়তের বিধান মুতাবিক এ সময় রোযা রাখা তার নিষিদ্ধ। অবশ্য ঐসব দিনের রোযার কাযা দেয়া মহিলাদের জন্যে ওয়াজিব, যেসব দিন হায়েয কিংবা নিফাসের কারণে তারা রোযা রাখতে পারেনি। এ ব্যাপারে গোটা মুসলিম উম্মাহ্ একমত।

*** শাফেয়ীদের মতে রোযার শর্ত দুই প্রকার ঃ**

১. রোযা ফরয হবার শর্তাবলী,

২. রোযা বিশুদ্ধ হবার শর্তাবলী।

রোযা ফরয হবার শর্তাবলী হলো, শারীরিক ও শরয়ী দিক দিয়ে রোযা রাখার শক্তি ও সামর্থ থাকতে হবে। যেমন, কারো যদি অধিক বয়েস হয়ে গিয়ে থাকে, কিংবা দূরারোগ্য ব্যধি হয়ে থাকে এবং এসব কারণে রোযা রাখতে অক্ষম হয়ে থাকে, তবে এ হচ্ছে শারীরিক অক্ষমতা।

পক্ষান্তরে হায়েয ও নিফাসের কারণে রোযা রাখতেনা পারাটা শরয়ী অক্ষমতা।

আর রোযা বিশুদ্ধ হবার শর্তাবলীর মধ্যে রয়েছে রোযাদার মহিলার হায়েয, নিফাস এবং প্রসবের রক্ত থেকে পবিত্র হওয়া।

*** হানাফীদের মতে রোযার শর্তাবলী তিন প্রকার ঃ**

১. রোযা ফরয হবার শর্তাবলী,

২. রোযা রাখা ওয়াজিব হবার শর্তাবলী এবং

৩. রোযা বিশুদ্ধ হবার শর্তাবলী।

www.bjilibrary.com

প্রথম এবং তৃতীয় প্রকারের শর্তাবলী তো পরিষ্কার। আর দ্বিতীয় প্রকারের শর্তাবলী হলো ঃ

(ক) রোযা রাখা ওয়াজিব হবার শর্ত হলো হায়েয নিফাস থেকে পবিত্র হওয়া। সুতরাং কোনো মহিলা যদি হায়েয কিংবা নিফাস অবস্থায় রোযা রাখে, তবে তার রোযা হবেনা, যদিও তার উপর রোযা ফরয।

(খ) রোযা রাখা ওয়াজিব হবার দ্বিতীয় শর্ত হলো নিয়ত করা। সুতরাং কেউ যদি নিয়ত ছাড়াই রোযা রাখে, তবে তার রোযা হবেনা। কারণ, নিয়তই অভ্যাস এবং ইবাদাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। মনে মনে 'আমি রোযা রাখছি' বলে সিদ্ধান্ত নিলেই নিয়তের শর্ত পূর্ণ হয়ে যাবে। তবে কেউ যদি 'আমি রোয়া রাখছি' বলে মুখেও উচ্চারণ করে তবে তা আরো ভাল। কারণ নিয়ত করা সুন্নাত পদ্ধতি।

*** মালিকী মযহাবেও রোযার শর্ত তিনটি ঃ**

১. কেবল রোযা ফরয হবার শর্ত,

২. কেবল রোযা বিশুদ্ধ হবার শর্ত এবং

৩. রোযা ফরয হবার ও রোযা বিশুদ্ধ হবার যৌথ শর্ত।

রোযা ফরয হবার এবং রোযা বিশুদ্ধ হবার যৌথ শর্ত হলো, রোযাদারকে হায়েয এবং নিফাস থেকে পবিত্র হতে হবে। সুতরাং ঋতুবতী এবং নিফাসওয়ালীর উপর রোযা ফরযও নয় এবং সে রোযা রাখলে তার রোযা বিশুদ্ধ হবেনা। কিন্তু এরূপ কোনো মহিলা সূর্যোদয়ের একেবারে পূর্বমুহূর্তে পবিত্র হলেও তার জন্যে রোযার নিয়ত করা ওয়াজিব হয়ে যায়। তাছাড়া ঋতুবতী ও নিফাসওয়ালীর জন্যে সেইসব দিনের রোযার কাযা করাও ওয়াজিব, যে দিনগুলোতে মাসিক বা নিফাস চলছিল বিধায় সে রোযা রাখতে পারেনি। অর্থাৎ হায়েয এবং নিফাস রোযা রাখার জন্যে একটা বিপত্তি। এ বিপত্তি দূর হবার সাথে সাথেই তার উপর রোযা রাখা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

*** হাম্বলী মযহাবেও রোযার শর্ত তিন প্রকার ঃ**

১. রোযা ওয়জিব (ফরয) হবার শর্তাবলী,

২. রোযা বিশুদ্ধ হবার শর্তাবলী এবং

৩. সেইসব শর্তাবলী, যেগুলো রোযা ফরয হবার জন্যেও জরুরী। আবার রোযা বিশুদ্ধ হবার জন্যে জরুরী।

www.bjilibrary.com

হাম্বলীদের মতে হায়েয এবং নিফাসের রক্ত বন্ধ হওয়াটাই রোযা বিশুদ্ধ হবার শর্ত। সুতরাং হায়েয এবং নিফাস অবস্থায় রোযা রাখা দুরস্ত নেই। কিন্তু এ অবস্থায়ও রোযার ফরয তার ঘাড়ে ঝুলেই থাকছে।[১]

মাসিক আরম্ভ হবার সম্ভাবনা থাকলে রোযার নিয়ত করবে কি ?

রোযা রাখা ফরয এমন কোনো ব্যক্তি যদি রমযান মাসে রোযা না রাখার জন্যে এমন কোনো ওযরের আশ্রয় নেন, যা সংঘটিত হয়নি, তবে সংঘটিত হবার সম্ভাবনা আছে আবার সংঘটিত না হবারও সম্ভাবনা আছে, এমতাবস্থায় মালিকী মযহাবের মতে তার উপর কাফফরা ওয়াজিব হবে।

এই বিধানটির উদাহরণ হলো সেই মহিলা যার নির্দিষ্ট তারিখ ও দিনক্ষণে মাসিক আরম্ভ হবার অভ্যাস আছে। এখন সেই মহিলা যদি আগামীকাল তার মাসিক আরম্ভ হবে মনে করে রাত্রেই রোযার নিয়ত না করলো, ভাবলো কালকেতো আমি রোযা থাকবনা এবং পরের রোযা থাকলওনা, তবে তার কাফফরা ওয়াজিব হয়ে যাবে। এমনকি সেদিন যদি তার মাসিক আরম্ভ হয়ও, তবু কাফফরা তার উপর ওয়াজিব হবে। এটা এই জন্যে যে, মাসিক আরম্ভ হবার অর্থাৎ কারণ সংঘটিত হবার পূর্বেই সে রোযা না রাখার নিয়ত করে বসেছে।

রমযানে দিনের বেলায় মাসিক আরম্ভ বা বন্ধ হলে কি করবে ?

রমযান মাসে রোযা রাখা অবস্থায় যদি কারো রোযা নষ্ট হয়ে যায়, যেমন কোনো মহিলার যদি মাসিক আরম্ভ হয়ে যায়, তবে রমযানের সম্মানার্থে দিনের বাকী অংশ রোযাদারের মতোই পানাহার থেকে বিরত থাকাটা তার জন্যে কর্তব্য। কিন্তু যদি রমযান মাস ছাড়া অন্য কোনো দিন রোযা রাখা অবস্থায় রোযা নষ্ট হয়ে যায়, চাই তা মান্নতের রোযা হোক, কাফফরার রোযা হোক, রমযানের কাযা রোযা হোক কিংবা নফল বা অন্য কোনো রোযা হোক তবে দিনের বাকী অংশে পানাহার থেকে বিরত থাকা জরুরী নয়।

---

১. আল ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবায়াহ ঃ পৃ ঃ ২৯৬-২৯৯।

www.bjilibrary.com

একইভাবে কারো যদি এমন কোনো ওযর বা বিপত্তি দেখা দেয়, যার কারণে তার জন্যে রমযানের রোযা না রাখা বৈধ এবং মুবাহ হয়ে যায়। অতপর দিনের বেলায় যদি সেই ওযর বা বিপত্তি দূর হয়ে যায়, তবে রমযানের মর্যাদা রক্ষার্থে দিনের বাকী অংশটা রোযাদারের মতোই পানাহার না করে অতিবাহিত করা তার জন্যে কর্তব্য। যেমন রমযানের দিনের বেলায় যদি কোনো ঋতুবতীর ঋতুশ্রাব বন্ধ হয়ে যায়, কিংবা কোনো মুসাফিরের সফর শেষ হয়ে যায় এবং তিনি মকীম হয়ে যান, তবে তাদের উপর এই বিধান প্রযোজ্য হবে।

শাফেয়ীদের মতে, এরূপ অবস্থায় পানাহার থেকে বিরত থাকা সুন্নত, ওয়াজিব নয়।

মালেকীদের মতে, এরূপ অবস্থায় পানাহার থেকে বিরত থাকা ওয়াজিবও নয়, মুস্তাহাবও নয়। অর্থাৎ রমযান মাসের দিনের বেলায় যদি কোনো ঋতুবতীর ঋতু বন্ধ হয়ে যায়, তবে তার জন্যে পানাহার থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব নয়। বরঞ্চ দিনের বাকী অংশ সে পানাহার করতে পারে।

হায়েয নিফাসের কারণে ভংগ করা রোযার কাযা করা ফরয

সহীহ মুসলিমে উল্লেখ হয়েছে, মুয়াযা বর্ণনা করেছেন যে, আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ঃ 'মহিলাদের ঋতুর কারণে ভংগ হওয়া রোযার কাযা করা ওয়াজিব, অথচ ঋতুর কারণে পড়তে না পারা নামাযের কাযা ওয়াজিব নয় কেন ?' আয়িশা আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করেন ঃ 'তুমি কি খারেজী' ? মুয়াযা বলেন, আমি বললাম ঃ'জী-না, আমি খারেজী নই। তবে বিষয়টি আমি জানার জন্যে জিজ্ঞেস করেছি।' তখন উম্মুল মু'মিনীন বললেন ঃ "কারণ আবার কি ? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মাসিকের কারণে ভংগ হওয়া রোযার কাযা করবার নির্দেশ দিয়েছেন আর নামাযের কাযা দেবার নির্দেশ দেননি।"

এটি সর্বসম্মত ফয়সালা এবং সকল মযহাবের আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, হায়েয নিফাস চলাকালে নামায পড়া এবং রোযা রাখা ফরয নয়। এ ব্যাপারেও সকলেই একমত যে, হায়েয নিফাসের কারণে ভংগ হওয়া নামাযের কাযা দেয়া ওয়াজিব নয়। কিন্তু রোযার কাযা দেয়া ওয়াজিব। হায়েয

www.bjilibrary.com

নিফাসের কারণে ভংগ হওয়া নামায ও রোযার বিধানের ক্ষেত্রে এই তারতম্যের প্রকৃত কারণ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তবে সম্ভবত রোযা যেহেতু প্রতিদিন একটি আর নামায প্রতিদিন পাঁচ বার, তাই হায়েয নিফাস কালে ভংগ হওয়া নামযের পরিমাণ রোযার তুলনায় অনেক বেশী দাঁড়ায় এবং এ কারণে এর কাযা দেয়াও অধিকতর কষ্টসাধ্য। অথচ আল্লাহ তো মানুষের জন্যে তাঁর বিধানকে সহজ করতে চান। এ জন্যেই হয়তো তিনি মহিলাদেরকে অধিকতর কষ্টসাধ্য কাযার কাজটি থেকে রেহাই দিয়েছেন।

সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণে হায়েয নিফাস থেকে পবিত্র হলে—

আমরা ইতিপূর্বে মালিকী মযহাবের মত উল্লেখ করেছি যে, কোনো মহিলা ভোর হবার এক মুহূর্ত পূর্বে পবিত্র হলেও সাথে সাথেই সেদিনকার রোযা রাখার নিয়ত করা তার জন্যে ওয়াজিব। এ মতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম নববী লিখেছেন ঃ হায়েয বা নিফাসের রক্ত রাতের যে কোনো সময় যদি বন্ধ হয় এবং সে মহিলা সূর্যোদয়ের পূর্বে গোসলও যদি না করে থাকে এবং এমতাবস্থায়ই রোযা রাখে, তবে তার রোযা বিশুদ্ধ হবে। এমতাবস্থায় রোযা রাখা এবং রোযা পূর্ণ করা তার উপর ওয়াজিব। সূর্যোদয়ের পূর্বে মহিলাটি ইচ্ছাকৃত গোসল না করে থাকুক, কিংবা ভুল বশত না করে থাকুক, অথবা ওজরের কারণে না করে থাকুক, তাতে কিছু যায় আসে না। তার এ অবস্থাটি ঐ পুরুষ বা মাইলার রোযার সাথে তুলনীয়, যার উপর গোসল ফরয হয়েছে, কিন্তু গোসল না করেই রোযা রাখার নিয়ত করেছে, রোযা রেখেছে এবং রোযা বিশুদ্ধও হয়েছে। কারণ ফরয গোসলের সাথে তো রোযা শুদ্ধ অশুদ্ধ হবার কোনো সম্পর্ক নেই। একই ভাবে হায়েয নিফাস বন্ধ হবার পর গোসল করেই রোযা রাখা আরম্ভ করতে হবে, এমনও কোনো শর্ত নেই।[১] ইমাম নববী আরো লিখেছেন, এটাই শাফেয়ী মযহাবের মত। অন্য আলেমদের মতও এটাই। কোনো কোনো সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে এর খেলাফ মতও আছে। তবে তাদের মতের পক্ষে কোনো সহীহ হাদীস আছে কিনা, আমরা জানিনা।[২]

---

১. সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা ঃ ইমাম নববী।

২. ঐ

www.bjilibrary.com

স্বামীর উপস্থিতিতে নফল রোযার বিধান

ইমাম বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ আবু হুরাইরা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لا يحل لا مرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ولا تأذن فى بيته الا باذنه –

"কোনো মহিলার জন্যে স্বামীর উপস্থিতিতে স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখা জায়েয নয়। তাছাড়া, স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোনো মহিলার জন্যে নিজের ঘরে অপর কাউকেও আসতে দেয়া বৈধ নয়।"

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলও তাঁর মুসনাদে এই হাদীসটি সংকলন করেছেন। তাঁর বর্ণনায় (الاَّ فِى رَمَضَانَ) "তবে রমযান ব্যতীত" এবং আবু দাউদের কোনো কোনো বর্ণনায় (غَيْرَ رَمَضَانَ) রমযান ব্যতীত" কথাটি উল্লেখ আছে। অর্থাৎ রমযান মাস ব্যতীত অন্য সময় স্বামীর অনুমতি ছাড়া রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে।

তিরমিযী এবং ইবনে মাজায় হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

لا تصم المرأة وزوجها شاهد يوما غير شهر رمضان الا باذنه

কোনো মহিলা যেনো তার স্বামীর উপস্থিতিতে তাঁর অনুমতি ছাড়া রোযা না রাখে। তবে রমযানের রোযার ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য নয়।

এ হাদীসগুলো থেকে আমরা জানতে পারলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে স্বামী নিকটে উপস্থিত থাকা অবস্থায় স্বামীর অনুমতি ছাড়া রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। তবে এ নিষেধাজ্ঞা ফরয রোযার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

আলিমগণ এ নিষেধাজ্ঞাকে হারাম পর্যায়ে গণ্য করেছেন। অর্থাৎ রমযান মাস ছাড়া অন্য সময়ে স্বামী যদি কাছে উপস্থিত থাকে, তবে স্বামীর অনুমতি ছাড়া রোযা রাখা হারাম। এমনকি কোনো মহিলা যদি স্বামীর অনুমতি ছাড়া এরূপ অবস্থার রোযা রাখে, তবে স্বামীকে তার রোযা ভংগ করানোর অধিকার দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ স্বামী ইচ্ছা করলে তার স্ত্রীর এই রোযা ভাংগতে পারে।

www.bjilibrary.com

কারণ এখানে তো স্ত্রী স্বামীর অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে। তবে স্বামীর এই অধিকার প্রযোজ্য হবে কেবল রমযান ছাড়া অন্য সময়ের নফল রোযার ক্ষেত্রে। রমযানের রোযা রাখার ব্যাপারে স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন নেই। কেননা এই রোযা রাখা তো স্বয়ং আল্লাহর নির্দেশ। আর সৃষ্টির ইচ্ছা বা আদেশে স্রষ্টার নির্দেশ লংঘন করা যায়না।

মহিলাদের নফল রোযা রাখার জন্যে দু'টি শর্ত পূরণ হতে হবে। একটিতো গেলো স্বামীর অনুমতি। আর দ্বিতীয়টি হলো বাড়ীতে স্বামীর উপস্থিতি। অর্থাৎ স্বামী সফরে নন, বরং সেদিন বাড়ীতেই আছেন বা থাকবেন। কিন্তু স্বামী যদি সেদিন বাড়ীতে না থাকেন, বা বাড়ী ফেরার সম্ভাবনা না থাকে, তবে স্বামীর অনুমতি নেয়া জরুরী নয়। এমতাবস্থায় স্বামীর অনুমতি ছাড়াও মহিলারা নফল রোযা রাখতে পারে। তবে নফল রোযা রাখা কালে স্বামী যদি বাড়ী এসে পৌছায় সে ক্ষেত্রে স্ত্রীর রোযা ভাংবার অধিকার স্বামীর আছে।

কোনো মহিলার স্বামী যদি রোগাক্রান্ত হন এবং স্ত্রীসহবাসে অক্ষম হন, তবে সে মহিলার নফল রোযা রাখাটা স্বামীর অনুপস্থিতির বিধান অনুযায়ী হবে। অর্থাৎ এরূপ অবস্থায় স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়াই নফল রোযা রাখতে পারে।[১]

"আল ফিক্‌হ্ আলাল মাযাহিবিল আরবায়া" গ্রন্থে বলা হয়েছে, স্বামীর অনুমতি ছাড়া এবং স্বামী স্ত্রীর নফল রোযা রাখাটা পসন্দ করে নাকি করেনা তা না জেনে নফল রাখা হারাম রোযার অন্তরভুক্ত। তবে স্বামীর যদি স্ত্রীকে প্রয়োজন না হয় তবে স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখাটা হারাম নয়, যেমন—স্বামী যদি বাড়ীতে অনুপস্থিত থাকে, অথবা ইহরাম অবস্থায় থাকে, কিংবা ই'তেকাফ অবস্থায় থাকে।

* হানাফী মযহাবে মহিলাদের জন্যে স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখা মাকরূহ।

* হাম্বলী মযহাবে, স্বামী বাড়ীতে উপস্থিত থাকা অবস্থায় তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর নফল রোযা রাখা নাজায়েয। এমনকি কোনো কারণে স্বামী সহবাসে অক্ষম (যেমন রোগ, ইহরাম, ই'তেকাফ) হলেও এমনটি করা নাজায়েয।

---

১. ফিক্‌হুস সুন্নাহ ঃ ১ম খন্ড, ৪৪৮–৪৪৯ পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

গর্ভবতী ও শিশুকে স্তন্যদানকারী মহিলাদের জন্যে অবকাশ

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ۔

"আর সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যারা রোযা রাখবেনা, তারা যেনো ফিদইয়া (বিনিময়) দান করে। এক রোযার ফিদইয়া হলো একজন দরিদ্রকে খাদ্য দান করা।" [আল বাকারা ঃ ১৮৪]

এই আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসংগে কয়েকটি হাদীস রয়েছে। হাদীসগুলো নিম্নোরূপ ঃ

(১) সুনানে আবু দাউদে ইকরামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ –আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসংগে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন ঃ এই অবকাশ শুধু মাত্র অতি-বৃদ্ধ পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এরূপ বৃদ্ধরা যদি খাদ্যদানের সামর্থ রাখেন, তবে নিজেরা রোযা না রেখে দরিদ্র মিসকীনদের খাদ্য দান করবেন। প্রতিটি রোযার জন্যে একজন মিসকীনকে একদিনের খাদ্য দান করবেন। একইভাবে গর্ভবতী ও শিশুকে স্তন্যদানকারী মহিলারা যদি সন্তানের স্বাস্থ্যগত ক্ষতির আশাংকা করেন, তবে তারাও রোযা না রেখে প্রতিটি রোযার জন্যে একজন মিসকীনকে একদিনের খাদ্য দান করবেন।

এই হাদীসটি ইমাম বাযযার ও তাঁর গ্রন্থে সংকলন করেছেন। সেখানে এই অতিরিক্ত কথাটিও আছে যে, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাঁর এক দাসীকে যে সন্তানের মা ও গর্ভবতী ছিলো বলতেন ঃ তুমি সেইসব লোকদের অন্তরভুক্ত যারা রোযা রাখার সামর্থ রাখেনা। সুতরাং তুমি ফিদইয়া দেবে এবং তোমার এই রোযার আর কাযা দিতে হবেনা।

ইমাম দারুকুতনী বলেছেন, এই হাদীসটির সূত্র বিশুদ্ধ—সহীহ।

www.bjilibrary.com

(২) ইমাম মালিক এবং ইমাম বায়হাকী নাফে' থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ 'গর্ভবতী যদি রোযা রাখলে তার বাচ্চার ক্ষতি হবে বলে আশংকা করে তবে সে কি করবে ?' তিনি জবাব দিলেন ঃ এমতাবস্থায় সে রোযা রাখবেনা এবং প্রতিটি রোযার জন্যে একজন মিসকীনকে এক মুদ্দ গম দান করবে।

(৩) আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

ان الله عز و جل و ضع عن المسافر الصوم و شطر الصلوة وعن الحبلى و المرضع الصوم - (ترمذى رحـ وحسنه)

"মহান আল্লাহ মুসাফিরের [ভ্রমণকারীর] উপর থেকে রোযা এবং নামায অর্ধেক রহিত করেছেন। আর গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মহিলাদের উপর থেকে রোযা সরিয়ে দিয়েছেন।"

সুতরাং গর্ভবতী যদি রোযা রাখার কারণে তার গর্ভের বাচ্চার ক্ষতির আশংকা করে, তবে রোযা না রাখা তার জন্যে জায়েয।—এ বিষয়ে আলিমদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই।

একইভাবে স্তন্যদানকারিনী যদি রোযা রাখার কারণে তার স্তন্যপায়ী সন্তানের ক্ষতির আশংকা করে, তবে তার জন্যেও রোযা না রাখা জায়েয।

এমতাবস্থায় উভয় ধরনের মহিলাদেরকেই ফিদইয়া দিতে হবে। অর্থাৎ একটি রোযার বিনিময়ে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করতে হবে।

এখানে আরেকটি কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার। তাহলো, 'সন্তানের ক্ষতির আশংকা করার' অর্থ নিজে নিজে মনে করা নয়। বরং এর অর্থ 'নিশ্চিত হওয়া' বা 'প্রবল আশংকা হওয়া'। আর নিশ্চিত হওয়া এবং প্রবল আশংকা করার পদ্ধতি হলো, কোনো বিজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে জানা, কিংবা অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝতে পারা, অথবা কোনো চিহ্ন বা নিদর্শন দেখে উপলব্ধি করা।

www.bjilibrary.com

কিছু সংখ্যক উলামা মনে করেন, বাচ্চার ক্ষতি হবার আশংকা থাকলে রোযা না রাখা ওয়াজিব। কেননা, এরূপ অবস্থায় তো গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মহিলাদের উপর থেকে রোযা রহিত হয়ে যায়। এমত যাদের, তাঁদের মধ্যে ইমাম ইবনে হাযমও রয়েছেন।

এ মাসআলাটির ব্যাপারে চার মযহাবে এমন কিছু কথা আছে, যেগুলো একটু বিস্তারিত আলোচনা হওয়া দরকার ঃ

(১) হানাফী মযহাব অনুযায়ী গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিনী যদি রোযা রাখলে ক্ষতির আশংকা করেন, তবে রোযা না রাখা জায়েয। এই আশংকা মা ও শিশু উভয়ের ব্যাপারে হোক, কিংবা শুধু মায়ের ব্যাপারে হোক, অথবা শুধু শিশুর ব্যাপারে হোক, তাতে কিছু যায় আসেনা। এসব অবস্থায়ই রোযা না রাখা জায়েয।

অতপর এরূপ মহিলা যখনই রোযা রাখার যোগ্য হবে বা রোযা রাখতে সক্ষম হবে, তখনই তার উপর না রাখতে পারা রোযাগুলোর কাযা দেয়া ওয়াজিব হবে। তার ফিদইয়া দেয়ার প্রয়োজন নেই। কাযা রোযা এক সময়ে লাগাতার রাখাও জরুরী নয়। স্তন্যদানকারিনী নিজ সন্তানকে দুধ পান করাক বা দুধ মা হিসেবে দুধ পান করাক তাতে বিধানের কোনো পরিবর্তন হয়না। কেননা, নিজ সন্তানকে দুধপান করাতো শরয়ী দিক থেকেই ওয়াজিব। আর যদি অর্থের বিনিময় দুধ পান করিয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রেও চুক্তি পালন করা তার জন্যে অপরিহার্য।

(২) মালিকী মযহাব অনুযায়ী গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিনীর জন্যে রোযা না রাখা জায়েয, যদি অসুস্থ হবার, কিংবা অসুস্থতা বেড়ে যাবার আশংকা হয়। এ আশংকা তার নিজের এবং বাচ্চার উভয়ের অসুস্থতার ব্যাপারে হোক, কিংবা কেবল তার নিজের অসুস্থতার ব্যাপারে হোক, অথবা কেবল বাচ্চার ব্যাপারে হোক, তাতে কিছু আসে যায়না। তাছাড়া স্তন্যদানকারিনী চাই মা হোক, অথবা অর্থের বিনিময়ে স্তন্যদান করুক, তাতেও কিছু আসে যায়না। এসকল অবস্থায়ই তার জন্যে রোযা না রাখা জায়েয।

অবশ্য এখানে একটা পার্থক্য আছে। সেটা হলো গর্ভবতীকে ফিদইয়া দিতে হবেনা, শুধু কাযা দিলেই হবে। কিন্তু স্তন্যদানকারিনীকে রোযার কাযাও দিতে হবে এবং ফিদইয়াও দিতে হবে।

www.bjilibrary.com

আর গর্ভবতী বা স্তন্যদানকারিনী রোযা রাখলে যদি তাঁর বা বাচ্চার ভীষণ ক্ষতি হবার অথবা তার বা বাচ্চার মৃত্যু হবার আশংকা থাকে, তবে তার জন্যে রোযা না রাখা ওয়াজিব।

কোনো মহিলাকে যদি অপরের বাচ্চাকে দুধ পান করানোর জন্যে নিযুক্ত করা হয় এবং তাকে ছাড়া স্তন্যদানের আর কাউকেও যদি পাওয়া না যায়, তবে এ ক্ষেত্রেই রোযা ভাংগা তার জন্যে জায়েয। অথবা স্তন্যদানের জন্যে অন্য কাউকেও পাওয়া যায় বটে, তবে বাচ্চা তার দুধ পান করেনা, এরূপ অবস্থায়ও তার জন্যে রোযা ভাংগা জায়েয। কিন্তু বাচ্চা যদি অন্য মহিলার দুধ পান করে, তবে তার জন্যে রোযা রাখা ওয়াজিব। অন্য কোনো অবস্থায় রোযা ত্যাগ করা বৈধ নয়।

আর এই নতুন মহিলাকে—বাচ্চা যার স্তন্য গ্রহণ করে নিয়েছে, যদি অর্থদান করার প্রয়োজন হয়, সে ক্ষেত্রে বাচ্চার নিজেরই যদি অর্থ সম্পদ থাকে, তবে সেখান থেকেই পারিশ্রমিক দিতে হবে। আর যদি বাচ্চার অর্থসম্পদ না থাকে, তবে বাচ্চার বাপ ঐ মহিলার পারিশ্রমিক পরিশোধ করবে। কেননা, দুধ পানের জন্যে যে পারিশ্রমিক দিতে হয় তার খোর পোষেরই অংশ। আর এরূপ শিশুর খোর পোষের দায়িত্ব তো পিতারই।

(৩) শাফেয়ী মযহাব অনুযায়ী গর্ভবতী ও স্তন্যদানরিনীর জন্যে রোযা না রাখা জায়েয যদি রোযা রাখলে সহ্য না করার মতো ক্ষতি হবার আশংকা থাকে। এই আশংকা মা ও শিশু উভয়ের ব্যাপারে হোক, কিংবা শুধু মা অথবা শুধু শিশুর ব্যাপারে হোক—তাতে কিছু আসে যায়না। এই তিনটি অবস্থাতাতেই গর্ভবতী ও স্তন্যদানারিনীর উপর রোযা কাযা দেয়া ওয়াজিব। তৃতীয় অবস্থায় অর্থাৎ শুধু যদি শিশুর ক্ষতি হবার আশংকা থাকে, তবে রোযা কাযা দেয়ার সাথে সাথে ফিদইয়া দেয়াও জরুরী। এ ক্ষেত্রে স্তন্যদানকারিনী শিশুর মা হোক, অথবা পারিশ্রমিকের বিনিময় দুধ পান করাক—তাতে কিছু যায় আসেনা।

উপরেল্লিখিত সকল অবস্থায় স্তন্যদানকারিনীর জন্যে রোযা না রাখা ওয়াজিব যদি তাকে দুধপান করানোর জন্যে নিযুক্ত করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ তাকে ছাড়া যদি স্তন্যদানের জন্যে এমন কোনো মহিলা পাওয়া না যায়, যে রোযা রেখেও ঐ শিশুকে স্তন্যদান করতে পারবে এবং রোযা রাখলে তার কোনো ক্ষতি হবার আশংকা থাকবেনা। কিন্তু যদি তাকে স্তন্যদানের জন্যে

www.bjilibrary.com

নিযুক্ত না করা হয়ে থাকে, তবে ইচ্ছা করলে সে রোযা না রেখে স্তন্যদান করতে পারে, অথবা ইচ্ছা করলে স্তন্যদান না করে রোযা রাখতে পারে। অর্থাৎ এই শেষোক্ত অবস্থায় তার স্তন্যদান করা এবং রোযা না রাখা ওয়াজিব নয়।

(৪) হাম্বলী মযহাবের মতে, গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারিনী রোযা রাখলে যদি তার ও বাচ্চার অথবা শুধু তার ক্ষতির আশংকা থাকে, তাবে তার জন্যে রোযা না রাখা জায়েয। এই উভয় অবস্থাতেই তার উপর রোযা কাযা দেয়া ওয়াজিব, ফিদইয়া দেয়া ওয়াজিব নয়।

কিন্তু যদি শুধু শিশুর ক্ষতি হবার আশংকা থাকে, তবে রোযার কাযা দেয়াও ওয়াজিব এবং ফিদইয়া দেয়াও ওয়াজিব।

স্তন্যদানকারিনীর ক্ষেত্রে আরো কথা হলো, বাচ্চাকে যদি অপর কোনো মহিলার কাছে দুধ পান করতে দেয়া হয় এবং বাচ্চা যদি তার দুধ পান করা গ্রহণ করে নেয়, আর মা যদি ঐ মহিলাকে পারিশ্রমিক দিতে সক্ষম হয়, কিংবা শিশুটিই যদি কোনো অর্থসম্পদের মালিক হয়ে থাকে, যা থেকে ঐ মহিলার পারিশ্রমিক পরিশোধ করা যেতে পারে, তবে সে ক্ষেত্রে মায়ের উচিত পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে এরূপ কোনো স্তন্যদানকারিনী নিযুক্ত করা এবং নিজে রোযা ত্যাগ না করা।

রোযা রেখে চোখে সুরমা লাগানো বা পানি ও ঔষধের ফোটা দেয়া

রোযা রেখে কেউ যদি চোখে সুরমা লাগায়, কিংবা পানি দেয়, অথবা ঔষধের ফোটা দেয়, তবে তার বিধান কি? প্রথমেই হাদীসের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাক ঃ

(১) আবদুর রহমান তার পিতা নুমান থেকে, তিনি তার পিতা মা'বাদ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরমা লাগাবার হুকুম দিয়েছেন। তবে একথাও বলেছেন ঃ রোযাদার যেনো সুরমা না লাগায়।

এ হাদীসটি আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারীও এটিকে তাঁর তারীখে সংকলন করেছেন। কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেছেন, এ হাদীসটি সনদ (সূত্র) সম্পর্কে 'কথাবার্তা' আছে। ইবনে মঈন (র) লিখেছেন,

www.bjilibrary.com

হাদীসটির আবদুর রহমান দুর্বল রাবী (বর্ণনাকারী)। আবু হাতিম আলরাযী বলেছেন, এই রাবী অর্থাৎ আবদুর রহমান একজন সত্যবাদী রাবী।

(২) ইমাম ইবনে মাজাহ উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে রোযা রাখা অবস্থায় সুরমা লাগিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ বিষয়ে যতগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তার কোনটিই মানগত বিশুদ্ধ নয়।

ইবনে শবরমা (র) এবং ইবনে আবী লায়লা (র) প্রথম হাদীসটিকে রোযা রেখে সুরমা লাগালে রোযা ভেংগে যাবার দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সর্বজন মান্য শ্রেষ্ঠ আলিমগণের মতে সুরমা লাগালে রোযা ভংগ হয়না। এবার এই চার মযহাবের মতামত উল্লেখ করা হলো ঃ

* **হানাফী মযহাব ঃ** এই মযহাবের একজন মুখপাত্র আল্লামা কাসানী (র) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "আল বাদায়ে ওয়াস সানায়ে" গ্রন্থে লিখেছেন, অধিকাংশ আলিমের মতে সুরমা লাগালে রোযা ভংগ হয়না। এমনকি কণ্ঠ নালিতে সুরমার স্বাদ অনুভব করলেও রোযা ভংগ হয়না। কিন্তু ইবনে আবী লায়লা বলেছেন, এরূপ অবস্থায় রোযা ভংগ হয়ে যায়। কেননা, কণ্ঠনালীতে সুরমার স্বাদ অনুভূত হবার অর্থ সুরমা পেটে চলে যাওয়া। কিন্তু আমাদের দলীল হলো আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, একবার রমযান মাসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসেন। এ সময় তাঁর দুইটি চোখেই ভালভাবে সুরমা লাগানো ছিলো। লাগিয়ে দিয়েছিলেন উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, সুরমা লাগালে রোযা ভংগ হয়না। কেননা সুরমা প্রভৃতির চোখ থেকে পেট ও মস্তক পর্যন্ত পৌছার পথ নেই। কণ্ঠে সুরমার যে স্বাদ অনুভূত হয় সেটা সুরমার প্রভাব মাত্র। স্বয়ং সুরমা কণ্ঠে গিয়ে পৌছায়না। সুতরাং সুরমা লাগলে রোযা ভংগ হয়না। যেমন ধূলি এবং ধূঁয়ার প্রভাব কণ্ঠে অনভূত হলে রোযা ভংগ হয়না। [১]

* **মালিকী মযহাব ঃ** মালিকী মযহাবের মতে, রোযাদার যদি দিনের বেলায় সুরমা লাগায় এবং সেই সুরমার স্বাদ যদি কণ্ঠনালীতে অনুভব করে,

---

১. আল বাদায়ে ওয়াস সানায়ে ঃ ২য় খণ্ড ৯৩ পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

তবে তার রোযা ভংগ হয়ে যাবে এবং এই রোযার কাযা দেয়া তার উপর ওয়াজিব। কিন্তু সুরমা যদি রাত্রে লাগায় আর তার স্বাদ যদি দিনে অনুভব করে, তবে রোযা ভংগ হবেনা। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, রোযাদার যদি ভালভাবে বুঝতে পারে যে, সুরমা লাগালে তা তার কণ্ঠনালীতে গিয়ে পৌছাবে, তবে তার জন্যে রোযার সময় সুরমা লাগানো হারাম। তা সত্ত্বেও যদি সে লাগায়, তবে রোযার কাযা দেয়া তার উপর ওয়াজিব। আর সুরমা লাগালে তা কণ্ঠনালীতে যাবে কিনা সে ব্যাপারে যদি রোযাদারের সন্দেহ থাকে, তবে তার জন্যে সুরমা লাগানো মাকরূহ।

ইমাম মালিকের মযহাবের সারকথা হলো, যদি কোনো জিনিস চোখ, কান, নাক কিংবা লোমকূপের মাধ্যমে কণ্ঠনালীতে পৌছে যায়, তবে রোযা ভংগ হয়ে যাবে। তবে সুরমা বা তৈল যদি রাত্রে ব্যবহার করা হয় এবং তা দিনের বেলায় কণ্ঠনালীতে পৌছে, তবে তাতে রোযা ভংগ হয়না।

*** শাফেয়ী মযহাব ঃ** এই মযহাবের খ্যাতনামা আলিম শাইখ শিহাবুদ্দিন কালয়ূবী লিখেছেন ঃ সুরমা লাগালে রোযার কোনো ক্ষতি হয়না। অর্থাৎ মাকরূহও হয়না, চাই তা দিনেই লাগানো হোক না কেন এবং তার স্বাদ কণ্ঠনালীতে অনুভূতই হোকনা কেন। এমনকি থুথু এবং নাকের শ্লেষ্মায় সুরমার রং দেখা গেলেও রোযা নষ্ট হয় না। তবে এমনটি হবার আশংকা থাকলে দিনের বেলায় সুরমা ব্যবহার না করাই ভাল। অর্থাৎ থুথু বা নাকের শ্লেষ্মার সাথে সুরমা বের হয়ে আসার আশংকা থাকলে দিনের বেলায় রোযাদারের সুরমা ব্যবহার না করাই উত্তম।

*** হাম্বলী মযহাব ঃ** হাম্বলীদের মতে সুরমার স্বাদ রোযাদারের কণ্ঠনালীতে পৌছুলে, তার উপর রোযার কাযা দেয়া ওয়াজিব।

এই আলোচনা থেকে পরিষ্কার হলো, রোযা রেখে চোখে সুরমা লাগালে, সে ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। মতগুলো হলো ঃ

(১) ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহর মতে, রোযাদার সুরমা লাগালে কোনো ক্ষতি নেই। একাজ মাকরূহ হয়না।

(২) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহর মতে, রোযাদার কণ্ঠনালীতে সুরমার স্বাদ অনুভব করলে রোযা ভংগ হয়ে যায়।

www.bjilibrary.com

(৩) ইমাম ইবনে আবু লাইলা ও ইবনে শবরামাহ রাহিমাহুল্লার মতে, সুরমা লাগালেই রোযা ভংগ হয়ে যাবে। সুরমার স্বাদ কণ্ঠনালীতে অনুভূত হোক বা না হোক তাতে কিছু যায় আসেনা।

সারকথা হলো, পয়লা মতটি সহজ, দ্বিতীয় মতটি কঠিন আর তৃতীয় মতটি কঠিনতর।

চোখে পানি বা ঔষধ দেয়া

আমাকে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বলেছেন, চোখ থেকে পেটে পৌঁছার পথ আছে। কোনো রোযাদার চোখে কোনো কিছুর ড্রপ দিলে তার সেই রোযার কাযা দেয়া আবশ্যক হয়ে পড়বে।

কিন্তু অপর একজন ডাক্তার বলেছেন, চোখে যে ড্রপ দেয়া হয় তার অতিক্ষুদ্র অংশই (এক বা দুই বিন্দু) চোখ অতিক্রম করে। কিছু অংশ উড়ে যায়। কিছু অংশ নাকে যায়। কণ্ঠনালীতে কিছুই যায়না। গেলেও তার প্রভাব কুলি করা বা নাকে ছিটাবার চাইতে বেশী হয়না।

রোযা রেখে খাবারের স্বাদ পরীক্ষা করা

রোযার দিনে মহিলাদের আরেকটি সমস্যা দেখা দেয়। তাহলো, রোযা রেখে তাদেরকে স্বামী এবং পরিবার পরিজনের জন্যে খাবার তৈরী করতে হয়। এমতাবস্থায় তারা খাবারের লবণ বা স্বাদ পরীক্ষা করতে পারবে কি? এব্যাপারে ফকীহদের বিভিন্ন মত নিম্নে উল্লেখ করা গেলো ঃ

* হানাফীদের মতে, ফরয রোযা হোক কিংবা নফল, রোযাদার ব্যক্তি যদি জিহবা দ্বারা এমন কোনো জিনিসের স্বাদ পরীক্ষা করে, যা জিহবা থেকে পেটের দিকে নামেনা, তবে তার রোযা মাকরূহ হবে। অবশ্য কেউ যদি এমনটি করতে বাধ্য হয়, তবে তার জন্যে জায়েয। যেমন, কোনো মহিলার স্বামী যদি বদমেজাজী হয়, তবে তার জন্যে রোযা রেখে খাবারের লবণ বা স্বাদ পরীক্ষা করা জায়েয।

* মালিকীদের মতে, রোযাদারের জন্যে খাবারের স্বাদ পরীক্ষা করা সর্বাবস্থায়ই মাকরূহ, এমনকি নিজের হাতে খাবার তৈরী করলেও। আর যদি আস্বাদন করেও, তবে সাথে সাথে থুথু ফেলে জিহবা পরিষ্কার করে নিতে হবে, যাতে করে তা কণ্ঠনালীর দিকে যেতে না পারে। কিন্তু চেষ্টা করা সত্ত্বেও

www.bjilibrary.com

যদি কণ্ঠনালীতে চলে গিয়ে থাকে, তবে রোযার কাযা দেয়া ওয়াজিব। রমজানের রোযা অবস্থায় যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কণ্ঠনালীতে কোনো খাবার দিয়ে থাকে, তবে রোযার কাযা দেয়া এবং কাফফরা দেয়া উভয়টাই ওয়াজিব।

* শাফেয়ীদের মতে রোযাদারের জন্যে খাবারের স্বাদ দেখা মাকরূহ্। তবে বাধ্য হয়ে দেখতে হলে আলাদা কথা। যেমন রোযাদার নিজেই যদি খাবার তৈরী করে তবে স্বাদ পরীক্ষা করা মাকরূহ্ নয়।

* হাম্বলীদের মতে বিনা প্রয়োজনে খাবারের স্বাদ দেখা মাকরূহ। কিন্তু বাধ্য হলে জায়েয। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল লিখেছেন, আমার মতে রোযা রেখে খাবারের স্বাদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকাই উত্তম। তবে কেউ স্বাদ পরীক্ষা করে ফেলে, তাতে রোযার কোনো ক্ষতি হয়না। এমনটি করাতেও কোনো দোষ নেই।

* আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, রোযা রেখে পানাহারের জিনিসের স্বাদ দেখাতে দোষ নেই। যেমন কেউ যদি সিরকা বা অন্য কোনো খাবারের জিনিস ক্রয় করতে চায়, তবে সে ঐ জিনিসের স্বাদ পরীক্ষা করে দেখতে পারে।

* আল মুগনী গ্রন্থে উল্লেখ আছে, হাসান বসরী রোযা থাকা অবস্থায় তাঁর পিচ্চি নাতীকে আখরোট চিবিয়ে দিতেন। ইবরাহীম নখয়ী বলেছেন, এমনটি করা বৈধ।

* ইবনে আকীল লিখেছেন, খাবারের স্বাদ দেখা বা কোনো জিনিস চিবিয়ে দেয়া যদি প্রয়োজনের কারণে হয়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। বিনা প্রয়োজনে হলে মাকরূহ। স্বাদ পরীক্ষা করার সময় যদি কোনো রোযাদারের কণ্ঠনালীতে গিয়ে স্বাদ পৌঁছে, তবে রোযা ভংগ হয়ে যাবে। কিন্তু কণ্ঠনালীতে না পৌঁছুলে রোযা ভংগ হবেনা।

এ আলোচনা থেকে পরিষ্কার হলো, সকল ফিকহী মযহাব অনুযায়ী রোযা রেখে খাবারের স্বাদ দেখা মাকরূহ। তবে বাধ্য হলে প্রয়োজন হলে জায়েয। কিন্তু শর্ত হলো, কোনো অবস্থাতেই খাবার জিনিস পেটে বা কণ্ঠনালীতে যেতে পারবেনা।

রোযা রেখে চুমু খাওয়া

এ প্রসংগে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো হলো ঃ

www.bjilibrary.com

(১) উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রাখা অবস্থায় তাঁর স্ত্রীদের চুমু খেতেন। [বুখারী, মুসলিম]

(২) উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় চুমুও খেতেন এবং শরীরের সাথে শরীর লাগাতেন। কিন্তু তিনি তাঁর মনের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। [সুনানে নাসায়ী ছাড়া সিহাহ সিত্তার বাকী পাঁচটি গ্রন্থেও এ হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে।]

(৩) উমর ইবনে আবী সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন ঃ আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, রোযাদার কি চুমু খেতে পারে ? জবাবে তিনি উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামার প্রতি ইংগিত করে বললেন, তাকে জিজ্ঞেস করো। উম্মুল মু'মিনীন বললেন, রাসূলুল্লাহ স্বয়ং এমনটি করেন। অতপর আমি আরয করলাম ঃ ওগো আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহ তা'আলা আপনার আগে পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন ! আমার কথা শুনে তিনি বললেন ঃ একথা কি ঠিক নয় যে, আমি তোমাদের সবাইর চেয়ে বেশী পরহেজগার এবং তোমাদের সকলের চেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি ? [হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।]

(৪) উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন ঃ একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে চুম্বন করার জন্যে নুইয়ে এলে আমি বললাম ঃ 'আমি তো রোযা রেখেছি।' একথা শুনে তিনি বললেন ঃ 'আমিও রোযা রেখেছি।' অতপর তিনি আমাকে চুম্বন করলেন। বর্ণনাকারী বলেন , এ সময় আয়েশা পূর্ণ যৌবনা ছিলেন। [মুসনাদে আহমদ]

(৫) আবদুর রাযযাক তাঁর 'আল মুসান্নাফ' গ্রন্থে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, জনৈক আনসার সাহাবী রোযাদার অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করেন। পরে তারা চিন্তা করেন, কাজটি ঠিক হলো কিনা ? সুতরাং তিনি তার স্ত্রীকে বিষয়টি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাতে বলেন। মহিলাটি এসে বিষয়টি নবী করীমকে জানালে তিনি বলেন ঃ "এমনটি আমিও করি।"

মহিলাটি ঘরে এসে স্বামীকে রাসূলুল্লাহর জবাব জানালে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহকে তো আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে কিছু কিছু কাজ করার

www.bjilibrary.com

অনুমতি দিয়েছেন। এটিও সেই বিশেষ অনুমতির অন্তরভুক্ত নয় তো ? অতপর এ বিষয়ে জানার জন্যে মহিলাটি পুনরায় রাসূলুল্লাহর নিকট আসেন। তার বক্তব্য শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

انا اعلمكم بحدود الله واتقاكم –

"আল্লাহর আইন ও আইনের সীমা আমি তোমাদের চাইতে অধিক অবগত এবং তা ভংগ করাকে আমি তোমাদের চাইতে অধিক ভয় করি।"

(৬) আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, রোযা থাকা অবস্থায় স্ত্রীর শরীরের সাথে শরীর মিলানো যায় কি ? রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে 'না' সূচক জবাব দেন। [আবু দাউদ]

এ থেকে বুঝা গেলো এই প্রশ্নকর্তা ছিলো পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত যুবক এবং এ কারণেই একাজ থেকে তাকে নিষেধ করা হয়েছে। আর পূর্বের একটি হাদীস থেকে অনুমতি আছে বলে জানা যায়। মুহাদ্দিসদের মতে এ অনুমিত বৃদ্ধদের জন্যে আর নিষেধ যুবকদের জন্যে।

(৭) হাকীম ইবনে আককাল আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ রোযা রাখা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে কোনো কিছু হারাম আছে কি ? তিনি জবাব দেন ঃ হাঁ, তার গুপ্তাংগ। [সহীহ বুখারী]

(৮) মাসরুক (র) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে জিজ্ঞেস করেন ঃ রোযাদারের জন্যে স্ত্রীর সাথে কোনো কিছু করা বৈধ কি ? তিনি জবাব দেন ঃ 'সহবাস ছাড়া সব কিছু বৈধ।'

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে প্রমাণ হলো, রোযা রেখে স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে চুমু খাওয়া, গলাগলি করা, শরীরের সাথে শরীর লাগানো এবং অন্যান্য সুখকর কাজ করতে পারে। তবে শর্ত হলো, এগুলোর ফলে বীর্যপাত হতে পারবেনা। বীর্যপাত হলে রোযা ভংগ হবে।

একটি হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুম্বনকে কুল্লি করার সাথে তুলনা করেছেন। কুল্লি করলে যেমন রোযা ভংগ হয়না, তেমনি

www.bjilibrary.com

চুমু খেলেও রোযা ভংগ হয়না। তবে কুল্লি করতে গিয়ে পেটে পানি গেলে যেমন রোযা ভংগ হয়, তেমনি চুমু খেতে গিয়ে বীর্যপাত হলেও রোযা ভংগ হয়। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

সুনানে আবু দাউদে উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ একদিন আমি রোযা রেখে স্ত্রীকে চুমু খাই। পরে অনুতপ্ত হয়ে নবী করীমের নিকট গিয়ে নিবেদন করলাম 'আজ এক বিরাট ভুল কাজ করেছি। রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু খেয়েছি।' তাঁর বক্তব্য শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

أرأيت لو تمضمضت بماء وانت صائم ؟

দেখ রোযা রেখে পানি মুখে নিয়ে কুল্লি করার ব্যাপারে তোমার মত কি ?

আমি বললাম ঃ "এতে তো কোনো দোষ নেই।" তিনি বললেন ঃ তবে চুমুতে দোষ হবে কেন ?

এ বিষয়ে ফকীহদের মতামত

আল মা'যুরী লিখেছেন, এই মাসআলাটির ক্ষেত্রে চুম্বন দানকারী ব্যক্তির অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। চুমু খেলে যদি তার মধ্যে তীব্র যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং বীর্যপাত ঘটে, তবে রোযা থেকে চুমু খাওয়া তার জন্যে হারাম। কেননা, রোযা থেকে বীর্যপাত ঘটানো নিষিদ্ধ। সুতরাং যে কাজই বীর্যপাত ঘটাবে তাই নিষিদ্ধ। কিন্তু সে ব্যক্তি যদি এতোটা নিয়ন্ত্রণ শক্তির অধিকারী হয় যে, চুম্বনের প্রভাব প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে সৃষ্টি না হয়, তবে এমন ব্যক্তির পক্ষে চুমু খাওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই।

ইমাম নববী লিখেছেন, চুমু খেলে যার মধ্যে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয় না, তার জন্যে রোযা রেখে চুমু খাওয়া হারাম নয়। তবে রোযাদার অবস্থায় চুমু না খাওয়াই উত্তম। কিন্তু একথা বলা যাবেনা যে, রোযা রেখে চুমু খাওয়া মাকরূহ। আলিমগণ অবশ্য বলেছেন, এটা উত্তম পন্থার খেলাফ। অথচ হাদীস থেকে প্রমাণ হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রেখে চুমু খেয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আলিমদের ব্যাখ্যা হলো, রোযা রেখে চুমু খেলে নবী করীমের ব্যাপারে সীমা লংঘনের কোনো আশংকা ছিলনা।

www.bjilibrary.com

কিন্তু অন্য লোকেরা এ আশংকা থেকে মুক্ত নয়। সুতরাং রোযা রেখে চুমু না খাওয়াই উত্তম।

এখানে ইমাম নববী যে বলেছেন, রোযা রেখে চুমু না খাওয়াই উত্তম তার কারণ হলো, এর ফলে এমন কাজ সংঘটিত হবার আশংকা থাকে যা হারাম। ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

من حام حول الحمى اوشك ان يقع فيه –

"যে ব্যক্তি বৃত্তের প্রান্ত রেখার উপর দিয়ে চলে, তার তাতে পতিত হবার সমূহ আশংকা থাকে।"

সুতরাং সঠিক কথা হলো চুম্বনের ফলে যার মধ্যে প্রচন্ড যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তার জন্যে রোযা রেখে চুমু খাওয়া হারাম।

আল্লামা কাসতালানী লিখেছেন, ইমাম বায়হাকী বিশুদ্ধ সুত্রে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃদ্ধকে রোযাদার অবস্থায় চুমু খাওয়ার অনুমতি প্রদান করেছেন আর যুবককে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ বৃদ্ধরা কামনা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু যুবকদের রোযা ভংগ হবার আশংকা থাকে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৃদ্ধ ও যুবকদের মধ্যে তারতম্য করার কারণ যৌন উত্তেজনার সাথে সম্পর্কিত বলে মনে হয়। আর বৃদ্ধ ও যুবক বলে বুঝানো হয়েছে যৌন উত্তেজনার দম্য ও অদম্য অবস্থাকে। সুতরাং অবস্থার ভিন্নতার কারণে বিধানও ভিন্ন হবে। অর্থাৎ কোনো বৃদ্ধের মধ্যে যদি চুমু খাওয়ার ফলে অদম্য উত্তেজনা সৃষ্টি হবার আশংকা থাকে, তবে তার জন্যে রোযা থেকে চুমু খাওয়া নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে কোনো যুবকের যদি চুমু খেলেও প্রচন্ড উত্তেজনা সৃষ্টি হবার আশংকা না থাকে, তবে তার জন্যে রোযা থেকে চুমু খাওয়া জায়েয।

হাম্বলী মযহাবের অন্যতম ইমাম ইবনে কুদামা তাঁর 'আল মুগনী' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ কোনো ব্যক্তি যদি রোযা থেকে চুমু খায় এবং এতে তার বীর্যপাত ঘটে, তবে তার রোযা ভংগ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে সবাই একমত।

ইবনে শবরমা যে লিখেছেন, বীর্যপাত হোক না হোক, চুমু খেলেই রোযা ভংগ হয়ে যাবে, তাঁর একথা গ্রহণ যোগ্য নয়। একইভাবে এ ক্ষেত্রে ইবনে

www.bjilibrary.com

হায়মের কথাও গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলেছেন, চুম্বনের ফলে বীর্যপাত ঘটলেও রোযা ভংগ হয়না।

এ বিষয়ে ফিক্হী বিধান

*** হানাফী মযহাব ঃ** হানাফীদের মতে, রোযা রেখে স্ত্রীকে চুমু খাওয়া মাকরূহ। চুম্বন হালকা হোক কিংবা গভীর হোক তাতে কিছু যায় আসে না। যেমন, চুম্বনের সাথে সাথে যদি ঠোঁটও চুষে তবুও এর হুকুম একই, অর্থাৎ মাকরূহ। একইভাবে শরীরের সাথে শরীর লাগানো এবং ঢলাঢলি ও শৃংগার করাও মাকরূহ। পুরুষ যদি স্ত্রীর গুপ্তাংগে স্বীয় বিশেষ অংগ স্থাপন করে এবং মাঝখানে কোনো কাপড় না থাকে, তবে তা মাকরূহ। এ বিষয়গুলো তখনই মাকরূহ হবে, যখন এগুলোর ফলে সংগম করে বসার কিংবা বীর্যপাত হবার আশংকা থাকবে। এ আশংকা না থাকলে মাকরূহ হবেনা।

*** মালিকী মযহাব ঃ** মালিকী মযহাবে স্ত্রীর সাথে এমন সকল কাজ করাই মাকরূহ যেগুলো সহবাসের দিকে টেনে নিয়ে যায়। যেমন, চুম্বন, আলিঙ্গন, কামাতুর দৃষ্টি কিংবা এমন চিন্তা যা কামোত্তেজনা সৃষ্টি করে। এমনকি রোযাদার যদি নিশ্চিন্তও হয় যে, এগুলোর ফলে তার কামরস বা বীর্য নির্গত হবেনা, তবুও এগুলো করা মাকরূহ।

মালিকী মযহাবের মশহুর মত হলো, উক্ত মাকরূহ 'মাকরূহ তানযিহী' 'মাকরূহ তাহরিমী' নয়। তবে এই মাকরূহ তানযিহী অনুমতির সমার্থক নয়। যেমনটি বলা হয়েছে ফিকহের গ্রন্থাবলীতে। কিন্তু উক্ত কার্যক্রমের ফলে বীর্যপাতের আশংকা থাকলে, কিংবা বীর্যপাত হবে বলে জানা থাকলে উক্ত চুম্বন প্রভৃতি কাজ হারাম। তাসত্ত্বেও কেউ যদি উক্ত কাজগুলো করে এবং সেগুলোর ফলে বীর্য বা কামরস নির্গত না হয়, তবে তার রোযা সহীহ হবে। আর যদি কামরসও নির্গত হয়, তবে রোযার কাযা দেয়া ওয়াজিব হবে। যদি উদ্দেশ্যহীন কামাতুর দৃষ্টি বা চিন্তার ফলে কারো কামরস নির্গত হয়, তবে তার রোযার কাযা দিতে হবেনা। কিন্তু যদি চুম্বন বা অন্যান্য শৃংগারের কারণে বীর্য বা কামরস নির্গত হয় এবং রোযা যদি রমযান মাসের রোযা হয়, তবে তার উপর রোযার কাযা এবং কাফফরা দু'টোই ওয়াজিব হবে।

এর ব্যাখ্যা হলো, সেই রোযাদার ব্যক্তি যেহেতু জানতো যে, চুম্বন ও আলিঙ্গনের ফলে তার বীর্যপাত হবে, কিংবা বীর্যপাত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে

www.bjilibrary.com

কিনা এ ব্যাপারে তার সন্দেহ ছিলো এবং যেহেতু সহবাসের দিকে নিয়ে যায় এমনসব কাজ তার জন্যে হারাম ছিলো, এগুলো জেনে শুনেও যেহেতু সে কাজগুলো করেছে, সেজন্যে তার উপর রোযার কাযা দেয়াও ওয়াজিব এবং কাফফরাও ওয়াজিব। কিন্তু চুম্বন ও আলিঙ্গনের ফলে বীর্যপাত হবে না বলে যদি সে নিশ্চিত থাকে এবং এ কারণেই যদি চুম্বন ও আলিঙ্গন করে থাকে, কিন্তু নিশ্চিত থাকার পরও যদি তার বীর্যপাত ঘটে যায়, তবে রোযার শুধু কাযা দেয়াই যথেষ্ট, কাফফারা দেয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু চুম্বন ও আলিঙ্গনের ক্ষেত্রে সে যদি বাড়াবাড়ি করে থাকে, আর বাড়াবাড়িরই ফলেই যদি বীর্যপাত ঘটে, তবে কাযা এবং কাফফারা দু'টোই ওয়াজিব হবে।

*** শাফেয়ী মযহাব ঃ** এই মযহাবের মত হলো, রোযাদারের জন্যে চুম্বন, আলিঙ্গন প্রভৃতি কাজ মাকরূহ। তবে মাকরূহ হবে তখন, যদি এসব কাজের ফলে তীব্র কামোত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তা না হলে মাকরূহ হবে না। তবে রোযা রেখে এসব কাজ থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

*** হাম্বলী মযহাব ঃ** হাম্বলী মযহাবে রোযাদারের জন্যে চুম্বন, শৃংগার, আলিঙ্গন, কামাতুর দৃষ্টিতে বার বার তাকানো প্রভৃতি কাজ মাকরূহ। তবে মাকরূহ হবে তখন, যদি এসব কাজের ফলে তীব্র কামোত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তা না হলে মাকরূহ হবেনা। এসব কাজের ফলে বীর্যপাত ঘটবে বলে যদি আশংকা থাকে, তবে রোযাদারের জন্যে এসব কাজ হারাম।

এখানে আমরা দু'টি বিষয় আরো একটু স্পষ্ট করতে চাই ঃ

(১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় পবিত্র স্ত্রীগণকে যে চুম্বন করেছেন বা আলিঙ্গন করেছেন, তা তিনি কামনার বশবর্তী হয়ে করেননি। বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো শরীয়তের বিধান প্রকাশ করা এবং একথা জানিয়ে দেয়া যে, একাজের অনুমতি আছে, এগুলো মানুষের স্বভাবজাত কাজ এবং রোযা থেকে কমবেশী এসব কাজে নিমজ্জিত হবার আশংকা আছে। তাই এ ক্ষেত্রে বিধিগত সহজতা প্রদানই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি তো ছিলেন মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু, প্রেমময়। আর তিনি এ ক্ষেত্রে একথাও বলে গেছেন যে, এই অবকাশ ও অনুমতি সকলের জন্যে। তাইতো দেখি উমর ইবনে আবী সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁর স্ত্রীকে চুম্বন করার কাজকে যখন 'বিশেষভাবে রাসূলের জন্যে নির্দিষ্ট' বলে ব্যাখ্যা করতে চাইলেন

www.bjilibrary.com

এবং বললেন, আল্লাহ্ তো তাঁর আগে পরের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন, তখন আল্লাহর রাসূল তাকে উদ্দেশ্য করে বলে দেন ঃ "আল্লাহ্‌র কসম, আমি তোমাদের সবার চেয়ে বেশী পরহেজগার এবং আমি তোমাদের সকলের চেয়ে আল্লাহ্‌কে অধিক ভয় করি।"—এই কথার মাধ্যমে মূলত তিনি সবাইকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, এই অবকাশ তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট নয়, বরং সমস্ত মুসলমানের জন্যে প্রযোজ্য এবং একাজ পরহেজগারী ও আল্লাহভীতির খেলাফ নয়। তবে শর্ত হলো. রোযাদারকে নিজের কামনা বাসনা নিয়ন্ত্রণ করার যোগ্যতা রাখতে হবে।

(২) দ্বিতীয় কথাটি হলো, এই বিধানের ক্ষেত্রে পরুষ ও মহিলা উভয়ই সমান। যেমন চতুর্থ হাদীসে আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশাকে চুমু খাওয়ার জন্যে অগ্রসর হলে আয়েশা বললেন ঃ 'আমি তো রোযা রেখেছি।' জবাবে প্রিয় নবী বললেন ঃ আমিও তো রোযা রেখেছি।' অতপর তিনি চুমু খেলেন এবং তখন হযরত আয়েশা ছিলেন যুবতী। এ থেকে বুঝা যায়, হযরত আয়েশার ব্যাপারে রাসূলের জানা ছিলো যে, চুম্বনের ফলে তাঁর মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হবেনা।

সুতরাং কামোত্তেজনা সৃষ্টি হবার আশংকা থাকলে মহিলাদের জন্যেও চুম্বন, আলিঙ্গন প্রভৃতি নিষেধ। আর একথাও জানা গেল যে, এই বিধানের বেলায় নারী পুরুষ উভয়ই সমান।

www.bjilibrary.com

২৭. রোযার আরো কতিপয় মাস'আলা

গোসল ফরয অবস্থায় রোযাদারের ভোর হওয়া

রোযাদার যদি গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে, তবে তার বিধান কি ? এ প্রসংগে যেসব হাদীস বর্তমান রয়েছে, প্রথমে সেগুলো উল্লেখ করা গেলো ঃ

(১) আবদুল মালিক বিন আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান কর্তৃক তার পিতা আবু বকর (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি ঃ ادركه الفجر جنبا فلا يصم "গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় যার ভোর হয়, সে যেনো রোযা না রাখে।"

আবু বকর (র) বলেন, আমি আমার পিতা আবদুর রহমান (র)-কে আবু হুরাইরার (রা) এ বক্তব্যটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি এ বক্তব্য মানতে অস্বীকার করেন। অতপর তিনি (আবদুর রহমান) এবং আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা ও উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামার খেদমতে হাযির হই। তাঁদের উভয়ের প্রতি আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হোন। তাঁদের কাছে আবদুর রহমান এই বিষয়টি উত্থাপন করেন। তখন তাঁরা উভয়েই বললেন ঃ রাসূলে করীম বহুবার এমন করেছেন যে, স্বপ্নদোষের কারণে নয়, স্ত্রী সহবাসের কারণে তাঁর উপর গোসল ফরয হয়েছে আর এই অবস্থায়ই তাঁর সকাল হয়েছে এবং তিনি রোযা রেখেছেন।

আবু বকর (র) বলেন, অতপর আমরা দু'জনেই মারওয়ানের কাছে গেলাম। আবদুর রহমান পুরো ঘটনা মারওয়ানের নিকট বললেন। শুনে মারওয়ান বললেন ঃ 'আমি তোমাদের কসম খেয়ে বলছি, তোমরা আবু হুরাইরার কাছে গিয়ে তার বক্তব্যের জবাব দিয়ে আসো।' অতপর আমরা আবু হুরাইরার কাছে গেলাম। আবু বকর বলেন, এ সবগুলো ঘটনার আমি প্রত্যক্ষদর্শী। আবু হুরাইরার নিকট উপস্থিত হয়ে আবু আবদুর রহমান সমস্ত ঘটনা শুনালেন। আবু হুরাইরা জিজ্ঞেস করলেন ঃ তাঁরা দু'জনই [আয়েশা ও উম্মে সালামা (রা)] কি এমনটি বলেছেন ? আবদুর রহমান বললেন ঃ জী-হাঁ।

www.bjilibrary.com

আবু হুরাইরা তখন বললেন ঃ এ বিষয়ে তাঁরা দু'জনই সর্বাধিক জানবেন। তিনি আরো বললেন, আমি এ বিষয়ে যা কিছু বলেছিলাম, তা সরাসরি রাসূলুল্লাহর নিকট থেকে শুনিনি। এ বক্তব্য আমি শুনেছি ফজল ইবনে আব্বাসের নিকট থেকে। অতপর আবু হুরাইরা তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করেন। [সহীহ্ মুসলিম]

(২) উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রমযান মাসে নবী পাকের এমন বহুবার হয়েছে যে, গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় তাঁর সকাল হয়েছে এবং তা স্বপ্নদোষের কারণে নয়, বরং স্ত্রী সহবাসের কারণে। অতপর তিনি (সকালে শয্যা ত্যাগ করে) গোসল করতেন এবং রোযা রাখতেন। [সহীহ্ মুসলিম]

(৩) উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ অনেক সময় গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় রাসূলুল্লাহর সকাল হতো। স্বপ্নদোষের কারণে নয়, স্ত্রী সহবাসের কারণেই তাঁর উপর গোসল ফরয হতো। তাসত্ত্বেও তিনি রোযা ত্যাগ করতেন না এবং সেই রোযার কাযাও দিতেননা। [সহীহ্ মুসলিম]

(৪) উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দরজার আড়াল থেকে শুনছিলাম, এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো ঃ 'ওগো আল্লাহর রাসূল ! গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় ফজর নামাযের সময় হয়ে গেলে কি সেদিনকার রোযা রাখবো ? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

وانا تدركنى الصلوة وانا جنب فاصوم

"গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় আমারও ফজর নামাযের সময় হয় এবং আমি রোযা রাখি।"

একথা শুনে লোকটি বললো ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার অবস্থা তো আমাদের মতো নয়। আল্লাহ্ তা'আলা তো আপনার আগে পরের সমস্ত গুনাহখাতা মাফ করে দিয়েছেন। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

والله انى لارجوان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقى

www.bjilibrary.com

"আল্লাহর কসম, আমি আশা রাখি যে, আমি তোমাদের সকলের চাইতে অধিক আল্লাহকে ভয় করি এবং সেই বিষয়গুলো তোমাদের সকলের চেয়ে অধিক জানি। যেগুলো থেকে দূরে থাকা জরুরী।" [সহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, সুনানে আবু দাউদ]।

ফকীহদের অধিকাংশের এটাই মত যে, গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় যদি করো সকাল হয়, তবে তার রোযা শুদ্ধ হবে। সেই রোযার কাযা দিতে হবেনা। আর গোসল ফরয স্ত্রী সহবাসের কারণে হোক, কিংবা স্বপ্নদোষের কারণে হোক, তাতে কিছু যায় আসেনা। ফকীহগণ উপরে বর্ণিত হাদীসগুলো তাদের এই মতের সপক্ষে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

ইমাম নববী লিখেছেন, আমাদের অঞ্চলের আলিমদের এ বিষয়ে ইজমা (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় সকাল হওয়া ব্যক্তির রোযা সহীহ হবে। গোসল ফরয স্ত্রীসহবাসের কারণে হোক কিংবা স্বপ্নদোষের কারণে হোক তাতে কিছু যায় আসেনা। সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণের অধিকাংশের এটাই মত।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ধারণা ছিলো, কারো যদি গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় সকাল হয়, তবে তার রোযা বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু আবু হুরাইরা পরে তাঁর এ মত প্রত্যাহার করেন। বিষয়টি একটু আগেই সহীহ মুসলিমের হাদীসে উল্লেখ হয়েছে।

ইমাম নববী লিখেছেন, গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় সকাল হলে রোযা সহীহ হবে কিনা এ বিষয়ে আলিমদের মধ্যে যে মতপার্থক্য ছিলো, পরবর্তী কালে তা দূর হয়ে গেছে। এমনকি বলা হয়ে থাকে, এরূপ ব্যক্তির রোযা যে সহীহ হবে সে ব্যাপারে আলিমদের ইজমা (ঐক্য) হয়েছে। তবে মতপার্থক্যের পরে যে ঐকমত্য হয়, উসূলের দিক থেকে সে ঐকমত্যের ব্যাপারে কথা আছে। কিন্তু উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা এবং উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার বর্ণিত হাদীস সকল মতপার্থক্যের বিপক্ষে প্রামাণ্য দলিলের মর্যাদা রাখে।

ইবনে দাকীকুল ঈদ লিখেছেন, এ বিষয়টির উপর উলামায়ে কিরামের মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেটাকে অবশ্যি ইজমার অনুরূপ আখ্যায়িত করা যায়। একথাটির সপক্ষে মজবুত দলিল হলো পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ (البقرة-١٨٧)

"রোযার রাত্রে স্ত্রীসহবাস করা তোমাদের জন্যে বৈধ করে দেয়া হলো।" [আল বাকারা ঃ ১৮৭]

এ আয়াত থেকে রমযানের রাত্রে স্ত্রীসহবাসের বৈধতা সুপ্রমাণিত। আর রাত্রিতো ভোরের সাথে সংযুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি ভোরের কাছাকাছি সময় সহবাস করবে, তার গোসল ফরয হওয়ার কারণে রোযা নষ্ট হতে পারেনা।

তবে ভোর হওয়ার পূর্বে গোসল করে নেয়াই উত্তম। কিন্তু কেউ যদি তা না করে, তবে তাও জায়েয। কেউ যদি বলে, ভোর হবার পূর্বে গোসল করা কেমন করে উত্তম হতে পারে, অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোর হবার পরেও গোসল করেছেন বলে প্রমাণিত।

তার কথার জবাব হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করেছিলেন একথা প্রমাণ করে দেখাবার জন্যে যে, এমনটি করাও জায়েয। নবী হিসেবে তো সমস্ত বৈধ কাজ করে দেখিয়ে দিয়ে যাবার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যাস্ত ছিলো। সুতরাং এমনটি করে তিনি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বই সর্বোত্তম ভাবে পালন করেছিলেন।

হায়েয বা নিফাসের রক্ত বন্ধ হবার পর করণীয়

আগেই বলে এসেছি, হায়েয বা নিফাসের রক্ত যদি ভোর হবার আগেই বন্ধ হয়ে যায়, তবে সেদিনকার রোযার নিয়ত করা আবশ্যক। এ কথাও আলোচনা করে এসেছি যে, ইমাম নববী বলেছেন, হায়েয বা নিফাসের রক্ত যদি ভোর হবার পূর্বে রাত থাকতেই বন্ধ হয়ে যায় আর ঐ মহিলা সূর্যোদয়ের পূর্বে গোসল না করে থাকে, তবু তার রোযা সহীহ হবে এবং সেদিনকার রোযা পূর্ণ করা তার উপর ওয়াজিব। গোসল ইচ্ছকৃত না করুক কিংবা ভুল বশত না করুক, তাতে কিছু যায় আসেনা। গোসল না করার ব্যাপারে কোনো ওজর থাকুক বা না থাকুক, এরূপ মহিলাদের হুকুম সেই মহিলাদের হুকুমের মতো, যাদের উপর (সহবাসের) কারণে গোসল ফরয হয়েছে, কিন্তু সূর্যোদয়ের পূর্বে গোসল করতে পারেনি। এ বিষয়ের হুকুম একটু আগেই আলোচনা করে এসেছি।

রমযান মাসে দিনের বেলায় সহবাস করা

এ প্রসংগে প্রথমেই হাদীসের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক ঃ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.bjilibrary.com

ওয়াসাল্লামের নিকট এসে নিবেদন করলো : "ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন : "কিসে তোমাকে ধ্বংস করেছে ?" সে বলল : "আমি রমযান মাসে রোযা রেখে স্ত্রী সহবাস করেছি।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : (هل تجد ما تعتق رقبة) "তোমার কি একটি দাস/দাসী মুক্ত করবার সামর্থ আছে ?" লোকটি বললো : "জী-না।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : (هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين ؟) "তুমি কি অবিরাম দুইমাস রোযা রাখতে পারবে ?" সে বলল : "জী-না।" তিনি জানতে চাইলেন : ? فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا "তবে কি তুমি ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে পারবে ?" লোকটি বললো : "জী-না।"

বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি রাসূলুল্লাহর দরবারে বসে থাকা অবস্থায়ই কোথাও থেকে তাঁর দরবারে এক ঝুড়ি খেজুর হাদীয়া এলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরসহ ঝুড়িটি তার হাতে দিয়ে বললেন : تصدق بهذا "এ গুলো নিয়ে গিয়ে দান করে দাও।" লোকটি আরয করলো : "এগুলো কি আমার চাইতেও অধিক দরিদ্রকে দান করবো ? এ শহরে তো আমার চাইতে অধিক দরিদ্র কোনো পরিবার নেই।" লোকটির কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে উঠলেন, অতপর বললেন : اذهب فاطعمه اهلك "তবে নিয়ে যাও, এগুলো তোমার পরিজনকে নিয়ে খেতে দাও।"—এ হাদীসটি সিহা সিত্তার ছ'টি গ্রন্থেই বর্ণিত হয়েছে।

হাদীসে যে ঝুড়ির কথা উল্লেখ হয়েছে তাতে সম্ভবত পনের সা' অর্থাৎ ষাট মুদ খেজুর ধরতো এবং প্রতি মিসকীনকে একমুদ করে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ানো যেতো।

এ বিষয়ে ফকীহদের মতামত

এ মাসআলাটির ব্যাপারে অধিকাংশ আলিম, বিশেষ করে হানাফী আলিমদের মত হলো, কাফফরা প্রদান করতে হবে। আর স্বামী স্ত্রী উভয়ের উপরই কাযা ওয়াজিব হবে, যদি জেনে বুঝে রমযান মাসের দিনের বেলায় রোযা রাখার নিয়ত করার পর সহবাস করে থাকে।

www.bjilibrary.com

সুতরাং যদি ভুলবশত, কিংবা স্বেচ্ছায় নয় বাধ্য হয়ে অথবা রমযান মাস হলেও সেদিন রোযা না থাকার কারণে সহবাস করে থাকে তবে উভয়ের কাউকেও কাফফারা দিতে হবেনা।

কিন্তু স্বামী যদি রোযাদার স্ত্রীর সাথে জোরপূর্বক সহবাস করে থাকে, কিংবা কোনো ওযরের কারণে স্ত্রী সেদিন থাকেনি অথচ স্বামী দিনের বেলায় সহবাস করেছে, এমতাবস্থায় স্ত্রীর উপর কাফফারা ওয়াজিব হবেনা। কাফফরা ওয়াজিব হবে কেবল স্বামীর উপর।

কেউ যদি রমযানের কাযা রোযা কিংবা মানতের রোযা থাকা অবস্থায় সহবাস করে বসে, তবে কাফফরা দিতে হবেনা।

শাফেয়ী মযহাব অনুযায়ী মেয়েদের উপর কাফফারা দেয়া ওয়াজিব হয়না, চাই সে রোযা অবস্থায় ইচ্ছাকৃত সহবাস করুক কিংবা বাধ্য হয়ে করুক। তবে উক্ত রোযাটির কাযা দেয়া ওয়াজিব।

ইমাম নববী লিখেছেন, সঠিক মত হলো,যদি ইচ্ছাকৃত সহবাস করে রোযা ভংগ করে থাকে, তবে কেবল পরুষের উপর একটি কাফফারা ওয়াজিব হবে, মহিলার উপর হবেনা। মেয়েদের উপর কাফফারা ওয়াজিব না হবার কারণ হলো, যেহেতু এটা সহবাসের কারণে অর্থদান করার সাথে সম্পর্কিত সে কারণে তা মেয়েদের উপর বর্তায়না। যেমনটি হয় মোহরের বেলায়। সহ-বাস উভয় পক্ষ করলেও মোহর দিতে হয় শুধু পুরুষকে।

এ প্রসংগে ইমাম দাউদ যাহেরীর মতও শাফেয়ী মযহাবের অনুরূপ।

ইমাম আবু দাউদ লিখেছেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোনো ব্যক্তি যদি রমযান মাসে রোযাদার অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে, তবে স্ত্রীর উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে কি ; জবাবে ইমাম আহমদ বলেন : মেয়েদের কাফফারা দিতে হয় বলে আমি কারো কাছে শুনিনি।

এ মাস'আলাটি প্রসংগে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের দু'টি মত বর্ণিত হয়েছে। একটি মত আমরা এখানে উল্লেখ করলাম। ইমাম ইবনে কুদামা তাঁর আল মুগনী গ্রন্থে ইমাম আহমদের এই মতটির স্বপক্ষে দলিল পেশ করেছেন সেই হাদীসটিকে ; যেটি আমরা এ মাস'আলা আলোচনা প্রসংগে প্রথমেই উল্লেখ করে এসেছি। ইবনে কুদামা বলেন, উক্ত হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহবাসকারী পুরুষটিকে দাস মুক্ত করার কথা

www.bjilibrary.com

বলেছেন, তার স্ত্রীর ব্যাপারে কোনো নির্দেশ দেননি। অথচ একাজে যে তার স্ত্রীও শরীক ছিলো, তা তিনি জানতেন।

আমাদের মতে এ বিষয়ে অধিকাংশ আলিম এবং হানাফীদের যে মতটি প্রথমে উল্লেখ করেছি। সেটাই অধিকতর সঠিক। দারু কুতনীর সূত্রেও উক্ত হাদীসের একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তাতে লোকটির বক্তব্য এভাবে উল্লেখ হয়েছে ঃ

هلكت واهلكت فقال : ما اهلكك ؟ قال وقعت على اهلى

"আমি নিজেও ধ্বংস হয়েছি আর (আমার স্ত্রীকেও) ধ্বংস করেছি। জিজ্ঞেস করলেন ঃ কিসে তোমাকে ধ্বংস করেছে ? সে বললো ঃ আমি (রমযান মাসে রোযা থেকে) আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি।"

হাদীসের বর্ণনা থেকে বাহ্যত একথাই বুঝা যায় যে, লোকটি তার স্ত্রীকে বাধ্য করেছে। স্ত্রী সেচ্ছায় একাজে অংশ গ্রহণ করেনি। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর কাফফারা বর্তাননি।

তাছাড়া একথাও স্পষ্ট যে, ইবাদতের ক্ষেত্রে পুরুষ নারী উভয়ই সমান মর্যাদার অধিকারী। সমান দায়িত্বশীল। সুতরাং রোযা যেহেতু একটি ইবাদত, মহিলারা যদি ইচ্ছাকৃতভাবে তা ভংগ করে, তবে তার উপরও কাফফারা ওয়াজিব হবে। আর যদি বাধ্য হয়ে করে থাকে, বা করার ক্ষেত্রে তার এখতিয়ার না থেকে থাকে, তবে কেবল কাযা ওয়াজিব হবে, কাফফারা ওয়াজিব হবেনা।

কাফ্‌ফারা কি দিতে হবে ?

কাফফারা দেয়ার তিনটি বিকল্প হুকুম রয়েছে ঃ তিনটি হুকুমই হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। সেগুলো হলো ঃ

(১) মুসলিম দাস বা দাসী মুক্ত করা। দাস বা দাসী মুক্ত করার জন্যে শর্ত হলো, যাকে মুক্ত করা হবে, সে যাবতীয় ত্রুটি মুক্ত হতে হবে। যেমন, অন্ধ, মূক, বধির ও পাগল না হওয়া। অবশ্য হানাফীদের মতে, কাফির দাস বা দাসীও কাফফারা হিসেবে মুক্ত করা বৈধ।

(২) বিকল্প হুকুম অর্থাৎ মুক্ত করার জন্যে যদি দাস বা দাসী না থাকে, তবে অনবরত দুইমাস রোযা থাকতে হবে। চন্দ্রমাস অনুযায়ী কোনো মাসের পয়লা তারিখ থেকে রোযা রাখা শুরু করলে সেই মাস এবং পরবর্তী মাস

www.bjilibrary.com

পুরো রোযা রাখতে হবে। মাস ত্রিশ দিনের হোক, কিংবা উনত্রিশ দিনের হোক তাতে কিছু যায় আসেনা। যদি মাসের মাঝ খানের কোনো তারিখ থেকে রোযা রাখতে আরম্ভ করে, তবে সেই বাকী ক'দিন রোযা রাখার পর পরবর্তী মাস পূর্ণ রোযা রাখতে হবে। এ মাসটি উনত্রিশ দিনের হলেও এক মাস ধরা হবে। কিন্তু পয়লা যে ক'দিন রেখেছিল, সে ক'দিনের সাথে তৃতীয় মাস থেকে ক'দিন রোযা রেখে ত্রিশ দিন পূর্ণ করতে হবে। এভাবে অনবরত দুই মাস রোযা রাখতে হবে।

এ প্রসংগে আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে। তাহলো, যে রোযাটি ভাংগার কারণে কাফফারা দিতে হয়েছে, সেটি ভাংগার জন্যে একটি কাযা রোযাও রাখতে হবে। কাযা রোযাটিকে কিন্তু কাফফারার রোযার সাথে গণ্য করা যাবেনা। সেটি একটি ভিন্ন রোযা এবং সেটির মর্যাদা ভিন্ন। মোটকথা কাযা এবং কাফফারা এক জিনিস নয়।

কাফফারার রোযা দুইমাস অনবরত রাখতে হয়। মাঝখানে যদি একটি রোযাও না রাখা হয় এবং সেটা কোনো শরয়ী ওযরের কারণেই হোক না কেন, যেমন সফর বা অসুখ বিসুখের কারণে যদি না রেখে থাকে, ইতোপূর্বে যতোগুলো রোযা রেখেছে, সেগুলো কাফফারার রোযা বলে গণ্য হবেনা। কেননা অবিরামভাবে দুই মাস রোযা শর্ত ভংগ হয়ে গেছে। সুতরাং আবার নতুন করে রোযা রাখা আরম্ভ করতে হবে এবং অনবরত দুই মাস রাখতে হবে। মাঝখানে কোনো বিরতি দেয়া যাবেনা। বিরতি দিলেই পুনরায় শুরু করতে হবে।

কিন্তু হাম্বলী মযহাব অনুযায়ী কোনো শরয়ী কারণে যদি মাঝখানে রোযা ছুটে যায়, তবে তাতে অনবরত বা একাধারে রাখার শর্ত ভংগ হয়না। এ মতটি খুবই বাস্তব সম্মত। কেননা, শরয়ী ওযরের কারণেও যদি একাধারে রোযা রাখার শর্ত ভংগ হয়, তবে মহিলাদের ব্যাপারটি কি হবে। কোনো মহিলার যদি দুইমাস কাফফারা দিতে হয়, তবে মাসিকের সময়তো তাকে রোযা রাখা থেকে বিরত থাকতেই হবে। ফলে তাকে যদি পুনরায় নতুন করে শুরু করতে হয়, তবে তো তার পক্ষে অনবরত দুই মাস রাখাই সম্ভব নয়। এ ধরনের শরয়ী যুক্তিসংগত ওযর পুরুষেরও হতে পারে।

(৩) যদি কষ্টসাধ্য হবার কারণে বা অন্য কোনো কারণে অবিরামভাবে দুইমাস রোযা রাখতে সক্ষম না হয়, তবে ষাটজন মিসকীনকে আহার

www.bjilibrary.com

করাবে। এতে করে কাফফারার প্রতিদিনের জন্যে একজন মিসকীনকে আহার করানো হয়।

এখানে আরেকটি প্রশ্ন থেকে যায়। তাহলো, কাফফারা দেয়ার ক্ষেত্রে হাদীসে উল্লেখিত ক্রমিক ধারা অক্ষুণ্ন রাখা জরুরী কিনা ? অধিকাংশ আলিমের মতে হাদীসে বর্ণিত ক্রমিক ধারা বজায় রাখা জরুরী। অর্থাৎ কাফফারার ক্ষেত্রে দাস/দাসী মুক্ত করাকেই অগ্রাধিকার দেবে। তা না থাকলে অনবরত দুইমাস রোযা রাখবে। অনবরত দুইমাস রোযা রাখতে অক্ষম ষাটজন মিসকীনকে মধ্যম ধরনের খাবার খাইয়ে দেবে, যেমনটি সাধারণত নিজেরা খেয়ে থাকে।

হানাফী মযহাবের মত উপরোক্ত মতের অনুরূপ।

এই মতের লোকদের কথা হলো, প্রথমটি করতে সক্ষম হলে দ্বিতীয় বা তৃতীয়টি করা জায়েয নয়। দ্বিতীয়টি করতে সক্ষম হলে তৃতীয়টি করা জায়েয নয়। এরা নিজেদের মতের সপক্ষে এ প্রসংগে প্রথমে উল্লেখিত হাদীসটি পেশ করেন। সেখানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ক্রমিক ধারা উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু মালিকী মযহাব অনুযায়ী কাফফারা প্রদানকারী তিনটি বিকল্পের যে কোনোটি করতে পারে। তিনটির যেটিই করবে তার কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলেরও এটাই মত বলে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

এই মতের লোকদের দলিল হলো, আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত একটি হাদীস। হাদীসটি হলো ঃ "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে ইচ্ছাকৃত রোযা ভংগ করেছে এমন এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়েছেন একটি দাস মুক্ত করতে অথবা দুইমাস অবিরাম রোযা রাখতে অথবা ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে।" সহীহ্ মুসলিমে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসে বিকল্প কাফফারার কথা "অথবা" দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ দুই বা ততোধিক বিষয়ের মধ্যে যেকোনো একটি গ্রহণের স্বাধীনতা দেয়া।

দ্বিতীয়ত যেহেতু কোনো হুকুম অমান্য করার কারণে কাফফারা আদায় করতে হয়, সেজন্যে তিনটি বিকল্প কাফফারার যেকোনো একটি গ্রহণ করার অবকাশ দেয়া হয়েছে, যেমনটি দেয়া হয়েছে কসমের কাফফারার ক্ষেত্রে।

www.bjilibrary.com

এ ক্ষেত্রে আমাদের মত হলো, অধিকাংশ আলিমের যে মতটি প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে, সেটাই অধিকতর বিশুদ্ধ। অর্থাৎ তিনটি বিকল্পের মধ্যে ক্রমিক ধারা বজায় রাখতে হবে। প্রথমটি অক্ষম হলে দ্বিতীয়টি এবং দ্বিতীয়টিও অক্ষম হলে তৃতীয়টি করবার অবকাশ থাকবে।

রোযাদারের যদি দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হয়

মালিকী মযহাব অনুযায়ী দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হলে রোযা ভংগ হয়না। এর দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদীসটি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

ثلاث لا يفطرن، القيئ والحجامة و الاحتلام –

"তিনটি জিনিসে রোযা ভংগ হয় না। সেগুলো হলো ঃ বমি করা, ক্ষৌরকর্ম করা এবং স্বপ্নদোষ হওয়া।" [তিরমিযী, বায়হাকী]

কেউ কেউ বলেছেন, এ হাদীসটি জয়ীফ।

আবু হাতীম এবং আবু যুরআ এ মতকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, এমতটিই বিশুদ্ধ ও বাস্তবসম্মত মনে হয়। ইমাম বায়হাকীও এমতের সমর্থন করেছেন।

www.bjilibrary.com

২৮. রোযার কাযা ও ফিদইয়া

কাযা কি ?

কারো যদি কোনো না কোনো কারণে রমযানের কোনো রোযা ছুটে যায়, তবে রমযান মাস শেষ হবার পর সেই ছুটে যাওয়া রোযা পূর্ণ করার নাম 'রোযার কাযা' বা 'কাযা রোযা'। যেমন আসমা খাতুন মাসিকের কারণে রমযান মাসে সাতদিন রোযা রাখতে পারেননি, ফাতিমা নিফাসের কারণে পনের দিন রোযা রাখতে পারেননি, খালেদা সফরের কারণে তিনটি রোযা রাখতে পারেননি, মাইমুনা অসুখের কারণে আটটি রোযা রাখতে পারেননি, আয়েশা গর্ভবতী অবস্থায় এগারটি রোযা রাখতে পারেননি এবং উম্মে সালামা বাচ্চাকে দুধপান করানোর কারণে বিশটি রোযা রাখতে পারেননি, এসব কারণে তাদের রমযান মাসের এই রোযা গুলো ছুটে যায়। এমতাবস্থায় রোযাগুলো তাদের ঘাড়ে ঝুলে থাকে। এগুলো পূর্ণ করা তাদের উপর ওয়াজিব। রমযান মাস শেষ হবার পর অন্য যেকোনো মাসে সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী যার যতগুলো রোযা ছুটে গিয়েছিল, তাকে ততোগুলো রোযা রেখে রমযানের রোযার সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে। এরূপ রোযার নামই 'কাযা রোযা।'

কাযা রোযা রাখতে হবে সেসব দিনে যেসব দিনে নফল রোযা রাখা বৈধ। সুতরাং যেসব দিনে নফল রোযা রাখা যায়না সেসব দিনে রোযার কাযা করা যাবেনা। যেমন ঈদের দিনসমূহে, রমযান মাসে বা মানতের রোযা রাখার নির্দিষ্ট দিনে।

রমযান মাসে ছুটে যাওয়া রোযা রমযান শেষ হবার সাথে সাথে রাখতে হবে, এমনটি জরুরী নয়। এ ক্ষেত্রে শরীয়ত প্রশস্ততা দান করেছে। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর ছুটে যাওয়া রোযার কাযা করতেন শা'বান (অর্থাৎ পরবর্তী রমযানের পূর্বের) মাসে। এ থেকে বুঝা গেলো, রোযা রাখাতে সক্ষম হবার সাথে সাথেই তিনি রোযা রাখতেননা।

ছুটে যাওয়া রোযার কাযা করার ক্ষেত্রে এটাও জরুরী নয় যে, সেগুলো ধারাবাহিকভাবে রাখতে হবে। এ প্রসংগে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

www.bjilibrary.com

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ -

"আর যারা রোগগ্রস্ত থাকবে কিংবা ভ্রমণরত থাকবে, তারা অন্যান্য দিনে রোযার সংখ্যা পূর্ণ করে দেবে।" [আল বাকারা ঃ ১৮৫]

এ আয়াতটিতে অন্যান্য দিন রোযা রাখার সাধারণ অনুমতি দেয়া হয়েছে। কোনো দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি এবং ধারাবাহিকভাবে রাখারও নির্দেশ দেয়া হয়নি। সুতরাং কাযা রোযা বছরের যেকোনো সময় নিষেধ করা দিন এবং ফরয রোযার দিনসমূহে বাদে যেকোনো দিন ধারাবাহিক বা বিচ্ছিন্নভাবে রাখা যাবে।

দারুকুতনী আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রসংগে বলেছেন ঃ

ان شاء فرق وان شاء تابع -

"ইচ্ছা করলে বিচ্ছিন্নভাবে রাখতে পারে আবার ইচ্ছা করলে ধারাবাহিকভাবেও রাখতে পারে।"

রোযার কাযা কতদিন বিলম্ব করা যাবে ?

* হানাফী আলিমগণের এবং ইমাম হাসান বসরীর মতে, যদি আরেকটি রমযান মাস এসে যায় এবং পূর্ববর্তী রমযানের ছুটে যাওয়া রোযার কাযা দেয়া না হয়ে থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় বর্তমান রমযান মাসের রোযা রাখতে হবে এবং এর পরে তার ঘাড়ে চেপে থাকা রোযার কাযা দিতে হবে। এই বিলম্বের জন্যে কোনো ফিদইয়া দিতে হবে না, বিলম্ব ইচ্ছাকৃত হোক কিংবা ওযর বশত তাতে কিছু যায় আসেনা।

* ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইসহাক ইবনে রাহুইয়ার মতে, যদি পরবর্তী রমযান এসে যায় তবে এ রমযানের রোযা রাখার পর পূর্ববর্তী রমযানের ছুটে যাওয়া রোযার কাযা দেবে। এ বিলম্ব যদি বিনা কারণে হয়ে থাকে তবে প্রতিটি কাযা রোযার জন্যে এক মুদ্দ গম ফিদইয়া দেবে।

এ ক্ষেত্রে হানাফী আলিমদের মতটিই সঠিক বলে মনে হয়। যারা 'বিনা কারণে' বিলম্ব হলে ফিদইয়া দিতে বলেছেন, তাদের মতের সপক্ষে কোনো

www.bjilibrary.com

দলিল প্রমাণ নেই। আর একথাতো পরিষ্কার যে, দলিল প্রমাণ ছাড়া শরীয়তে কোনো মতামত গহণযোগ্য নয়।

ফিদইয়া এবং ফিদইয়ার পরিমাণ

'ফিদইয়া' শব্দের আভিধানিক অর্থ উৎসর্গ, উদ্ধার মূল্য ইত্যাদি। এখানে এর অর্থ রমযানের যেসব ফরয রোযা রাখা সম্ভব হয়নি সেগুলোর দায় থেকে মুক্ত হবার জন্যে উৎসর্গ বা উদ্ধার মূল্য হিসেবে প্রতি রোযার জন্যে একজন মিসকীনকে আহার করানো। অবশ্য ফিদইয়ার পরিমাণ কি হবে সে ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ আছে।

* **হানাফী মযহাব ঃ** হানাফী ফকীহদের মতে একজন মিসকীনকে আহার করিয়ে দেয়াই যথেষ্ট। আহার করানোর কয়েকটি অবস্থা হতে পারে ঃ

১. একদিন সকাল সন্ধ্যা দুই বেলা একজন মিসকীনকে এমনভাবে আহার করানো যাতে সে সতেজ হয়। অথবা পূর্বাহ্নে দু'বার খাওয়ানো, কিংবা অপরাহ্নে দু'বার খাওয়ানো অথবা ইফতার ও সেহরী খাওয়ানো এবং প্রত্যেক বেলাতেই পেট ভরে খাওয়ানো।

২. অথবা কোনো দরিদ্রকে অর্ধ সা'[১] গম বা তার মূল্য প্রদান করা।

৩. কিংবা কোনো মিসকীনকে এক সা' যব, খেজুর বা কিসমিস প্রদান করা।

এ প্রসংগে আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে। তাহলো এমন ব্যক্তিকে ফিদইয়া দেয়া যাবে না যার ভরণ পোষণের দায়িত্ব ফিদইয়া দাতার উপর ন্যস্ত আছে। যেমন, পিতা, দাদা, পরদাদা প্রভৃতি কিংবা স্ত্রী, পুত্রকন্যা, নাতিপুতি ইত্যাদি।

* **মালিকী মযহাব ঃ** মালিকী ফকীহদের মতে, ফিদইয়া হিসেবে নিজ এলাকার প্রধান খাদ্যের এক মুদ্দ দিতে হবে। যেমন গম, চাউল ইত্যাদি। মুদ্দ মানে দুই হাতের পূর্ণ এক অঞ্জলি। তবে মালিকী মযহাবের নির্ভরযোগ্য মত হলো, এক মুদ্দ প্রদানের পরিবর্তে সকাল সন্ধ্যায় আহার করিয়ে দেয়াই যথেষ্ট।

ফিদইয়া দিতে হবে ফকীর বা মিসকীনকে। যাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব রয়েছে, তাদেরকে ফিদইয়া দেয়া যাবেনা। অবশ্য সেইসব আত্মীয়স্বজনকে দেয়া যাবে, যাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব তার উপর নেই।

---

১. এক সা' প্রায় আট মুদ্দ সমান। আর একমুদ্দ প্রায় সাড়ে দশ ছটাকের সমান।

www.bjilibrary.com

যেমন ভাই বোন, নানা দাদা প্রভৃতি। তবে শর্ত হলো তাদেরকে ফকীর বা মিসকীন হতে হবে।

* শাফেয়ী মযহাব ঃ শাফেয়ী মযহাব অনুযায়ী রোযার ফিদইয়া হিসেবে এমনসব খাবার বস্তুই দেয়া যেতে পারে যা সদাকায়ে ফিতর বা ফিতরা হিসাবে দেয়া যায়। যেমন গম, যব ইত্যাদি। কিন্তু এগুলো দিয়ে তৈরী করা আটা বা ছাতু দেয়া ঠিক নয়। আর এক রোযার ফিদইয়া হলো এক মুদ্দ আটা বা যব। এমন কোনো মিসকীনকে ফিদইয়া দেয়া যাবে না, যার ভরণ পোষণের দায়িত্ব ফিদইয়া দানকারীর উপর ন্যস্ত। যিনি রোযা রাখতে পারেন নাই, ফিদইয়া যদি তাঁর পক্ষ থেকে অপর কেউ প্রদান করে, তবে সে ক্ষেত্রে প্রদানকারীর পোষ্য মিসকীনকেও দেয়া যাবে।

* হাম্বলী মযহাব ঃ হাম্বলী মযহাব অনুযায়ী রোযার ফিদইয়া হিসেবে মিসকীনকে এক মুদ্দ গম কিংবা অর্ধ সা' খেজুর, যব, কিসমিস বা পনির দেয়া যেতে পারে। এসব খাদ্য বস্তু থাকলে ফিদইয়া হিসেবে অন্য কোনো জিনিস প্রদান করা ঠিক নয়।[১]

ফিদইয়া হিসেবে মিসকীনকে রুটী খাইয়ে দেয়া বা নিম্নোমানের খাদ্য শস্য প্রদান করা ঠিক নয়।

ফিদইয়া দানকারী তার পিতা, দাদা, পরদাদা এবং পুত্র, নাতি এবং নাতির পুত্রদের ফিদইয়া দিতে পারবেনা, তাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত থাকুক আর না-ই থাকুক তাতে কিছু যায় আসেনা। তাছাড়া, কাফফারা প্রদানকারী নিজের কিংবা অন্যের পক্ষ থেকে কাফফারা প্রদান করলে তাতে বিধানের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই।

আমাদের মতে, এ বিষয়ে হানাফী মযহাবের মত সর্বোত্তম এবং বর্তমান যুগোপযোগী। হানাফী মতের উপরই সাধারণত আজকাল ফতোয়া প্রদান করা হয়। তাছাড়া ইমাম শা'রানী তাঁর কাশফুল গুম্মা গ্রন্থে লিখেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন ঃ যে বছর আমার পিতা উমর (রা) ইন্তেকাল করেন, সে বছরের কথা, তিনি যখন বুঝতে পারলেন এখন আর রোযার কাযা দেয়ার সময় তাঁর নেই। তখন আমরা তামার পাত্র

১. এখানে মনে রাখা দরকার যে, সকল মযহাবই ফিদইয়া হিসেবে প্রদান খাদ্য শস্য দেয়ার কথা বলেছেন। সে হিসেবে বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য চাউলও ফিদইয়া হিসেবে দেয়া যাবে।—অনুবাদক

www.bjilibrary.com

ভরে রুটি এবং গোশ্‌ত তৈরী করে ত্রিশাধিক লোককে খাইয়ে দিলাম। এ যেনো একটি রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাওয়ানো হলো।[১]

একই ভাবে মুফাসসিরে কুরআন ইমাম কুরতুবী লিখেছেন, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, শারীরিক দুর্বলতার কারণে তিনি একবছর রমযান মাসের রোযা রাখতে পারেননি। ফলে এক ডেগ খাবার তৈরী করে তিনি ত্রিশজন মিসকীন ডেকে তাদের পেট ভরে খাইয়ে দেন।[২]

রোযা রেখে গীবত, অশ্লীল ও মিথ্যা বলা নিষিদ্ধ

এ প্রসংগে নিম্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণিত হলো ঃ

(১) আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع و رب قائم ليس له من قيامه الا السهر –

"অনেক রোযাদার এমন আছে, যাদের রোযা দ্বারা ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না। আর অনেক রাতের নামাযী এমন আছে, যাদের বিনিদ্র রাত জাগা ছাড়া আর কিছুই লাভ হয়না।" [ইবনে মাজাহ, নাসায়ী, ইবনে খাজীমা, দারমী, হাকিম]

(২) আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى ان يدع طعامه د سرابه –

"যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও আচরণ ত্যাগ করতে পারলনা, তার পানাহার ত্যাগ করাতে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।"[সহীহ বুখারী]

---

১. ইমাম শা'রানী ঃ কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খন্ড ২৬০ পৃষ্ঠা।

২. আল জামে লিআহকামিল কুরআন ঃ ২য় খন্ড, ২৮৯ পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

(৩) বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরাইরা থেকে আরেকটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটির শেষাংশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

واذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فان سابه احد او قاتله فليقل انى امرء صائم –

"যখন তোমাদের কারো রোযার দিন আসে, সে যেনো অশ্লীল কথা না বলে এবং অনর্থক শোরগোল না করে। কেউ যদি তাকে গালি দেয়, অথবা তার সাথে ঝগড়া বিবাদ করতে চায়, সে যেনো তাকে বলে দেয় ঃ আমি একজন রোযাদার।"

(৪) মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, বায়হাকী প্রভৃতি গ্রন্থে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্ত দাস ওবায়েদ বলেছেন, এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহকে বললো, দু'জন মহিলা রোযা রেখেছে এবং রোযা রাখার কারণে ক্ষুৎপিপাসায় মৃত্যুর কাছাকাছি এসে পৌছেছে। হাদীসটি দীর্ঘ। শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলা দু'টি সম্পর্কে বলেন ঃ "এরা দু'জন হালাল জিনিস খেয়েই রোযা রেখেছিল কিন্তু রোযা ভেংগেছে হারাম জিনিস খেয়ে। তারা দু'জন এক জায়গায় বসে মানুষের গোশত খেয়েছে। (অর্থাৎ মানুষের গীবত করেছে)।"

এ হাদীসগুলো থেকে জানা গেলে যে, রোযাদার পুরুষ হোক কিংবা মহিলা, তাকে গীবত, অশ্লীল কথা-কাজ, মিথ্যা, পরনিন্দা, অর্থহীন গল্পগুজব প্রভৃতি থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। কারণ যেসব নারী পুরুষ রোযা রেখে এসব কাজ করবে তারা রোযার সওয়াব পাবেনা এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের রোযাও কবুল করবে না।

কিন্তু কেউ যদি রোযা রেখে উপরোক্ত কাজগুলো করে, তাতে তার রোযা ভংগ হবেনা। হাদীসের উদ্দেশ্য হলো এসব কাজ থেকে নারী পুরুষদেরকে বিরত রাখার জন্যে সতর্ক করা। এগুলো করার ফলে রোযা ভংগ হয়না। এগুলোর ফলে রোযার সওয়াব নষ্ট হয় এবং রোযা কবুল হওয়ার ব্যাপারে আশংকা থাকে।

www.bjilibrary.com

২৯. মহিলাদের ই'তেকাফ

প্রথমেই এ প্রসংগে দু'টি হাদীস উল্লেখ করছি ঃ

(১) সহীহ মুসলিমে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আয়েশা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত পর্যন্ত প্রতি বছর রমযান মাসের শেষ দশ দিন ই'তেকাফ করতেন। অতপর তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ ই'তেকাফ করতেন।

(২) সহীহ মুসলিমেই উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ই'তেকাফের এরাদা করতেন, তখন ফজর নামায পড়ার সাথে সাথে ই'তেকাফের স্থানে প্রবেশ করতেন। ই'তেকাফের সময় অবস্থানের জন্যে তাঁবু খাটাতে বলতেন। সেই মোতাবেক তাঁকে তাঁবু খাটিয়ে দেয়া হতো। একবার রমযানের শেষ দশ রোযায় তিনি ই'তেকাফের এরাদা করেন। উম্মুল মু'মিনীন যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহাও তাঁর নিজের ই'তেকাফ করার জন্যে একটি তাঁবু খাটাতে নির্দেশ দেন। ফলে তাঁকেও তাঁবু খাটিয়ে দেয়া হয়। ফজর নামাযের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক তাঁবু দেখতে পেয়ে যয়নবকে বলেন ঃ তুমিও কি নেকীলাভের আশা পোষণ করো ? অতপর রাসূলুল্লাহ নিজের তাঁবু উঠিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। সে বছর আর তিনি রমযানে ই'তেকাফ করেননি। সেই ই'তেকাফ করেন শাওয়াল মাসের প্রথম দশ দিনে।

ই'তেকাফের অর্থ

ই'তেকাফের আভিধানিক অর্থ থামা, স্থির হয়ে থাকা, অবস্থান করা। আভিধানিক অর্থে কুরআন মজীদে শব্দটি এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِىْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ٥

এই মূর্তিগুলো কি জিনিস যে, তোমরা সেগুলোর পিছে পাগল প্রায় হয়ে আছো অর্থাৎ সেগুলোর উপাসনার ব্যাপারে স্থির হয়ে আছো ?

[আম্বিয়া ঃ ৫২]

www.bjilibrary.com

শরীয়তের পরিভাষায় ই'তেকাফ মানে কোনো ব্যক্তির নির্দিষ্ট পন্থায় মসজিদে অবস্থান করা। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদে স্থিরভাবে অবস্থান করা এবং মসজিদের বাইরে না যাওয়া।

ই'তেকাফের গুরুত্ব

ই'তেকাফ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলী সুন্নাত। উপরে উদ্ধৃত হাদীস দু'টি থেকে এ সুন্নাত প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া ই'তেকাফে যে বিরাট সওয়াব রয়েছে সে ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর আলিমগণের ঐকমত্য (ইজমা) রয়েছে।

ই'তেকাফের স্তম্ভ

ই'তেকাফের তিনটি রুকন বা স্তম্ভ রয়েছে ঃ

১. মসজিদে অবস্থান করা,

২. মসজিদ,

৩. অবস্থানকারী।

মালিকী এবং শাফেয়ী মযহাবে ই'তেকাফের চারটি স্তম্ভ। তাদের মতে চতুর্থ স্তম্ভ হলো ঃ

৪. নিয়ত করা। অর্থাৎ তাদের মতে নিয়ত করাটা ই'তেকাফের শর্ত নয়, স্তম্ভ।

ই'তেকাফের মসজিদ

মসজিদে ই'তেকাফ করা জরুরী। এর প্রমাণ হলো আল্লাহর বাণী ঃ

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِى الْمَسٰجِدِ ط

" মসজিদে ই'তেকাফরত থাকা কালে তোমরা স্ত্রীসহবাস করো না।"
[আল বাকারা ঃ ১৮৭]

এ আয়াত থেকে দলিল গ্রহণ করা হয় যে, ই'তেকাফ মসজিদে করা জরুরী। মসজিদ ব্যতিরেকে যদি ই'তেকাফ জায়েয হতো, তবে কুরআনে মজীদে স্ত্রীসহবাসের বিষয়টি শুধুমাত্র মসজিদের সাথে যুক্ত করা হতোনা। কেননা ই'তেকাফ অবস্থায় তো স্ত্রীসহবাসই বৈধ নয়। সুতরাং এখানে মসজিদ কথাটি উল্লেখ করার অর্থ হলো, ই'তেকাফ মসজিদেই করতে হবে।

www.bjilibrary.com

ই'তেকাফের মসজিদ প্রসংগে মতভেদ

ই'তেকাফের মসজিদ সম্পর্কে ফকীহগণের মাঝে কিছু মতভেদ আছে। নিম্নে মশহুর মযহাবগুলোর মতামত পেশ করা হলো ঃ

* **মালিকী মযহাব ঃ** মালিকী মযহাব অনুযায়ী যে মসজিদে ই'তেকাফ করা হবে, সেটি এমন মসজিদ হতে হবে, যেখানে সব মানুষ যাতায়াত করতে পারে। সুতরাং কোনো পরিবারের জন্যে নির্দিষ্ট মসজিদে ই'তেকাফ সহীহ হবেনা। এমনকি মু'তাকিফ[১] মহিলা হলেও এমন মসজিদে ই'তেকাফ সহীহ হবেনা। পবিত্র কা'বা ঘরে, কোনো অলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ঘরে এবং মসজিদের ছাদে ই'তেকাফ সহীহ হবেনা। এভাবে মসজিদের মেহরাবে, অজু খানায় এবং বাতি জ্বালার স্থানে ই'তেকাফ সহীহ হবেনা। কারণ এ স্থানগুলো সাধারণত মসজিদের বাইরে রাখা হয়।

* **হানাফী মযহাব ঃ** হানাফী মযহাব অনুযায়ী ই'তেকাফের জন্যে এমন মসজিদ শর্ত, যে মসজিদে জামাতে নামায অনুষ্ঠিত হয় এবং নির্দিষ্ট ইমাম ও মুয়াজ্জিন নিযুক্ত আছে। অবশ্য জামাতে নামায পাঁচ ওয়াক্ত অনুষ্ঠিত হোক বা তার চাইতে কম তাতে কিছু যায় আসেনা। এ শর্ত কেবল পুরুষ মু'তাকিফের জন্যে। মহিলারা নিজেদের ঘরের সেই মসজিদেই ই'তেকাফ করতে পারে, যেখানে তারা নামায পড়ে থাকে। অর্থাৎ কোনো মহিলা যদি নিজ ঘরের কোনো নির্দিষ্ট স্থানকে নামাযের স্থান বানিয়ে থাকে, সে জায়গাটিকে সে মসজিদ বলুক আর নামাযের স্থান বলুক তাতে কিছু যায় আসে না, তার জন্যে সেই নির্দিষ্ট স্থানটি ছাড়া ঘরের অন্য কোথাও ই'তেকাফ করা জায়েয নয়। যেমন শোবার কক্ষ প্রভৃতিতে ই'তেকাফ করা জায়েয নয়। কেননা সে কক্ষ কেবল নামাযের জন্যে নির্দিষ্ট নয়।

হানাফীদের মতে, মহিলাদের এমন মসজিদে ই'তেকাফ করা মাকরূহ তানযীহি যেখানে জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

* **শাফেয়ী মযহাব ঃ** শাফেয়ীদের মতে, এমন মসজিদে ই'তেকাফ করা জায়েয, যে মসজিদ সম্পর্কে মু'তাকিফের এই ধারণা হবে যে, এ মসজিদটি মসজিদে পালনীয় সমস্ত কাজের জন্যে ওয়াকফ করা আছে। সেটি এমন জায়গা হবেনা যেখানে বিভিন্ন রকম কাজ করা হয়। তবে সেখানে জামাতে নামায হোক বা না হোক এবং সকল মানুষের প্রবেশের অনুমতি থাক বা না

১. যিনি ই'তেকাফে বসেন, তাকে মু'তাকিফ বলা হয়।—অনুবাদক

www.bjilibrary.com

থাক তাতে কিছু যায় আসেনা। এরূপ মসজিদে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যেই ই'তেকাফ করা জায়েয।

* **হাম্বলী মযহাব ঃ** হাম্বলী মযহাবে যে কোনো ধরনের মসজিদে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের ই'তেকাফ করা জায়েয। হাম্বলী মযহাবে ই'তেকাফের মসজিদের জন্যে বিশেষ কোনো শর্ত নেই। তবে, মু'তাকিফ যতোদিনের জন্যে ই'তেকাফের নিয়ত করবে, সে মুদ্দতের মধ্যে যদি এমন কোনো ফরয কাজ আসে যাতে জামাত করা ওয়াজিব, এমতাবস্থায় ই'তেকাফ কেবল এমন মসজিদেই করা সহীহ হবে যেখানে সব মানুষ শামিল হয়ে জামাত করতে পারবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার হলো যে, অধিকাংশ ফকীহ্‌র মতে, মহিলাদের ই'তেকাফ ঘরে বা ঘরের কক্ষের মসজিদে করা সহীহ নয়। কেননা ঘরের নামায কক্ষ বা মসজিদকে প্রকৃত অর্থে মসজিদ বলা যায় না।

সহীহ হাদীসে একথাও প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণ মসজিদে নববীতেই ই'তেকাফ করতেন।

মহিলাদের ই'তেকাফ প্রসংগে আমাদের মত

আমাদের মতে (অর্থাৎ এই গ্রন্থকারের মতে) মহিলাদের ই'তেকাফ প্রসংগে হানাফীদের মতই অধিকতর সঠিক। অর্থাৎ মহিলারা যদি নিজ ঘরের কোনো একটি স্থানকে নামাযের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখে থাকে, তবে তারা ই'তেকাফও সেখানে করবে।

আমাদের মতে, বর্তমান কালে সাধারণ মসজিদে মহিলাদের পক্ষে ই'তেকাফ করা সম্ভব নয়। কেননা ই'তেকাফের দীর্ঘ সময়টা মসজিদে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন থাকবে, আজকাল সে আশা করা যায়না।

তাছাড়া মহিলাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী তো রয়েছেই যে, "মহিলাদের ঘরে নামায পড়া মহল্লার মসজিদে নামায পড়ার চাইতে উত্তম। মহল্লার মসজিদে নামায পড়া তাদের জন্যে জামে' মসজিদে নামায পড়ার চাইতে উত্তম।" এই হাদীসের আলোকে একথা বলা যথার্থ হবে যে, যেখানে তাদের নামাযই ঘরে পড়া উত্তম, সে ক্ষেত্রে ঘন্টার পর ঘন্টা মসজিদে অবস্থানের চাইতে ঘরে ই'তেকাফ করাই তাদের জন্যে উত্তম।

www.bjilibrary.com

এখানে আরেকটি কথা উল্লেখ্য, যেসব উলামা মহিলাদের মসজিদে ই'তেকাফ করা জায়েয বলেছেন, তাদের অধিকাংশের মতেই জামে মসজিদে কেবল সেইসব মহিলাদেরই ই'তেকাফ করা জায়েয, যারা রূপসী সুন্দরী নয় এবং যাদের ব্যাপারে কোনো প্রকার ফিতনা ফাসাদের আশংকা থাকবে না।[১]

'রূপসী সুন্দরী নয় এমন মহিলাদেরই মসজিদে ই'তেকাফ করা জায়েয'—একথাটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা 'প্রতিটি পতিত বস্তু উঠিয়ে নেবারই লোক আছে'—এ প্রবাদ অসত্য নয়। কেবল সুন্দরী রূপসীরাই আক্রান্ত হয়, অন্যরা হয় না, একথা ঠিক নয়।

সুতরাং মহিলাদের মসজিদে ই'তেকাফ করার ক্ষেত্রে একটিই শর্ত দেয়া যেতে পারে এবং সেটা হলো 'যেনো ফিতনা সৃষ্টি হবার ভয় না থাকে।' কিন্তু বর্তমান কালে এ শর্ত পূর্ণ হওয়া প্রায় অসম্ভব। অথচ সকল মযহাবেই এ শর্ত পূর্ণ হওয়া জরুরী।

তাছাড়া, হজ্জের কথাই চিন্তা করুন। হজ্জের ক্ষেত্রে শর্ত দেয়া হয়েছে যে, মহিলাদেরকে স্বামী, কিংবা কোনো মাহ্‌রাম পুরুষ, অথবা মহিলাদের কোনো দলের সাথে হজ্জের সফরে যেতে হবে এবং তাও কেবল এমন অবস্থায়ই যাওয়া যাবে যখন তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে। এবার দেখুন, হজ্জ একটি ফরয কাজ আর সে ক্ষেত্রেই যখন মহিলাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে এতোটা কড়াকড়ি করা হয়েছে, তখন ই'তেকাফের মতো একটি নফল কাজে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তার চাইতে অধিক নজর দেয়া জরুরী নয় কি?

নিয়ত

ই'তেকাফের নিয়ত[২] করা ওয়াজিব। নিয়তকে কেউ কেউ ই'তেকাফের শর্ত, আবার কেউ কেউ রুকন (স্তম্ভ) বলেছেন। সে যাই হোক সর্বাবস্থায়ই ই'তেকাফের নিয়ত করা ওয়াজিব। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَمَآ اُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ (البينه –٥)

---

১. মুহাম্মদ বকর ইসমাঈল ঃ আল ফিকহুল ওয়াজিহ্, ২য় খন্ড, ১৪ পৃষ্ঠা।

২. নিয়ত মানে, ইচ্ছা, সংকল্প, অভিপ্রায়, পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য। নিয়ত মনের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ মনে মনে কোনো জিনিসের ইচ্ছা করা, পরিকল্পনা করা বা লক্ষ্য স্থির করা। নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা জরুরী নয়। মনে মনে সংকল্প করা বা লক্ষ স্থির করাই যথেষ্ট। মূলত মনের সংকল্পের ভিত্তিতেই সওয়াব নির্ধারিত হবে।—অনুবাদক

www.bjilibrary.com

"তাদেরকে তো কেবল এ হুকুমই দেয়া হয়েছিলো যে, তারা সবকিছু থেকে বিমুখ হয়ে কেবল আল্লাহর জন্যে একমুখী ও একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত করবে।" [সূরা আল বাইয়্যেনা ঃ ৫]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى – (بخارى رحـ و مسلم رحـ)

"আমলের প্রতিফল নিয়তের উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে, যা পাওয়ার জন্যে সে নিয়ত করে।" [বুখারী ও মুসলিম]

ই'তেকাফের শর্ত

ই'তেকাফ করার শর্ত হলো মুসলিম হওয়া, বোধশক্তি থাকা, জানাবাত[১] থেকে পবিত্র হওয়া এবং হায়েয নিফাস থেকে পাক হওয়া। সুতরাং কাফির, অবুঝ শিশু, নির্বোধ ব্যক্তি, জুনুবী, ঋতুবতী ও নিফাস ওয়ালীর ই'তেকাফ সহীহ্ হবেনা। এ প্রসংগে নিম্নে ফকীহদের মতামত তুলে ধরা হলো ঃ

* **হানাফী মযহাব ঃ** হানাফীদের মতে জানাবাত থেকে পবিত্র হওয়াটা ই'তেকাফ বৈধ হবার শর্ত, সহীহ্ হবার শর্ত নয়। সুতরাং কেউ জুনুবী অবস্থায় ই'তেকাফ করলে তার ই'তেকাফ সহীহ্ হবে, তবে জুনুবী অবস্থায় ই'তেকাফ করাটা হারাম। কিন্তু ওয়াজিব ই'তেকাফের জন্যে হায়েয নিফাস থেকে পাক হওয়া শর্ত। 'ওয়াজিব ই'তেকাফ' মানে মান্নতের ই'তেকাফ। অর্থাৎ কেউ যদি বলে, আমি আল্লাহকে খুশি করার জন্যে বা অমুক উদ্দেশ্যে এতোদিন বা এতো সময়ের জন্যে ই'তেকাফ করবো, তখনই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা তার জন্যে ওয়াজিব হয়ে পড়ে। এটাই মান্নতের ই'তেকাফ কেউ যদি হায়েয নিফাস অবস্থায় এরূপ ই'তেকাফ করে, তবে তার ই'তেকাফ সহীহ্ হবেনা। কেননা ওয়াজিব ই'তেকাফ পালনের জন্যে রোযা রাখাও শর্ত। অথচ হায়েয নিফাস অবস্থায় রোযা রাখা যায়না আর রোযা ছাড়া ওয়াজিব ই'তেকাফ হয়না। সুতরাং কেউ যদি হায়েয নিফাস অবস্থায় ই'তেকাফ করে, তবে তার ই'তেকাফ সহীহ্ হবেনা।

---

১. স্ত্রীসহবাস, স্বপ্নদোষ প্রভৃতি কারণে গোসল ফরয হওয়াকে 'জানাবাত' বলা হয় এবং এসব কারণে যার উপর গোসল ফরয হয় তাকে 'জুনুবী বলা হয়।–অনুবাদক।

www.bjilibrary.com

কিন্তু নফল মুস্তাহাব সুন্নত ই'তেকাফ সহীহ হবার জন্যে হায়েয নিফাস থেকে পাক হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং হায়েয নিফাস অবস্থায় এরূপ ই'তেকাফ সহীহ হবে।

*** মালিকী মযহাব :** মালিকী মযহাবে ই'তেকাফ সহীহ হবার জন্যে জানাবাত থেকে পাক হওয়াটা শর্ত নয়। বরঞ্চ জানাবাত থেকে পাক হওয়াটা মসজিদে অবস্থানের জন্যে শর্ত। সুতরাং ই'তেকাফ অবস্থায় যদি কেউ এমন কোনো কারণে জুনুবী হয় যদ্বারা ই'তেকাফ নষ্ট হয়না, যেমন স্বপ্নদোষ, তবে মসজিদে পানি না থাকলে বাইরে গিয়ে দ্রুত গোসল করে আসা তার জন্যে ওয়াজিব। কিন্তু সে বাইরে থেকে গোসল করে ফিরতে দেরী করলে তার ই'তেকাফ বাতিল হয়ে যাবে। অবশ্য জরুরী প্রয়োজনে বিলম্ব হলে ই'তেকাফ বাতিল হবেনা। যেমন নখ কাটা, মোঁচ ছাঁটা ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে হায়েয নিফাস থেকে পাক হওয়া ই'তেকাফ সহীহ হবার জন্যে শর্ত। সবধরনের ই'তেকাফের জন্যেই এ শর্ত প্রযোজ্য।

মালিকী মযহাবে ই'তেকাফ সহীহ হবার জন্যে রোযা রাখা শর্ত। আর যেহেতু হায়েয নিফাস অবস্থায় রোযা রাখা যায়না, সেজন্যে ই'তেকাফে থাকাকালে যদি কারো হায়েয বা নিফাস আরম্ভ হয়, তবে তার জন্যে মসজিদ থেকে বের হয়ে আসা ওয়াজিব। অতপর হায়েয ও নিফাস বন্ধ হবার পর তাকে পুনরায় মসজিদে আসতে হবে এবং যতোদিন ই'তেকাফ করার নিয়ত বা মান্নত করেছিল তার অবশিষ্ট দিনগুলো পূর্ণ করতে হবে। মান্নতের ই'তেকাফ হয়ে থাকলে ওজরের কারণে যতোদিন ই'তেকাফ করতে পারিনি মসজিদে ফিরে এসে এই ছুটে যাওয়া দিনগুলোসহ ই'তেকাফের মুদ্দত পূরণ করতে হবে। কিন্তু নফল বা সুন্নত ই'তেকাফ হয়ে থাকলে ছুটে যাওয়া দিনগুলোর জন্যে অতিরিক্ত ই'তেকাফ করতে হবেনা।

ই'তেকাফের সময় কি রোযা রাখা শর্ত

মালিকী মযহাব অনুযায়ী মান্নতের হোক আর নফল হোক সব ধরনের ই'তেকাফের রোযা রাখা শর্ত। কিন্তু হানাফীদের মতে ওয়াজিব ই'তেকাফ অর্থাৎ মান্নতের ই'তেকাফের জন্যে রোযা শর্ত, নফল ই'তেকাফের জন্যে শর্ত নয়।

আমাদের দৃষ্টিতে অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য মত হলো, মু'তাকিফ যদি রোযা রাখে তো ভালো। কিন্তু রোযা না রাখলেও কোনো ক্ষতি নেই। তবে মান্নতের ই'তেকাফ হলে রোযা রাখবে।

www.bjilibrary.com

সায়ীদ ইবনে মনসুর আবু সহলের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবু সহল বলেন, আমার খান্দানের এক মহিলার ঘাড়ে মান্নতের ই'তেকাফ ছিলো। অর্থাৎ তিনি ই'তেকাফ করার মান্নত করেছিলেন। আমি তার বিষয়টি উমর ইবনে আবদুল আযীযের নিকট উত্থাপন করলে তিনি বলেন ঃ তার ই'তেকাফের সময় রোযা রাখা ওয়াজিব নয়। তবে রোযাসহ ই'তেকাফ করার মান্নত করে থাকলে রোযাও রাখতে হবে।

ইমাম যুহরী বলেছেন ঃ 'রোযা ছাড়া ই'তেকাফ হয়না। তাঁর এ বক্তব্য শুনে উমর ইবনে আবদুল আযীয তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'একথা কি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ?'

ইমাম যুহরী ঃ 'জী-না'।

উমর ইবনে আবদুল আযীয ঃ 'তবে কি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন ?'

ইমাম যুহরী ঃ 'জী-না'।

উমর ইবনে আবদুল আযীয ঃ 'তাহলে কি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন ?'

ইমাম যুহরী ঃ 'না'।

বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে পড়ছে এরপর উমর ইবনে আবদুল আযীয ইমাম যুহরীকে সম্ভবত একথাই জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, 'তবে কি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন ?' ইমাম যুহরী জবাব দিয়েছিলেন ঃ 'জী-না।

আবু সহল বলেন, এরপর ঐ মজলিশ থেকে বের হয়ে আমি ইমাম আতা এবং ইমাম তাউসের সাথে সাক্ষাত করে এ বিষয়ে তাঁদের কাছে জানতে চাই। জবাবে ইমাম তাউস বলেন ঃ 'অমুকের মতে, কোনো মহিলা ই'তেকাফের মান্নত করলে তার উপর রোযা ওয়াজিব হয় না, তবে সেই সাথে রোযা রাখারও মান্নত করে থাকলে রোযা রাখাও ওয়াজিব হয়ে পড়ে।' ইমাম আতা সরাসরি এ জবাব দেন যে, তার জন্যে রোযা রাখা জরুরী নয়। তবে রোযাসহ ই'তেকাফের মান্নত করে থাকলে রোযা রাখা ওয়াজিব।

ই'তেকাফের জন্যে স্বামীর অনুমতি প্রয়োজন আছে কি ?

* মহিলাদের জন্যে স্বামীর অনুমতি ছাড়া ই'তেকাফ করা ঠিক নয়। এমনকি মান্নতের ই'তেকাফও নয়। তবে যাদের স্বামী নেই তাদের কথা ভিন্ন। এটা হানাফীদের মত।

www.bjilibrary.com

* শাফেয়ীদের মতে, কোনো মহিলা যদি স্বামীর অনুমতি ছাড়া ই'তেকাফ করে, তবে তার ই'তেকাফ হয়ে যাবে বটে, কিন্তু গুনাহ্‌গার হবে। পক্ষান্তরে রূপসী সুন্দরী মহিলা যদি স্বামীর অনুমতি নিয়েও ই'তেকাফ করে, তবু তার ই'তেকাফ করাটা মাকরূহ হবে।

* মালিকীদের মতে স্বামীর অনুমতি ছাড়া ই'তেকাফের মান্নত করাটাই জায়েয নয় এবং নফল ই'তেকাফ করাও জায়েয নয়। স্বামীর তাকে প্রয়োজন হবে বা সহবাস করতে চাইবে বলে যদি ধারণা থাকে তারপরও স্বামীর অনুমতি ছাড়াই ই'তেকাফ করে, তবে ই'তেকাফ হয়ে যাবে বটে, কিন্তু স্বামী 'সহবাস' করতে চাইলে স্ত্রীর ই'তেকাফ ভংগ করিয়ে 'সহবাস' করবার অধিকার স্বামীর আছে। তবে 'সহবাস' ছাড়া অন্য কোনো কারণে ই'তেকাফ ভংগ করার হুকুম স্বামী দিতে পারেনা। ই'তেকাফ ভংগ হবার পর স্ত্রীকে এ ই'তেকাফের কাযা দিতে হবে, এমনকি নফল ই'তেকাফ হলেও। কেননা, স্বামীর অনুমতি না নিয়ে সে একটি বাড়াবাড়ির অপরাধে অপরাধী হয়েছে। তবে কাযা দেয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করা জরুরী নয়। অতপর যখনই কাযা ই'তেকাফ করতে চাইবে স্বামীর অনুমতি নিয়ে করবে।

রাসূলুল্লাহ কেন স্বীয় ই'তেকাফের তাবু উঠিয়ে ফেললেন?

এ অধ্যায়ের শুরুর দিকে আমরা একটি হাদীস উল্লেখ করেছি, তাতে বলা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রমযানের শেষ দশদিন ই'তেকাফ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর জন্যে তাবু খাটানোর নির্দেশ দেন। সে মোতাবেক তাঁর জন্যে তাবু খাটানো হয়। এদিকে উম্মুল মু'মিনীন যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহাও তাঁর নিজের জন্যে তাবু খাটানোর নির্দেশ দেন। সুতরাং তাঁর জন্যেও তাবু খাটানো হয়। উম্মুল মু'মিনীনদের আরো কয়েকজনও নিজ নিজ তাবু খাটানোর নির্দেশ দেন এবং তাঁদের জন্যেও তাবু খাটানো হয়। অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর নামায পড়ে ঐ তাবুগুলো দেখতে পান: তিনি তাঁদের বলেন ঃ 'তোমরা সবাই কি নেকী অর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছো?' এরপর তিনি নিজ তাবু উঠিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন এবং শাওয়াল মাসের পয়লা দশদিন ই'তেকাফ করেন।

ইমাম নববী লিখেছেন ঃ কাযী ইয়ায বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আ-লাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সময় যা কিছু বলেছেন, তাতে বুঝা যায়, তিনি পবিত্র

www.bjilibrary.com

স্ত্রীগণের ঐ কাজকে অপসন্দ করছিলেন। অবশ্য কোনো কোনো স্ত্রীকে তিনি ই'তেকাফের অনুমতি প্রদান করেন, বুখারীতে একথা উল্লেখ আছে। তাঁর সাথে তাঁদের ই'তেকাফ করার প্রতিযোগিতাকে তিনি সম্ভবত এ কারণেই অপসন্দ করেছিলেন যে, হয়তো তাঁরা ই'তেকাফের চাইতেও স্বামীর নৈকট্য লাভের ব্যাপারে একে অপরকে হারিয়ে দেবার চিন্তা বেশী করেছিলেন। সুতরাং তিনি ঐ সময় মসজিদে অবস্থান করাটা পসন্দ করেননি।

অথবা তাঁর অপসন্দের কারণ এটাও হতে পারে যে, তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রীগণও যদি একই মসজিদে ই'তেকাফে বসেন, তাহলে সেখানে একটা পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং ই'তেকাফের পরিবেশ ক্ষুণ্ন হবে। ফলে তিনি ঐ সময় ই'তেকাফ থেকে বিরত থাকেন।

অথবা এমনও হতে পারে যে, অনেকগুলো তাবু খাটানোর ফলে মসজিদের ভিতরকার জায়গা সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল এবং এর ফলে তিনি ঐসময় ই'তেকাফ থেকে বিরত থাকেন।

ইমাম নববী লিখেছেন, এ হাদীস দ্বারা মহিলাদের ই'তেকাফ করার যে অনুমতি আছে, সে প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীগণকে ই'তেকাফ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। পরে যে তাঁদের কাউকেও কাউকেও ই'তেকাফ করতে নিষেধ করেছিলেন, তা থেকে একথা প্রমাণ হয় যে, স্ত্রীদেরকে ই'তেকাফের অনুমতি না দেবার অধিকার স্বামীদের আছে। এখানে তিনি তাঁদের এটাও বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীদের ই'তেকাফে আসা ঠিক নয়।—এ বিষয়ে আলিমগণ একমত। তবে স্বামী স্ত্রীকে ই'তেকাফের অনুমতি দেবার পর আবার নিষেধ করতে পারে কিনা সে বিষয়ে আলিমগণের মাঝে মতভেদ আছে।

ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল এবং দাউদ যাহেরীর মতে স্বামী তার স্ত্রীকে এবং মনিব তার গোলামকে ই'তেকাফের অনুমতি দেবার পর আবার নিষেধ করতে পারে। এ অধিকার স্বামীর আছে। এমনকি নফল ই'তেকাফ থেকে বের করেও আনতে পারে।

ইমাম মালিকের মতে অনুমতি দেবার পর নিষেধ করা জায়েয নয়।

ইমাম আবু হানীফার মতে মনিব তার গোলামকে ই'তেকাফের অনুমতি দেবার পরও নিষেধ করতে পারে। কিন্তু স্বামী তার স্ত্রীকে অনুমতি দেবার পর নিষেধ করতে পারেনা।

www.bjilibrary.com

ই'তেকাফের মুদ্দত

উপরোল্লিখত হাদীসগুলো থেকে বুঝা যায় নফল মুস্তাহাব বা সুন্নত ই'তেকাফের নির্দিষ্ট কোনো মুদ্দত নেই। কেবল ই'তেকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করলেই ই'তেকাফ হয়ে যাবে। এ অবস্থান কম সময়ের জন্যেও হতে পারে আবার বেশী সময়ের জন্যেও হতে পারে। সুতরাং মু'তাকিফ এক ঘন্টার জন্যেও ই'তেকাফের নিয়ত করতে পারে।

ইয়ালী ইবনে উমাইয়া বলেছেন, আমি যখনই মসজিদে এক ঘন্টার জন্যেও অবস্থান করি, তখন ই'তেকাফের নিয়ত করে নিই।

নফল ই'তেকাফ যখন ইচ্ছে শেষ করে দেয়া যায়। অর্থাৎ যতো সময় অবস্থানের নিয়ত করেছিল, তা পূর্ণ হবার পূর্বেই শেষ করতে পারে।

অবশ্য ওয়াজিব ই'তেকাফ বা মান্নতের ই'তেকাফ মুদ্দত পূর্ণ করতে হবে।

কি কি কারণে ই'তেকাফ ভংগ হয়

(১) স্ত্রী সংগম অর্থাৎ নারী পুরুষের দৈহিক মিলন ঘটলে ই'তেকাফ ভংগ হয়ে যায়। এ মিলনের ফলে বীর্যপাত হোক বা না হোক, এ মিলন ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলবশত এবং রাত্রে হোক বা দিনে সর্বাবস্থায়ই ই'তেকাফ ভংগ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে এরশাদ করেছেন ঃ

وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِى الْمَسٰجِدِ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا - (البقرة -١٨٧)

"তোমরা যখন মসজিদে ই'তেকাফ রত থাকবে, তখন স্ত্রীদের সাথে সহবাস করোনা। এটা আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমা। সুতরাং এর নিকটবর্তী হয়োনা।"[আল বাকারা ঃ ১৮৭]

(২) শৃংগার বা সহবাস পূর্ব ক্রিয়াকর্ম, যেমন চুম্বন, মর্দন, ঢলাঢলি ইত্যাদি। শৃংগারের ফলে বীর্যপাত না ঘটলে ই'তেকাফ নষ্ট হয় না বটে, তবে কামোত্তেজনার সাথে এসব ক্রিয়া করা হারাম।

উম্মুল মু'মিনীন সুফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ মসজিদে ই'তেকাফরত ছিলেন। আমি কিছু কথা বলার জন্যে রাত্রে তাঁর

www.bjilibrary.com

কাছে গেলাম। আমি ফিরে আসার সময় তিনিও সাথে উঠে এলেন আমাকে চুম্বন দিয়ে বিদায় দেবার জন্যে। এ সময় দু'জন আনসার আমাদের পাশে দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। আমাদের দেখে তারা দ্রুত চলে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ তাদের ডেকে বললেন ঃ 'তোমরা একটু দাঁড়াও, এ হচ্ছে সুফিয়া বিনতে হুয়াই (আমার স্ত্রী)।' একথা শুনে তারা বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, সুবহানাল্লাহ (আমরা তো কোনো প্রকার সন্দেহে নিমজ্জিত হইনি। আপনার এ ব্যাখ্যা দেয়ার কি প্রয়োজন ছিলো)। জবাবে রাসূলুল্লাহ বললেন ঃ

ان الشيطان يجرى من الانسان مجرى ، فخشيت ان يقذف فى قلوبكما شيئاً

"শয়তান মানুষের রক্তপ্রবাহের সাথে চলে। তাই আমি আশংকা করছিলাম, সে যদি তোমাদের অন্তরে কোনো প্রকার সন্দেহ—অন্যায় ধারণা প্রবেশ করিয়ে দেয়।" [সহীহ্ আল বুখারী ও সুনানে আবু দাউদ]

কামোত্তেজনা বিহীন সাধারণভাবে স্পর্শ করলে ই'তেকাফ নষ্ট হয় না এ হাদীস থেকে সে কথাই প্রমাণ হয়। তাছাড়া আরেকটি হাদীসে আয়েশা রাদিয়াল্লাহ্ আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই'তেকাফ অবস্থায় তাঁর মাথা এগিয়ে দিতেন, আমি তাঁর চুল আঁচড়ে দিতাম।" (বুখারী ও মুসলিম)

এ প্রসংগে ফকীহদের মধ্যে কিছু মতভেদ আছে। এখানে মতভেদগুলো উল্লেখ করা হলো ঃ

মালিকীদের মতে, চুম্বনের হুকুম সহবাসের মতো। সুতরাং চুম্বনের ফলে ই'তেকাফ ভংগ হয়ে যায়। এমনকি চুম্বন উত্তেজনাবশত না হলেও, স্বাদ আস্বাদন করা উদ্দেশ্য না হলেও এবং এর ফলে বীর্যপাত না হলেও ই'তেকাফ ভংগ হয়ে যাবে।

তবে সাধারণভাবে স্পর্শ করা এবং দেহের সাথে দেহ লাগালো দ্বারা ই'তেকাফ ভংগ হবেনা। কিন্তু স্বাদ আস্বাদনের উদ্দেশ্যে হলে এবং স্বাদ আস্বাদন করা হয়ে থাকলে ই'তেকাফ ভংগ হয়ে যাবে।

ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে ই'তেকাফ অবস্থায় কামোত্তেজনার সাথে চুম্বন দেয়া বা স্পর্শ করা হারাম বটে, তবে বীর্যপাত না ঘটলে ই'তেকাফ বাতিল হবেনা।

www.bjilibrary.com

ইমাম শাফেয়ীর এ প্রসংগে দু'টি মত পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ

এ বিষয়ে আলিমগণের মাঝে মতভেদের কারণ হলো আল্লাহর বাণী "মসজিদে ই'তেকাফ অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মুবাশিরাত করো না"–এর একাধিক ব্যাখ্যা। মুবাশিরাত দ্বারা 'সহবাস'ও বুঝায় আবার সহবাসের চাইতে কমও বুঝায় অর্থাৎ চুম্বন, স্পর্শ ইত্যাদি শৃংগার যা সহবাসের পূর্বে করা হয়ে থাকে।

এ হিসেবে কোনো কোনো আলিম এর অর্থ করেছেন শুধু সহবাস, যদ্বারা বীর্যপাতও ঘটে থাকে। সুতরাং তাদের মতে সহবাস করলেই ই'তেকাফ ভংগ হবে।

আবার কিছু কিছু আলিম 'মুবাশিরাত' দ্বারা সহবাস এবং সহবাস পূর্ব সকল প্রকার শৃংগার অর্থ করেছেন। সুতরাং তাদের মতে সহবাস করলে তো ই'তেকাফ ভংগ হবেই। তাছাড়া কামোত্তেজনার সাথে শুধু চুম্বন দিলেও ই'তেকাফ ভংগ হয়ে যাবে।

(৩) দেখার ফলে কিংবা কামোত্তেজনামূলক কথাবার্তা ও বিষয়াদি চিন্তা করার ফলে যদি বীর্যপাত ঘটে, তবে অধিকাংশ আলিমের মতে ই'তেকাফ বাতিল হয়না। একইভাবে স্বপ্নদোষেও ই'তেকাফ বাতিল হয়না।

তবে মালিকীদের মতে দেখার ফলে বা চিন্তা করার ফলে যদি দিনে বা রাত্রে বীর্যপাত ঘটে, তা ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলবশত হোক, ই'তেকাফ ভংগ হয়ে যাবে।

শাফেয়ীদের মতে কারো যদি দেখা ও চিন্তা করার ফলে বীর্যপাত ঘটার সাধারণ অভ্যাস থাকে তবে ই'তেকাফ অবস্থায় দেখা ও চিন্তার ফলে বীর্যপাত ঘটলে তার ই'তেকাফ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু এরূপ অভ্যাস না থাকলে বাতিল হবেনা।

(৪) হায়েয ও নিফাস দেখা দিলে ইতেকাফ বাতিল হয়ে যাবে।—একথাও আগেই আলোচনা করে এসেছি।

www.bjilibrary.com

৩০. মহিলাদের হজ্জ সংক্রান্ত বিধান

হজ্জের অর্থ

হজ্জের শাব্দিক অর্থ সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ স্থানে যাবার ইচ্ছা করা ও সিদ্ধান্ত নেয়া।

শরীয়তের পরিভাষায় হজ্জ মানে কতিপয় নির্দিষ্ট আমলের সমষ্টি, যেগুলো বিশেষ পন্থায়, বিশেষ সময় এবং বিশেষ স্থানে পালন করতে হয়।

নির্দিষ্ট আমল বলতে বুঝায়, তাওয়াফ, সায়ী, পাথর নিক্ষেপ, আরাফায় অবস্থান, কুরবানী করা ইত্যাদি আমল।

নির্দিষ্ট তারিখ মানে যিল হজ্জ মাসের নির্দিষ্ট তারিখসমূহ।

নির্দিষ্ট স্থানে বলতে বুঝায় কা'বা ও মক্কার অন্য কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থান।

নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট আমলগুলো ঠিক সেই পন্থায় করার নামই হলো হজ্জ যে পন্থায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন এবং শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। আর এসব আমল ও আহকাম পালনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো মহান আল্লাহর হুকুম পালনের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি ও রেজামন্দি হাসিল করা।

হজ্জ ফরয হবার দলিল

হজ্জ ফরয হবার বিষয়টি আল্লাহর কিতাব আল কুরআন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ এবং গোটা উম্মতের ঐকমত্যের (ইজমা) ভিত্তিতে প্রমাণিত। পবিত্র কুরআন মজীদের দলিল হলো নিম্নোক্ত আয়াত ঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً ط
وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ - (ال عمران - ٩٧)

"মানুষের উপর আল্লাহর এই অধিকার বর্তিয়েছে যে, তাঁর এই ঘর (কা'বা) পর্যন্ত পৌছুবার সামর্থ যার আছে, সে অবশ্যি হজ্জ পালন করবে। আর যে এই নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করবে, তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ জগতবাসীর মুখাপেক্ষী নন।"

[আলে ইমরান ঃ ৯৭]

www.bjilibrary.com

হজ্জ ফরয হবার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর সুন্নায় অনেক দলিল প্রমাণ বর্তমান রয়েছে। তবে এখানে তাঁর একটি বাণী উল্লেখ করাই যথেষ্ট। সেটি হলো ঃ

بنى الا سلام على خمس شهادة ان لا اله الا اللّه وان محمداً رسول اللّه واقام الصلواة وايتاء الزكوة وحج البيت و صوم رمضان - (بخارى رح و مسلم رح)

"পাঁচটি জিনিষের উপর ইসলামের ভিত প্রতিষ্ঠিত। সেগুলো হলো ঃ

১. আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল—এ সাক্ষ্য দেয়া।

২. সালাত কায়েম করা।

৩. যাকাত আদায় করা।

৪. বায়তুল্লায় হজ্জ করা এবং

৫. রমযান মাসের রোযা রাখা।" [বুখারী ও মুসলিম]

হজ্জ যে ফরয, সে ব্যাপারে আগে পরের গোটা ইসলামী উম্মাহ একমত। উম্মাহ এ ব্যাপারেও একমত যে, হজ্জ ফরয হবার বিষয়টি যে কেউ অস্বীকার করবে, সে কাফির।

প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক ভাষণে বলেছেন ঃ "হে লোকেরা তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে।"একথা শুনে আকরা ইবনে হাবিস রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে আরয করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, প্রত্যেক বছরই কি হজ্জ করা ফরয ?" তার প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

لو قلتها لوجبت - ولو وجبت لم تعملوا بها و لم تستطيعوا الحج مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع - (احمد رح والنسائ رح)

"তোমার প্রশ্নের জবাবে আমি হাঁ, বললে প্রতি বছরই হজ্জ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। আর প্রত্যেক বছর হজ্জ করা ওয়াজিব হলে তোমরা তা পালন

www.bjilibrary.com

করতে সক্ষম হবেনা। হজ্জ জীবনে একবার পালনীয়। আর কেউ যদি এর চাইতে অধিক করে তবে তা তার নফল ইবাদত বলে গণ্য হবে।"

উমরার বিবরণ

উমরা মানে আল্লাহর কা'বা যিয়ারত ও তাওয়াফ করা। সাফা মারওয়ায় সায়ী' করা এবং মাথা কামিয়ে ফেলা বা চুল ছেঁটে ফেলা।

উমরা করার নির্দেশও কুরআন মজীদ, রাসূলুল্লাহর সুন্নাহ এবং উম্মতের ইজমা (ঐকমত্য) থেকে প্রমাণিত। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ–(البقرة : ١٩٦)

"এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ এবং উমরা পালন করো।"

[আল বাকারা ঃ ১৯৬]

মুসনাদে আহমদ এবং সুনানে ইবনে মাজায় আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "রমযান মাসে একটি উমরা করা একটি হজ্জের বরাবর।"

* ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে উমরা ফরয। কেননা আল্লাহ তা'আলা যে বলেছেন ঃ

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ – (البقره –١٩٦)

এখানে (আতিম্মু) শব্দটি 'আমর' বা নির্দেশসূচক। আর যেহেতু আল্লাহর নির্দেশ পালন করা ফরয, সেহেতু উমরা করা ফরয। এ ছাড়া আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ এবং বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু যেরীন উকায়লী রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে আরয করেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার পিতা এতোটা বৃদ্ধ এবং জয়ীফ হয়ে গেছেন যে, হজ্জ, উমরা এবং সফর করতে অক্ষম।' এর জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ এবং উমরা করে নাও।"

* ইমাম মালিকের মতে উমরা সুন্নাতে মু'আক্কাদা।

* হানাফীদের মতেও উমরা সুন্নাতে মু'আক্কাদা।

www.bjilibrary.com

হজ্জ মহিলাদের জিহাদ

মহিলাদের জন্যে হজ্জ জিহাদের সমতুল্য। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : "আমি রাসূলুল্লাহর নিকট আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহর পথে জিহাদ করাতো সকল আমলের চাইতে উত্তম। তবে আমরা মহিলারা কেন জিহাদ থেকে বঞ্চিত থাকবো ?" রাসূলুল্লাহ জবাব দিলেন :

لكن افضل الجهاد حج مبرور-

"তোমাদের জন্যে সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে পবিত্র অনাবিল হজ্জ।" [বুখারী]

ইবনে খাযীমা বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিবেদন করলেন : 'হে আল্লাহর রাসূল, মহিলাদের উপর কি জিহাদ করা ফরয ?' জবাবে তিনি বললেন :

عليهن جهاد لا قتال فيه ......الحج والعمرة

"মহিলাদের উপর এমন জিহাদ ফরয, যাতে কোনো যুদ্ধ নেই ----- সেটা হলো হজ্জ আর উমরা।"

সুনানে নাসায়ীতে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

جهاد الكبير والضعيف والمرأة ......الحج والعمرة

"বৃদ্ধ, দুর্বল ও মহিলাদের জিহাদ হলো হজ্জ এবং উমরা।"

উম্মে মা'কালের সূত্রে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে মা'কাল বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিদায় হজ্জে গমন করেন, সে সময় আমাদের একটি উট ছিল। আবু মা'কাল উটটি আল্লাহর পথে দান করে দিয়েছিলেন। এ সময় আমাদের এখানে মহামারী দেখা দেয়। তাতে আবু মা'কালও ইহকাল ত্যাগ করেন। অতপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ সমাপন করে ফিরে আসেন। আমাকে তিনি জিজ্ঞেস করেন :

يا ام معقل رضـ ما منعك ان تخرجي معنا ؟

"হে মা'কালের মা, আমাদের সাথে হজ্জে যেতে তোমার কি প্রতিবন্ধকতা ছিলো ?

www.bjilibrary.com

"আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা হজ্জে যাবার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, এমনি সময় মা'কালের বাবা ইন্তেকাল করেন। আমাদের একটি মাত্র উট ছিলো, সেটিও আল্লাহর পথে দান করবার জন্যে তিনি অসীয়ত করে যান। সব শোনার পর তিনি বললেন ঃ

فهلا خرجت عليه فان الحج فى سبيل الله ؟ فاما اذا فاتتك هذه الحجة فاعتمرى فى رمضان فانها كحجة –

"সেই উটটিতে সওয়ার হয়েই কেন তুমি হজ্জে গেলে না ? হজ্জও তো আল্লাহর পথেই হয়ে থাকে। এ হজ্জটি যখন তুমি হারিয়েছো, তখন রমযান মাসে উমরা করবে। কেননা উমরা হজ্জেরই সমতুল্য।"

হজ্জ করার জন্যে স্বামীর অনুমতি নেয়া

মহিলাদের জন্যে হজ্জ এবং অন্যান্য নেক কাজে যাবার পূর্বে স্বামীর অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব। স্বামীর জন্যে এসব কাজে অনুমতি দেয়া মুস্তাহাব।

কোনো কোনো আলিমের মতে স্ত্রীকে হজ্জে যেতে অনুমতি না দেবার অধিকার স্বামীর আছে। কেননা তাৎক্ষণিকভাবে হজ্জে যাওয়া তো ওয়াজিব নয়, বরঞ্চ জীবনে কোনো এক সময় হজ্জ করলেই চলে।

* হানাফীদের মতে, স্বামী স্ত্রীকে হজ্জে বাধা দিতে পারেনা।

* ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মত হানাফীদের অনুরূপ।

* ইমাম শাফেয়ীও একই মত দিয়েছেন। এমতের পক্ষে তাঁদের যুক্তি হলো, হজ্জ ইসলামের একটি ফরয কাজ। আর ফরয কাজে বাধা দেবার অধিকার কারো নেই।

স্বামীর অনুমতি না পেলে কি করবেন ?

কোনো মহিলাকে যদি তার স্বামী হজ্জে যেতে অনুমতি না দেয়, সে ক্ষেত্রে তিনি কি করবেন ? এর জবাব হলো, অনুমতি তাকে চাইতে হবে। কিন্তু স্বামী যদি অনুমতি না দেন, তবে স্বামীর অনুমতি ছাড়াই যাত্রা করবার অধিকার তার আছে। কেননা হজ্জ একটি ফরয কাজ। আর ফরয ত্যাগ করলে আল্লাহ পাকড়াও করবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

www.bjilibrary.com

لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق (مجمع الزوائد)

"স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবেনা।"

[মাজামাউয্ যাওয়াদ]

কিন্তু একজন মহিলা তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া কেবল তখনই হজ্জ যাত্রা করতে পারবে, যখন ঃ

ক. তার সাথে কোনো মাহ্‌রাম আত্মীয় সফর সংগী হবে;

খ. সফর নিরাপদ হবে ;

গ. যে অর্থ ব্যয় করে যাবে, তা তার ব্যক্তিগত হবে, স্বামীর অর্থে যাবেনা এবং

ঘ. অবস্থা এমন হবে যে, ফিরে আসা পর্যন্ত স্বামীর জন্যে তার সেবার প্রয়োজন হবেনা এবং তার অবর্তমানে স্বামী কোনো অসুবিধায় পড়বেননা।

সুতরাং কোনো মহিলার যদি নিজের প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকে এবং স্বামী হজ্জের খরচ দিতে অস্বীকার করে, তবে তার উপর হজ্জ করা ফরয নয়। কেননা হজ্জ ফরয হবার শর্ত হলো নিজের সামর্থ থাকা। স্ত্রীর হজ্জের খরচ প্রদান করা তো স্বামীর অপরিহার্য দায়িত্ব নয়। স্ত্রীর খোরপোষের দায়িত্বই কেবল স্বামীর উপর বর্তায়। আর খোর পোষ বলতে বুঝায় মৌলিক প্রয়োজন। যেমন—খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি।

এমনি করে স্বামীর যদি স্ত্রীকে প্রয়োজন হয় এবং প্রয়োজন যতোদিন থাকবে, ততোদিন স্ত্রীর জন্যে হজ্জে যাওয়া ফরয নয়। প্রয়োজন অনেক প্রকারের হতে পারে, যেমন—স্বামীর অসুস্থতার কারণে তাকে তত্তাবধান করার প্রয়োজন, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থাকলে তাদের প্রতিপালনের প্রয়োজন প্রভৃতি। এ ধরনের অবস্থায় স্ত্রীর উপর হজ্জ ফরয হয়না। কেননা এসব অবস্থায় তিনি মূলত আইনগতভাবে অক্ষম। অনেক আলিমের মতে, হজ্জ এমন একটি ইবাদত যা তাৎক্ষণিকভাবে করা ফরয নয়, বরং হজ্জ মুলতবী রাখা যেতে পারে। সুতরাং কোনো মহিলা ওজরের কারণে এক বছরের হজ্জ অন্য বছর করতে পারেন, এতে কোনো অসুবিধা নেই। [১]

নফল হজ্জের ব্যাপারে সমস্ত আলিম একমত যে, স্বামী তার স্ত্রীকে নফল হজ্জ করতে নিষেধ করতে পারেন। তবে মান্নতের হজ্জ হলে নিষেধ করতে

১. মুহাম্মাদ বকর বিন ইসমাঈল ঃ আল ফিকহুল ওয়াজিহ, ১ম খন্ড।

www.bjilibrary.com

পরেননা। কেননা মান্নত করলে নফল হজ্জ ওয়াজিব হয়ে যায়। আর ওয়াজিব হয়ে যাবার কারণে এটা সেই হজ্জের সমতুল্য হয়ে যায়, যে হজ্জ ইসলামের রুকন।

শাফেয়ীদের মতে স্বামী স্ত্রীকে ফরয হজ্জ করতেও বারণ করতে পারেন। কেননা, একদিকে হজ্জ ফরয হবার সাথে সাথে তাৎক্ষণিকভাবেই হজ্জ করা জরুরী হয়ে পড়েনা, বরঞ্চ এ ক্ষেত্রে বিলম্ব করা যেতে পারে। অপর দিকে নাফে' আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ কোনো বিবাহিত মহিলা যদি সম্পদশালী হয় এবং তার স্বামী যদি তাকে হজ্জে যেতে অনুমতি না দেয়, এমন মহিলা সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

ليس لها ان تنطلق الا باذن زوجها - (دار قطني)

"স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঐ মহিলা হজ্জে বের হবে না।" [দারুকুতনী]

কেউ কেউ এ হাদীসটিতে সূত্রগত দুর্বলতা আছে বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ আলিমের মতে, এ হাদীসে যে স্বামীর অনুমতি নেয়ার কথা বলা হয়েছে, সেটা নফল হজ্জের ব্যাপারে বলা হয়েছে। এ হিসেবে হাদীসটির বক্তব্য যথার্থ। তাদের মতে ফরয হজ্জে স্বামীর অনুমতি পাওয়া জরুরী নয়। কেননা স্রষ্টার অবাধ্য হয়েতো সৃষ্টির কথা মানা যায়না।

মহিলাদের জন্যে মাহরাম সফরসংগী থাকা শর্ত

অধিকাংশ ফকীহর মতে মহিলাদের উপর হজ্জ ফরয হবার আরেকটি শর্ত হলো হজ্জের সফরে স্বামী বা অন্য কোনো মাহরাম আত্মীয় তাদের সফর সংগী হতে হবে। মহিলাদের জন্যে এ শর্তটি শুধু মাত্র হজ্জের সফরেই নয়, বরং সকল সফরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের অধিক পথ সফর করতে হলে মহিলাদের সাথে স্বামী বা কোনো মাহরাম আত্মীয়ের সফর সংগী থাকা আবশ্যক।

এই শর্তটির প্রমাণ হিসেবে যেসব হাদীস পেশ করা হয় সেগুলো হলো ঃ

(১) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক ভাষণে বলেছেন ঃ

www.bjilibrary.com

لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم و لا تسافر المرأة الا مع ذى محرم –

"কোনো পুরুষ কোনো মহিলার সাথে নির্জনতা অবলম্বন করবেনা যদি তার সাথে কোনো মাহরাম না থাকে এবং মাহরাম সংগী ছাড়া কোনো মহিলা সফরে বের হবেনা।"

একথা শুনে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নিবেদন করলো ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্ত্রী তো একাকী হজ্জে রওয়ানা করেছে আর অমুক যুদ্ধের সৈনিক হিসেবে আমার নাম লেখা হয়েছে।"

তার বক্তব্য শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

فانطلق فحج مع امرأتك – (متفق عليه)

"এমনটি হয়ে থাকলে তুমি চলে যাও, তোমার স্ত্রীর সাথে গিয়ে হজ্জ করো।" [বুখারী, মুসলিম]

(২) আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لا تسافر المرأة ثلاثة الا و معها ذو محرم –(متفق عليه)

"মাহরাম সংগী ছাড়া কোনো মহিলা তিনদিনের পথ সফর করবে না।" [বুখারী, মুসলিম]

(৩) আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

نهى ان تسافر المرأة ثلاثة الا و معها ذو محرم -

"মহিলাদেরকে মাহরাম সংগী ছাড়া তিন দিনের পথ সফর করতে নিষেধ করেছেন।" [মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ]

(৪) আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لا يحل لا مرأة تسافر مسيرة يوم و ليلة الا مع ذى محرم عليها – (متفق عليه)

www.bjilibrary.com

"কোনো মহিলার জন্যে মাহ্‌রাম সাথী ছাড়া একদিন এক রাতের পথ সফর করা বৈধ নয়।" [বুখারী, মুসলিম]

অপর একটি বর্ণানায় বলা হয়েছে ঃ 'একদিনের পথ সফর করা বৈধ নয়' আরেকটি বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে ঃ 'একরাতের পথ সফর করা বৈধ নয়।' অন্য একটি বর্ণনার ভাষা এরূপ ঃ

لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة ايام الا مع ذى محرم –

"কোনো মহিলা তিনদিনের পথ সফর করবে না, তবে কোনো মাহ্‌রামের সাথে করলে ভিন্ন কথা।" এ তিনটি বর্ণনাই মুসনাদে আহমদে উল্লেখ আছে।

এ সম্পর্কে সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত একটি হাদীসের ভাষা হলো ঃ (لا تسافر بريدًا) "(মাহ্‌রাম সাথী ছাড়া) কোনো মহিলা অর্ধদিনের সফরও করবেনা।"

তিনদিন বলতে উটের পিঠে করে তিনদিনের সফর বুঝানো হয়েছে এবং উটের মধ্যম ধরনের চলার ভিত্তিতে তিনদিন ধরা হয়েছে। আলিমদের মতে এভাবে তিনদিনে প্রায় পঁচাশি কিলোমিটার পথ চলা যায়। হাদীসে এ পরিমাণ পথ অতিক্রমের কথাই বলা হয়েছে। মটর গাড়ী, রেলগাড়ী, নৌজাহাজ, উড়োজাহাজ প্রভৃতি যেকোনো ধরনের যানবাহনেই সফর করা হোক না কেন কোনো মহিলার এই পরিমাণ (পঁচাশি কিলোমিটার) পথ অতিক্রম করতে হলে তার সাথে মাহ্‌রাম পুরুষ থাকতে হবে।

দিন প্রসংগে হাদীসে মতভেদের কারণ

কতদিনের সফর হলে মহিলাদের সাথে স্বামী বা মাহ্‌রাম পুরুষ থাকতে হবে, সে ব্যাপারে হাদীসে যে মতভেদ দেখা যায়, তার কারণ কয়েকটি। একটি কারণ হলো, প্রশ্নকারীর অবস্থা। অর্থাৎ প্রশ্নকারীর অবস্থা ভেদে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন রকম নির্দেশ দিয়েছেন। যুবতীদের জন্যে এবং বৃদ্ধাদের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন জবাব দিয়ে থাকতে পারেন।

পথের পরিবেশের ভিত্তিতে বিভিন্ন রকম জবাব দিয়ে থাকতে পারেন। হয়তো নিরাপদ পথের ক্ষেত্রে এ রকম জবাব দিয়েছেন আবার যেসব পথে ফিতনার আশংকা আছে সেসব পথের ক্ষেত্রে অন্য রকম জবাব দিয়েছেন।

www.bjilibrary.com

তাছাড়া যেসব হাদীসে তিনদিনের পথ মহিলাদেরকে একাকী সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেসব হাদীসে কিন্তু এক বা অর্ধদিনের পথ একাকী সফর করা বৈধ, এমন কথাও বলা হয়নি।

ইমাম বায়হাকী লিখেছেন, মনে হচ্ছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, মাহরামের সাথে ছাড়া মহিলারা তিনদিনের সফর করতে পারে কি ? এর জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ না পারেনা।

আবার অন্য সময় অপর কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করেছিল যে, মহিলারা মাহরামের সাথে ছাড়া দুইদিনের পথ সফর করতে পারে কি ? জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ না ।

এভাবে হয়তো কেউ একদিনের ব্যাপারেও জানতে চেয়ে থাকতে পারে আর তার জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ না।

অর্ধদিনের ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করা হয়ে থাকতে পারে এবং তিনি তার জবাবেও 'না' সূচক জবাব দিয়ে থাকতে পারেন।

এভাবে প্রত্যেক প্রশ্নকারী যে জবাব পেয়েছেন, তিনি তা অন্যদের কাছে বর্ণনা করেছেন। হাদীসের বর্ণনায় দিন ও দূরত্বের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা মূলত স্থান কাল পাত্র ভেদেই বলেছিলেন। এ প্রসংগে বর্ণিত সবগুলো হাদীসই সহীহ্। এর কোনো একটিতেও সর্বনিম্ন মুদ্দতের সীমারেখা বেঁধে দেয়া হয়নি। মূলত সফরের মুদ্দত নির্ধারণ করে দেয়া নবী করীমের উদ্দেশ্য ছিলনা।

সুতরাং হাদীসগুলোর সারকথা হলো, যতোদূর পথ ভ্রমণ করলে সেই ভ্রমণকে 'সফর' বলা যেতে পারে সেই পরিমাণ পথ মহিলাদের জন্যে স্বামী বা মাহরাম পুরুষের সাথে ছাড়া ভ্রমণ করা নিষেধ। সেই পরিমাণ পথ ভ্রমণ করতে তিনদিন, দুইদিন, একদিন বা অর্ধদিন লাগুক, তাতে কিছু যায় আসে না। এমনকি সময় এবং দূরত্ব যাই-ই হোক না কেন মহিলাদের জন্যে সকল অবস্থায় মাহরাম পুরুষ বা স্বামীর সাথে ছাড়া সফর করা নিষেধ। একথার দলিল হলো ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এই হাদীস যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لا تسافر امرأة الا مع ذى محرم

"মাহরামের সাথে ছাড়া কোনো মহিলা যেনো সফর না করে।"

www.bjilibrary.com

এ হাদীসের সময় বা দূরত্বের কোনো সীমারেখার কথা উল্লেখ নাই। বরঞ্চ এখানে মহিলাদেরকে একাকী এবং মাহ্‌রামের সাথে ছাড়া সফর করতেই নিষেধ করা হয়েছে। এ হাদীসটি মুসলিম শরীফে এ সংক্রান্ত অন্য সবগুলো হাদীসের শেষে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং এতে মাহ্‌রামের সাথে ছাড়া এমন সকল ভ্রমণই নিষেধ করা হয়েছে, যে ভ্রমণকে সফর বলে আখ্যায়িত করা যায়।

স্বামী বা মাহ্‌রাম সফরসংগী আবশ্যক হবার ব্যাপারে মতভেদ

ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীসগুলো থেকে একথা পরিষ্কার জানা যায় যে, মহিলাদের জন্যে মাহ্‌রাম সংগী ছাড়া সফর করা নিষেধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ প্রসংগে ফকীহদের মাঝে মতভেদ দেখা যায়। আসলে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে উদ্ধৃত হাদীসগুলোর তাৎপর্য নির্ণয় করতে গিয়ে। মতভেদসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা গেলো ঃ

* **হানাফী মযহাব ঃ** হানাফীদের মতে এ শর্তটি (অর্থাৎ মাহ্‌রাম সংগী থাকা) তিনদিন বা তিনদিনের চাইতে অধিক দূরত্বের পথ সফর করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা যেসব হাদীসে তিন সংখ্যাটি উল্লেখ হয়েছে, সেগুলোর অর্থ ও তাৎপর্য সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট। এ প্রসংগে বর্ণিত অপরাপর হাদীসগুলোর তাৎপর্য অস্পষ্ট। সুতরাং সুস্পষ্ট তাৎপর্যের অধিকারী হাদীস দিয়েই দলিল গ্রহণ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, হানাফীদের মতে, মহিলারা তিনদিনের দূরত্বের পথ কেবল স্বামী বা মাহ্‌রাম আত্মীয়ের সাথেই সফর করতে পারে, অপর কারো সাথে করতে পারেনা। যেমন, অপর একজন বা একাধিক মহিলার সাথে কিংবা নির্ভরযোগ্য সাথীদের সফর করা জায়েয নয়। কেননা হাদীসে স্বামী বা মাহ্‌রাম পুরুষের শর্ত আরোপিত হয়েছে।

হাম্বলী মযহাব ঃ হাম্বলীদের মতে, কোনো মহিলার মাহ্‌রাম পুরুষ বর্তমান না থাকলে তার উপর হজ্জ ফরয হয়না। তাদের মতে কোন মহিলার জন্যে অপর কোনো মহিলা বা মহিলাদের সাথে কিংবা নির্ভরযোগ্য সাথীদের সাথে হজ্জের সফরে যাত্রা করা জায়েয নয়। এ প্রসংগে তাদের যুক্তির ভিত্তি

www.bjilibrary.com

হলো ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত একটি হাদীস। তাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لا تحجن امرأة الا ومعها ذو محرم -(دارقطني)

"মাহরাম সংগী ছাড়া কোনো মহিলা যেনো হজ্জ না করে।" [দারু কুতনী]

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল লিখেছেন, হজ্জের সফরে যাত্রা করার পর কোনো মহিলার মাহরাম সাথী যদি মৃত্যুবরণ করে আর এ সময় যদি সে নিজ আবাস থেকে অনেক দূর পথ চলে গিয়ে থাকে, তবে ফিরে না এসে সে একা একাই হজ্জ করবে। কেননা এমতাবস্থায় ফিরে এলেও তো তাকে সফরই করতে হবে। সুতরাং তার জন্যে হজ্জ করে ফেরাই উত্তম। তবে শর্ত হলো এটা ফরয হজ্জ হতে হবে। কিন্তু নফল হজ্জ হয়ে থাকলে মাহরাম সাথী বিহীন হজ্জের সফর করার চাইতে নিকটবর্তী কোনো জনবসতীতে অবস্থান করাই তার জন্যে উত্তম। তবে শর্ত হলো অবস্থান করা সম্ভব ও নিরাপদ হতে হবে।

কিন্তু ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের আরেকটি মতও বর্ণিত হয়েছে। তাতে তিনি বলেন, হজ্জের সফরে মহিলাদের সাথে স্বামী বা মাহরাম সাথী থাকা শর্ত নয়। অর্থাৎ সে নির্ভরযোগ্য অন্যান্য মহিলাদের সাথে সফর করতে পারে।[১]

* ইমাম নখয়ী, ইমাম হাসান বসরী, ইমাম সুফিয়ান সওরী, ইমাম ইস-হাক এবং ইমাম আবু হানীফার সাথীদের মতে, কোনো মহিলার মাহরাম সফর সংগী থাকা তার 'হজ্জ করার সামর্থের' অন্তরভুক্ত। সুতরাং ইনাদের সকলের মতে, কোনো মহিলার জন্যে অপর কোনো মহিলার সাথে কিংবা নির্ভরযোগ্য সাথীদের সংগে হজ্জের সফরে যাত্রা করার অনুমতি নেই।

* শাফেয়ী মযহাব ঃ শাফেয়ীদের মতে মহিলাদের হজ্জ করার জন্যে সাথে মাহরাম পুরুষ থাকা কোনো অবস্থাতেই শর্ত নয়। একজন মহিলা নির্ভরযোগ্য অপর কোনো স্বাধীন মুসলিম মহিলার সাথে হজ্জে যেতে পারে।

সুতরাং শাফেয়ীদের মতে, কোনো মহিলা হজ্জ করবার জন্যে স্বামী বা মাহরাম সফর সংগী না পেলে অপর কোনো নির্ভরযোগ্য মহিলা বা মহিলাদলের সাথে হজ্জ যাত্রা করতে পারে। এমনটি করা জায়েয। তবে এ

১. শাইখ হাসনাইন মাখলুক ঃ ফাতাওয়া শরয়ীয়া।

www.bjilibrary.com

ক্ষেত্রে তার ইযযত আবরু ও নিরাপত্তার ব্যাপারে তাকে পূর্ণ নিশ্চিত হতে হবে।—এটাই ইমাম শাফেয়ীর মত। তবে তাঁর মতে এ অনুমতি কেবল ফরয হজ্জের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। নফল হজ্জের ক্ষেত্রে স্বামী বা মাহ্‌রাম সাথী ছাড়া যাত্রা করবার অনুমতি নেই। শাফেয়ী মযহাবে এ মতটিকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

ইমাম নববী সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আতা, সায়ীদ ইবনে জুবায়ের, ইবনে সীরীন, মালিক ইবনে আনাস এবং আওযায়ীর মতে মহিলাদের হজ্জের সফরে মাহ্‌রাম সংগী থাকা শর্ত নয়। ইমাম শাফেয়ীরও একটি প্রসিদ্ধ মত এরূপ। এঁদের মতে বরং শর্ত হলো, ঐ মহিলার নিজের ইযযত আবরুর হিফাযত ও নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া।

ইমাম নববী আরো লিখেছেন যে, আমাদের (অর্থাৎ শাফেয়ীদের) কোনো আলিম বলেছেন, মহিলা কোনো কাফেলার সাথে অর্থাৎ হজ্জ যাত্রীদের সাথে হজ্জে যাত্রা করতে পারে। তবে শর্ত হলো তার নিরাপত্তার ব্যাপারে তাকে নিশ্চিত হতে হবে।

মালিকী মযহাব : মালিকীদের মতে, মহিলা নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত সাথীদের সাথে হজ্জে গমন করতে পারে যদি তার আবাস এবং মক্কার মাঝে একদিন রাতের দূরত্ব হয়। ইমাম মালিক বলেছেন, মহিলা মহিলাদের জামাতের সাথে হজ্জে যেতে পারে।

কোনো মহিলা যদি উপরোল্লিখিত সুযোগগুলো না পায়, তবে তার উপর হজ্জ করা ফরয নয়। আলিমগণ এ শর্তও আরোপ করেছেন যে, পথ যদি দীর্ঘ হয় তবে যানবাহনের ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। সুতরাং কোনো মহিলার জন্যে যদি পায়ে হাঁটা কষ্টকর হয় এবং যানবাহনের ব্যবস্থাও না হয়, তবে তার উপর হজ্জ ফরয নয়।

এমনি করে যদি ছোট নৌযানে করে সফর করতে হয় আর তাতে স্থানের সংকীর্ণতার কারণে পর্দা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা যদি পূর্ণ নিশ্চিত না হয়, তবে এমতাবস্থায় মহিলাদের উপর হজ্জ ফরয হয়না।

কিন্তু নৌযান যদি বড় হয় এবং তাতে মহিলাদের অবস্থানের জন্যে নিরাপদ পৃথক স্থান থেকে থাকে, তবে কোনো মহিলা যদি এমতাবস্থায় তাতে

www.bjilibrary.com

সফর করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন, তবে এ সফর করাটা তার জন্যে আবশ্যক হয়ে পড়বে এবং হজ্জের ফরযিয়াত তার থেকে রহিত হবেনা।

হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী কারাবীনীর সূত্রে লিখেছেন যে, ইমাম মালিকের একটি মত হলো, পথ নিরাপদ হলে মহিলা একা একাও হজ্জ যাত্রা করতে পারে। তবে শর্ত হলো সেই হজ্জ বা উমরা ফরয বা ওয়াজিব হতে হবে, নফল নয়।

ইমাম ইবনে হাযম লিখেছেন, হজ্জের সফরের জন্যে মহিলাদের সাথে স্বামী বা মাহরাম ওয়াজিব নয়। সুতরাং কোনো মহিলা যদি স্বামী বা মাহরাম সংগী না পায়, তবে তিনি একাই হজ্জ যাত্রা করতে পারেন। এতে তার কোনো গুনাহ হবেনা।

বৃদ্ধাদের হজ্জ যাত্রা

কোনো কোনো ফকীহ যুবতী এবং বৃদ্ধাদের হজ্জ যাত্রার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তারা যুবতীদের জন্যে হজ্জের সফরে স্বামী বা মাহরাম সংগী থাকার শর্তারোপ করেছেন, বৃদ্ধাদের জন্যে এ শর্তারোপ করেননি।

হানাফী আলিমদের অধিকাংশের মতে এ প্রসংগে বৃদ্ধা এবং যুবতীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

সুবুলুসসালাম গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বৃদ্ধাদের জন্যে মাহরাম সাথী ছাড়া সফর করা জায়েয। কারণ বৃদ্ধাদের মধ্যে সাধরণত কোনো আকর্ষণ থাকেনা। তাই বৃদ্ধা তার স্বামী এবং মাহরাম ছাড়াও যেভাবে ইচ্ছা সফর করতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ আলিম এ যুক্তি খন্ডন করে দিয়েছেন এবং এ মত অস্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে, নারী বৃদ্ধা হলেও তার প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থেকে যায়। তারা আরো বলেন, 'প্রতিটি পতিত জিনিসই তুলে নেবার লোক আছে।'

ইমাম মালিকেরও মত এটাই যে, বৃদ্ধারা স্বামী এবং মাহরাম সাথী ছাড়াই সবধরনের সফর করতে পারে।

ইবনে দাকীকুল ঈদও বলেছেন, বৃদ্ধারা স্বামী এবং মাহরাম ছাড়াই হজ্জ যাত্রা করতে পারে। তাঁর যুক্তি হলো, হাদীসের নিষেধাজ্ঞা একটা সাধারণ হুকুম এবং এই সাধারণ হুকুম দেয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে।

www.bjilibrary.com

অর্থাৎ মুলত ফিতনা সৃষ্টি হবার আশংকাকে সামনে রেখেই এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং কারো ক্ষেত্রে যদি ফিতনা সৃষ্টি হবার আশংকা না থাকে, সে এই হুকুমের বাইরে থাকবে।

ইমাম মালিক তাঁর মতের স্বপক্ষে আবু দাউদে বর্ণিত এই হাদীসটিকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন: (لا صرورة في الاسلام) তাঁর মতে হাদীসের 'সরুরাতুন' শব্দের অর্থ হলো সেই নারী যে মাহরাম সাথীর অভাবে হজ্জ করতে পারছেনা। সুতরাং হাদীসটির অর্থ হলো, কোনো মহিলার জন্যে মাহরাম সাথী না পাবার কারণে হজ্জ যাত্রা থেকে বিরত থাকা জায়েয নয়। বরং তার উচিত কোনো মহিলা দলের সাথে হজ্জ যাত্রা করা।

আল মুনযেরী লিখেছেন, এই হাদীসটির সূত্রে উমর ইবনে আবীল খাওয়ার নামে একজন বর্ণনাকারী আছেন, হাদীসের কয়েকজন ইমাম তাকে দুর্বল বলেছেন।

নফল হজ্জের সফর

ইমাম নববী লিখেছেন, মহিলারা নফল হজ্জ, যিয়ারত, ব্যবসা প্রভৃতি গায়রে ওয়াজিব (ওয়াজিব নয় এমন) সফরে মাহরাম ছাড়া যাত্রা করতে পারবে কিনা, সে ব্যাপারে আমাদের (অর্থাৎ শাফেয়ীদের) আলিমদের মাঝে মতভেদ আছে।

কারো কারো মতে ফরয হজ্জে যাত্রা করতে যেমন বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য মহিলাদের দলভুক্ত হয়ে সফর করা জায়েয, ঠিক তেমনি নফল হজ্জ, যিয়ারত এবং ব্যবসায়িক কাজেও বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মহিলাদের সাথে সফর করা জায়েয। কিন্তু অধিকাংশ আলিমের মতে নফল হজ্জ, যিয়ারত, ব্যবসা প্রভৃতির সফরে মহিলাদের দলের সাথে যাত্রা করা জায়েয নয়, এসব সফরেও মাহরামের সাথেই যাত্রা করতে হবে।

যেসব লোক বিশ্বস্ত সাথী এবং নিরাপদ পথ হলে স্বামী এবং মাহরাম ছাড়া মহিলাদের সফর করা জায়েয মনে করেন, তারা নিজেদের বক্তব্যের সপক্ষে নিম্নোক্ত দলিল প্রমাণ পেশ করেন:

(১) আদী ইবনে হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁর নিকট নিজের ক্ষুধার্ত হবার কথা

জানালো। এরপর আরেক ব্যক্তি এসে রাস্তা ঘাটে চোর ডাকাতের উপদ্রবের কথা জানালো। এ অভিযোগ শুনে রাসূলুল্লাহ বললেন : (يا عدى هل رأيت الحيرة ؟) "হে আদী, তুমি কি কখনো হীরা[১] দেখেছো ?" আদী বলেন, তখন আমি বললাম : 'হীরা নামক অঞ্চলটি আমি দেখিনি বটে, তবে সেখানকার সম্পর্কে আমি অনেক কিছু জানি।' এরপর রাসূলুল্লাহ বললেন :

فان طالت بك الحياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة ولا تخاف الا الله –

"তোমার জীবনকাল যদি দীর্ঘ হয়, তবে তুমি অবশ্যি দেখতে পাবে, হীরা অঞ্চল থেকে একজন মহিলা একাকী হাওদায় বসে এসে কা'বা তাওয়াফ করবে এবং সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয় পাবে না।" [সহীহ বুখারী]

একথাটিই অপর একটি হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

تؤم البيت لا جوار معها

"সে মহিলা আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করার নিয়তে একাকী আসবে, তার সাথে অন্য কেউই থাকবে না।"

এ হাদীস থেকে আলিমগণ এ যুক্তি গ্রহণ করেছেন যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে আল্লাহর যমীনে কী রকম শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করবে তার উদাহরণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসে দিয়েছেন যে, তখন হীরা শহর থেকে কোনো মহিলা উটে চড়ে একা একা মক্কায় এসে হজ্জ ও তাওয়াফ করবে, কিন্তু তার নিরাপত্তার কোনো বিঘ্ন ঘটবে না।

সুতরাং এ হাদীসে তিনি একথাও বলেছেন যে নিরাপত্তার অসুবিধা না হলে মহিলারা একা একা হজ্জের সফরে যাত্রা করতে পারে।

(২) আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا

---

১. হীরা কুফার নিকটবর্তী একটি অঞ্চল।

www.bjilibrary.com

"মানুষের উপর আল্লাহর এই অধিকার রয়েছে যে, তাদের মধ্যে যে-ই তাঁর ঘর পর্যন্ত পৌঁছুতে সক্ষম হবে, সে হজ্জ পালন করবে।"

[সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৭]

এ আয়াতের 'মানুষ' শব্দটি পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। 'পৌঁছুতে সক্ষম হওয়া' মানে যানবাহন (বা যানবাহনের ভাড়া) এবং অন্যান্য পাথেয় তথা খরচপত্র সংগ্রহ করতে সক্ষম হওয়া। সুতরাং কোনো মহিলা যদি এ জিনিসগুলো সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়, তবে তার উপর হজ্জ যাত্রা করা ফরয। আর হাদীসে যে স্বামী বা মাহরাম সাথে থাকার কথা বলা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য ফিতনা থেকে রক্ষা পাওয়া। কোনো মহিলাদলের বা বিশ্বস্ত সাথীদের সংগে যাত্রা করলেই এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়।

ভিন্ন মতের আলিমগণ এ দলিলের জবাবে বলেছেন, এ আয়াতটির হুকুম মহিলাদের উপর ততোক্ষণ পর্যন্ত বর্তায় না, যতোক্ষণ না তারা স্বামী বা মাহরাম সংগী পাবে। কেননা স্বামী বা মাহরাম সাথী থাকাটা তাদের সামর্থের অন্তর্ভুক্ত।

(৩) স্বামী বা মাহরাম ছাড়া মহিলাদের হজ্জে যাওয়া বৈধ হবার পক্ষে এই দলিলও পেশ করা হয় যে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত আমলে রাসূলুল্লাহর পবিত্র স্ত্রীগণ তাঁর কাছে হজ্জে যাবার অনুমতি চান। এটা ছিলো তাদের সর্বশেষ হজ্জ। খলীফা তাঁদের অনুমতি প্রদান করেন এবং উসমান ও আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে তাঁদের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। হযরত উসমান লোকদের সতর্ক করতে থাকতেন, সাবধান! কেউ উম্মুল মু'মিনীনগণের নিকটে আসবেনা এবং কেউ তাঁদের দিকে তাকাবেনা। তাঁরা হজ্জে যাত্রা করেন উটের পিঠে আরোহণ করে। উটের পিঠে হাওদা লাগানো ছিলো। এটা ছিলো তাঁদের নফল হজ্জ। কারণ ইতিপূর্বে যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা ছাড়া তাঁরা সকলেই রাসূলুল্লাহর সাথে ফরয হজ্জ সেরে নিয়েছিলেন।

ভিন্ন মতের আলিমগণ এ দলিলটি এভাবে খন্ডন করেছেন যে, হযরত উসমান এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ নবীর স্ত্রীগণের জন্যে মাহরাম ছিলেন। কেননা তাঁরা তো মু'মিনদের জন্যে হারাম ছিলেন এবং মু'মিনদের মা ছিলেন।

www.bjilibrary.com

(৪) নির্ভরযোগ্য সাথী যোগাড় হওয়া এবং পথ নিরাপদ হবার শর্তে ইবনে হাযম স্বামী ও মাহরাম ছাড়া মহিলাদের হজ্জ যাত্রা জায়েয মনে করেন। তিনি তাঁর মতের পক্ষে নিম্নোক্ত হাদীসটিকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন যে, জনৈক সাহাবী যুদ্ধে যাবার জন্যে নিজের নাম লেখান। কিন্তু তিনি যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানান যে, তার স্ত্রী একা একা হজ্জ যাত্রা করেছে, তখন তিনি তাকে স্ত্রীর সাথে হজ্জ যাত্রা করতে বলেন। তিনি লোকটিকে স্ত্রীর সাথে হজ্জ যাত্রা করতে বলেছিলেন বটে, কিন্তু তার স্ত্রীর একা একা যাত্রা করাটাকে অপসন্দ করেননি। শুধু বলেছেন যে ঃ فانطلق فحج مع امرأتك 'যাও, তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে গিয়ে হজ্জ করো।'

ভিন্ন মতের আলিমগণ এর জবাবে বলেছেন যে, স্বামী বা মাহরাম সাথী বিহীন সফর করা যদি মহিলাদের জন্যে শর্তই না হতো, তাহলে নবী করীম (সা) মহিলাটির স্বামীকে তার সাথে হজ্জে যাবার নির্দেশ দিতেননা। তিনি তো জিহাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকেই স্ত্রীর সাথী হবার জন্যে ছুটি দিয়ে দিলেন।

(৫) ইমাম শাফেয়ী তাঁর 'আল উম্ম' গ্রন্থে লিখেছেন যে, এ প্রসংগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলে বুঝা যায়, 'সক্ষম হওয়া' দ্বারা সফরের পাথেয় এবং যানবাহন সংগ্রহ হওয়া বুঝায়। কোনো মহিলার যদি এ দুটির ব্যবস্থা হয়ে যায় আর পথ যদি নিরাপদ হয় এবং নির্ভরযোগ্য মহিলা দলের সাথী হবার ব্যবস্থা হয় , তবে আমার মতে সেই মহিলার উপর হজ্জ করা ফরয, এমনকি তার সাথে কোনো মাহরাম সাথী না থাকলেও। তবে আল্লাহই সর্বাধিক জানেন। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো হজ্জ ফরয হওয়া থেকে কেবল ঐ ব্যক্তিকেই বাদ দিয়েছেন যার সফরের পাথেয় এবং যানবাহনের ব্যবস্থা হবে না।

তবে সাথে যাবার জন্যে বিশ্বস্ত স্বাধীন মুসলিম মহিলা বা মহিলা দল যদি না পাওয়া যায়, তবে এমন পুরুষদের সাথী হয়ে যেনো কোনো মহিলা হজ্জ যাত্রা না করে যাদের সাথে কোনো মহিলা নেই এবং যাদের মধ্যকার কোনো পুরুষও তার মাহরাম নয়।

www.bjilibrary.com

ইমাম শাফেয়ী তাঁর 'আল উম্ম' গ্রন্থে আরো লিখেছেন যে, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা, আবদুল্লাহ ইবনে উমর এবং আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও এমন হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যাতে আমাদের এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় যে, মাহরাম সাথী পাওয়া না গেলেও মহিলারা অন্যান্য বিশ্বস্ত মহিলাদের সাথে হজ্জ গমন করতে পারে। মুসলিম ইবনে জুরাইজ আমাকে বলেছেন যে, আতা রাহেমাহুল্লাহর নিকট জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোনো মহিলার সাথে যদি স্বামী বা মাহরাম সংগী না থাকে, কিন্তু চাকর ছেলে এবং চাকরানীগণ থাকে, যারা হজ্জের সফরে তার চলা ফেরা, পানাহার, বাহনে আরোহণ ও নামা এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে, তবে সে মহিলা কি হজ্জ যাত্রা করতে পারে? জবাবে আতা বলেছেন ঃ 'হ্যাঁ, তার হজ্জ করা উচিত।'

উদ্ধৃত মতামতের সারকথা

মহিলাদের হজ্জের সফরে যাবার ব্যাপারে এ যাবত যেসব মতামত আলোচিত হলো, সেগুলোর সারকথা হলো, একজন মহিলা হজ্জ করার জন্যে যাত্রা করতে পারে ঃ

১. তার স্বামী অথবা কোনো মাহরাম আত্মীয়ের সাথে,

২. স্বামী বা মাহরাম আত্মীয় সংগী পাওয়া না গেলে নির্ভরযোগ্য মহিলাদের দলের সাথে যাত্রা করতে পারে,

৩. কোনো মহিলা হজ্জ যাত্রীদল পাওয়া না গেলে একজন বিশ্বস্ত মহিলার সংগে যাত্রা করতে পারে,

৪. যদি একজন বিশ্বস্ত মহিলা সাথীও না পায়, তবে সে ক্ষেত্রে এমন বিশ্বস্ত পুরুষদের সাথে যাত্রা করতে পারে, যাদের বর্তমানে নিরাপত্তালাভের ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিত হবে।

৫. কিছু কিছু উলামার মতে, কেবল নিরাপদ পথ এবং এমন সাথীরা বর্তমান থাকাই যথেষ্ট, যাদের সাথে যাত্রা করলে নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটার আশংকা নেই। এঁদের মতে, নফল হজ্জ, যিয়ারত এবং ব্যবসায়িক সফরেও এভাবে যাত্রা করা যায়।

তবে, প্রথম মতটির উপর আমল করাই উত্তম।

www.bjilibrary.com

সারকথা হলো, সফরকালে মহিলার ইযযত আবরুসহ সার্বিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকলেই কেবল তার জন্যে যাত্রা করা জায়েয, নতুবা জায়েয নয়। এ ক্ষেত্রে পথ দীর্ঘ হোক কিংবা হ্রস্ব তাতে কিছু যায় আসেনা। আলিম ও ইমামগণের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে মূলত মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য নিরাপত্তাকে কেন্দ্র করেই। সুতরাং যে মতই গ্রহণ করুন না কেন, নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে হবে।

কেউ যদি মাহরাম সংগী ছাড়া হজ্জ করে ?

মহিলাদের হজ্জ সফরে স্বামী বা মাহরাম সংগী থাকাকে যারা শর্ত বলেছেন, তাদের মতে কোনো মহিলা যদি এ শর্ত লংঘন করে এবং স্বামী বা মাহরাম ছাড়াই হজ্জ পালন করে, তবে তার ব্যাপারে বিধান কি ?

এর জবাব হলো, তাদের হজ্জ হয়ে যাবে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া সুবুলুস সালাম গ্রন্থে লিখেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি সামর্থ না থাকা সত্ত্বেও এবং কোনো মহিলা যদি মাহরাম সাথী ছাড়াই হজ্জ করে, তবে এদের দু'জনেরই হজ্জ শুদ্ধ হবে।

এর ব্যাখ্যা হলো, সামর্থ ও সক্ষমতা না থাকার কারণে যার উপর হজ্জ ফরয হয়নি, যেমন রুগ্ন ব্যক্তি, সহায় সম্বলহীন ব্যক্তি, কিংবা সে ব্যক্তি চোর ডাকাত হাইজ্যাকারের ভয়ে যার পথ নিরাপদ নয়, অথবা সেই মহিলা হজ্জে গমন করার জন্যে যার স্বামী বা মাহরাম না থাকে, এদের কেউ যে কোনো ভাবেই যদি মক্কায় পৌঁছে হজ্জ করে নেয়, তবে তার হজ্জ সহীহ হবে।

এদের কেউ যদি এমতাবস্থায় পায়ে হেঁটে কষ্ট করে মক্কায় পৌঁছে তবে তার সওয়াব বেশী হবে আর অপর কেউ যদি ভিক্ষা করে করে মক্কায় পৌঁছে তবে তার গুনাহ হবে। এগুলো ভিন্ন কথা। হজ্জ সহীহ হবার সাথে এগুলো সম্পর্কিত নয়।

একইভাবে কোনো মহিলা যদি মাহরাম ছাড়াই মক্কায় পৌঁছে, তবে এ কাজের জন্যে তার গুনাহ হতে পারে, কিন্তু তার হজ্জ সহীহ শুদ্ধ হবে। গুনাহ হয়ে থাকলে সেটা সফরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, হজ্জ করার জন্যে নয়।

আল মুগনী গ্রন্থে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি সামর্থ না থাকা সত্ত্বেও অধিক কষ্ট করে যানবাহন এবং পাথেয় ছাড়াই হজ্জে যাত্রা করে, তার হজ্জ সহীহ হবে এবং অধিক কষ্ট করার জন্যে সওয়াব পাবে।

www.bjilibrary.com

মাহ্‌রাম কারা ?

একজন মহিলার মাহ্‌রাম তারাই, যাদের সাথে দেখা দেয়া, একান্তে বসা এবং ভ্রমণ করা জায়েয, যাদের ঐ মহিলার স্থায়ীভাবে বিবাহ নিষিদ্ধ হারাম। বিবাহের এই নিষেধাজ্ঞা কুরআন সুন্নাহর বিধানের ভিত্তিতে হতে হবে। ভক্তি-শ্রদ্ধা-স্নেহের ভিত্তিতে হলে হবেনা। মুখ ডাকা মা-বাপ, ভাইবোন হবার কারণে হলে হবেনা। শাস্তির কারণে হলে হবে না।[১]

স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম হওয়া মানে রক্ত সম্পর্ক, দুধ সম্পর্ক এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে হারাম হওয়া।

রক্ত সম্পর্কে হারাম হবার উদাহরণ হলো পিতা, পুত্র, ভাই, ভাতিজা, বোনপুত প্রভৃতি।

দুধ সম্পর্কে হারাম হবার উদাহরণ হলো দুধভাই, দুধভাইর ছেলে, দুধবোনের ছেলে প্রভৃতি।

আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে হারাম হবার উদাহরণ হলো স্বামীর পিতা বা স্বামীর পুত্র (অন্য স্ত্রীর গর্ভের)।

ভগ্নিপতি, খালু এবং ফুফা স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা বোন, খালা বা ফুফুকে তালাক দিলেই তাদের সাথে বিবাহ বৈধ হয়ে যায়। সুতরাং এরা মাহ্‌রাম নয়।

ইমাম মালিকের মত উপরোক্ত মতেরই অনুরূপ। তবে তিনি শুধু স্বামীর পুত্রের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে স্বামীর পুত্রের সাথে সফর করা মাকরূহ। তিনি মনে করেন, ইসলামের প্রথম যুগের পরে লোকদের মানসিকতায় বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তী কালে লোকেরা সৎমাকে অন্যান্য মাহরামের মতো সমভাবে দেখছেনা। তাছাড়া যেহেতু নারী পুরুষের মিশ্রণটাই ফিতানার আশংকা থেকে মুক্ত নয়, তাই রক্ত সম্পর্কের মহিলারা ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে ফিতনা সৃষ্টির আশংকা থেকে যায়।

কিন্তু ইমাম মালিকের এই দৃষ্টিভংগী কুরআন সুন্নাহর দলিল ভিত্তিক নয়। তবে আল্লাহই অধিক জানেন।

---

১. অর্থাৎ কোর্ট বা বিচারক যদি শাস্তি হিসেবে কোনো দুইজন নারী পুরুষের মাঝে বিবাহে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে থাকে।

www.bjilibrary.com

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল কাফির পিতাকেও মাহ্‌রামের তালিকা থেকে বাদ দিতে চান। তার মতে কাফির পিতা মুসলিম কন্যার মাহ্‌রাম নয়। কারণ, সে যে তার কন্যাকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নেবার এবং গুমরাহ করবার চেষ্টা করবেনা, সে ব্যাপারে তো নিশ্চিন্ত হওয়া যায়না। এ হিসেবে কোনো কাফির আত্মীয়ই মুসলিম নারীর মাহ্‌রাম হতে পারে না। কারণ তাদের সকলের ক্ষেত্রেই উপরোক্ত বিষয়ে নিশ্চিন্ত হবার কারণ পাওয়া যায়না।

মাহ্‌রাম সাথীর বুদ্ধিমান ও বালিগ হওয়া শর্ত

যে মাহ্‌রাম ব্যক্তি কোনো মহিলার সফর সংগী হবে তার বুদ্ধিমান হওয়া, বালিগ হওয়া এবং সুন্দরভাবে কার্যসম্পাদনে যোগ্য হওয়া শর্ত।

কারো মাহরাম যদি বালিগ হওয়া সত্ত্বেও নির্বোধ হয়ে থাকে এবং সুষ্ঠভাবে কার্যসম্পাদনে অযোগ্য হয়ে থাকে, তবে সে মহিলার সফর সাথী হবার যোগ্য নয়।

মাহ্‌রাম সাথীর সফর খরচ কে দেবে?

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, কোনো মহিলা হজ্জের সফরে সংগী হিসেবে যে মাহ্‌রামকে সাথে নিয়ে যাবে, তার খরচপত্রও সে মহিলাকেই বহন করতে হবে। এ মতের পক্ষে তাঁর যুক্তি হলো, যেহেতু মাহরামকে ঐ মহিলার সংগী হবার জন্যেই যেতে হচ্ছে, তাই তার খরচপত্রের দায়িত্বও ঐ মহিলাই বহন করবে। খরচপত্র দিয়ে কোনো মাহ্‌রামকে সাথে নেবার সামর্থ হলেই একজন মহিলাকে হজ্জ করার জন্যে সামর্থবান মনে করা হবে। কিন্তু কোনো মহিলা যদি মাহরামের খরচপত্র প্রদান করতে রাজি না হয় আর মাহ্‌রামও খরচপত্র না পেলে যেতে অসম্মত হয়, তবে এ মহিলার বিধান হলো সেইসব মহিলার মতো, মাহরাম সফর সংগী যোগাড় না হবার কারণে যে হজ্জ করার 'সামর্থবান' বলে গণ্য হয়না।

ইমাম ইবনে কুদামা তাঁর আল মুগনী গ্রন্থে লিখেছেন, কোনো মহিলা যদি তার মাহরামকে তার সাথে হজ্জের সফরে গমন করতে বলে, তবে সেই মাহরামের জন্যে এ আহবানে সাড়া দেয়া কি অপরিহার্য?

তিনি বলেন, এ সম্পর্কে দু'টি মত পাওয়া যায়। একটি মতে, সেই মাহরামের জন্যে এ আহবানে সাড়া দেয়া অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু আরেকটি মতে অবশ্য কর্তব্য নয়।

www.bjilibrary.com

ইবনে কুদামা বলেন, একথাই সঠিক যে, একজন মহিলার হজ্জের সফরে সংগী হবার আহবানে সাড়া দেয়া তার কোনো মাহরামের জন্যে অপরিহার্য হয়ে পড়েনা। কেননা হজ্জ সম্পাদন করা বিরাট কষ্টকর কাজ। একজনের জন্যে এ কষ্ট মেনে নেয়া আরেকজনের উপর অপরিহার্য হয়ে পড়েনা। কোনো মহিলা রোগগ্রস্ত হয়ে পড়লে তার পক্ষ থেকে বদলি হজ্জ করাও তার কোনো মাহরামের উপর অপরিহার্য নয়।

ইদ্দত পালনরত মহিলার হজ্জ

হজ্জের মাসগুলোতে যদি কোনো মহিলা তালাক প্রাপ্ত হন, কিংবা তার স্বামী যদি মৃত্যু বরণ করেন এবং এ কারণে এ সময় তিনি ইদ্দত পালনরত থাকেন, তবে কি তিনি হজ্জ যাত্রা করতে পারবেন? এর জবাব হলো, সে বছর তার হজ্জ যাত্রা না করাই উত্তম। কেননা, ইদ্দত পুর্ণ হওয়া পর্যন্ত তো আল্লাহ তা'আলা তাকে ঘরে অবস্থান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং একান্ত জরুরী কাজ ছাড়া তার ঘর থেকে বের হওয়া উচিত নয়। কোনো জরুরী কাজে বাইরে যাওয়া আবশ্যক হয়ে পড়লে যতোটা সম্ভব কম সময় বাইরে অবস্থান করা উচিত। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ -(الطلاق)

"(ইদ্দতকালে) তোমরা তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিও না আর তারা নিজেরাও যেনো বের হয়ে না যায়। তবে সুস্পষ্ট অশ্লীল কাজ করে থাকলে ভিন্ন কথা।" [সূরা তালাক ঃ ১]

তিন 'কুরু'তে ইদ্দত পূর্ণ হয়। তিন কুরু মানে তিন হায়েয অথবা হায়েযের মধ্যবর্তী তিনটি পবিত্রতা (তহুর)।

গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত পূর্ণ হয় প্রসবের মাধ্যমে।

যাদের এখনো মাসিক শুরু হয়নি এবং যাদের বয়স হবার কারণে মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের ইদ্দত তিন মাস।

—এই ইদ্দতকাল হলো সেইসব মহিলার জন্যে যারা তালাক প্রাপ্তা।

কিন্তু যে মহিলার স্বামী মারা গেছে এবং তিনি যদি গর্ভবতীও না হয়ে থাকেন, তবে তার ইদ্দতকাল চার মাস দশ দিন। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হলো ঃ

www.bjilibrary.com

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ
بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا - (البقرة - ٢٣٤)

"তোমাদের মাঝে যারা মরে যায় এবং তাদের স্ত্রীরা বেঁচে থাকে, তবে তারা নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন (বিবাহ থেকে) বিরত রাখবে।"
[সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৪]

এ চার মাস দশ দিন আসলে স্বামীর মৃত্যুতে তাদের শোক পালনের মুদ্দত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَلَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ -এর ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতবী লিখেছেন, স্বামী তার তালাকপ্রাপ্তাকে সেই ঘর থেকে বের করে দিতে পারেনা। স্ত্রী থাকা অবস্থায় যে ঘরে সে থাকতো। আর তালাকপ্রাপ্তারও সেই ঘর থেকে বের হয়ে যাবার অনুমতি নেই। তবে একান্ত জরুরী কোনো কাজে বের হতে পারে। সুতরাং বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হলে গুনাহগার হবে, তবে ইদ্দত নষ্ট হবেনা। সবধরনের তালাক প্রাপ্তার জন্যেই এ হুকুম প্রযোজ্য। তালাক রিজয়ী হোক, বায়েন হোক, কিংবা মোগাল্লাযা হোক তাতে কিছু যায় আসে না। সর্বাবস্থায়ই তার জন্যে ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়া নিষেধ। স্বামীর বংশধারা রক্ষার জন্যেই এ বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

তালাকের প্রকার ভেদ

তালাক দুই প্রকার ঃ ১. রিজয়ী তালাক ২. বায়েন/মুগাল্লাযা তালাক।

১. রিজয়ী তালাক মানে ফেরত যোগ্য তালাক। এরূপ তালাকের ক্ষেত্রে স্বামী ইচ্ছা করলে তালাক থেকে প্রত্যাবর্তন করতে পারে এবং স্ত্রীকে স্ত্রী হিসাবে রেখে দিতে পারে।

২. বায়েন এবং মুগাল্লাযা তালাক মানে সেই তৃতীয় তালাক যা প্রদান করলে স্বামী স্ত্রীর মাঝে পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে যায়।

* ইমাম আবু হানীফার মতে, যে মহিলাকে রিজয়ী তালাক দেয়া হয়েছে তার জন্যে সেই ঘরে অবস্থান করা আবশ্যক, তালাক প্রদান কালে যে ঘরে সে থাকতো। তার জন্যে ইদ্দত পূর্ণ হবার আগে সেই ঘর থেকে বের হওয়া জায়েয নয়, এমনকি স্বামী অনুমতি দিলেও নয়। তবে জরুরী কোনো প্রয়োজনে বাইরে যেতে পারে।

www.bjilibrary.com

* ইমাম শাফেয়ীর মতেও রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তার জন্যে দিনেও সেই ঘর থেকে বের হওয়া জায়েয নয়, রাতেও জায়েয নয়।

* ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতেও রিজয়ী তালাক প্রাপ্তার জন্যে দিন কিংবা রাত কোনো সময়ই ঘর থেকে বের হওয়া জায়েয নয়।

* ইমাম মালিকের মতে, রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা জরুরী প্রয়োজনে দিনের বেলায় ঘর থেকে বেরুতে পারে। কিন্তু রাত্রে ঘরে অবস্থান করা জরুরী।

* কোনো মহিলাকে যদি মুগাল্লাযা তালাক দেয়া হয়, অর্থাৎ দুই তালাকের পর তৃতীয় তালাকও যদি দিয়ে দেয়া হয়, তবে তার ঘর থেকে বের হবার ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফার মত হলো চরম প্রয়োজন ছাড়া তার জন্যে দিনেও বের হওয়া জায়েয নয় এবং রাতেও নয়। এমনকি স্বামী অনুমতি দিলেও জায়েয নয়।

ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল এবং মালিকের মতে দিনের বেলায় বেরুতে পারে, রাত্রে পারেনা।

* স্বামীর মৃত্যুর কারণে যে মহিলা ইদ্দত পালন করছে, ইমাম আবু হানীফার মতে, এরূপ মহিলা দিনের বেলায় ঘর থেকে বের হতে পারে, তবে রাত্রে বের হওয়া জায়েয নয়। এমত অধিকাংশ উলামারই।

ইদ্দত পালনরত মহিলার হজ্জে যাবার বিধান

আমাদের মতে, ইদ্দত পালনরত অবস্থায় কোনো মহিলার জন্যে হজ্জে যাত্রা করা উচিত নয়, সে ইদ্দত রিজয়ী তালাকের কারণে পালন করুক, অথবা বায়েন তালাকের কারণে করুক, কিংবা স্বামীর মৃত্যুর কারণে করুক, তাতে কিছু যায় আসেনা। কিন্তু বিষয়টির কয়েকটি দিক সম্পর্কে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ আছে। নিম্নে তাদের মতামত উল্লেখ করা হলো ঃ

হানাফী মযহাব ঃ হানাফীদের মতে, কোনো মহিলার হজ্জে যাওয়া জায়েয হবার জন্যে এটাও একটা শর্ত যে, ইদ্দত পালনের কারণে কোনো একটি স্থানে অবস্থান করা যেনো তার উপর ওয়াজিব না থাকে। সুতরাং কোনো মহিলা যদি তালাক কিংবা স্বামীর মৃত্যুর কারণে ইদ্দত পালনরত থাকেন, তবে তিনি হজ্জ যাত্রা করতে পারেননা।

* **মালিকী মযহাব ঃ** মালিকীদের মতেও স্বামীর মৃত্যু বা তালাকের কারণে কোনো মহিলা যে ঘরে ইদ্দত পালনরত থাকেন, তার জন্যে সেখানে

www.bjilibrary.com

অবস্থান করা ওয়াজিব। ইহরাম বাঁধা তার জন্যে জায়েয নয়। কারণ এমনটি করলে তো ইদ্দত পালনরত অবস্থায় ঘর থেকে তাকে বাইরে আসতে হবে, অথচ তার জন্যে সে ঘরে অবস্থান করা ওয়াজিব। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো মহিলা যদি ইদ্দত কালে ইহরাম বেঁধে হজ্জে গমন করে, তবে তার হজ্জ সহীহ হবে, কিন্তু ঐ অবস্থায় ঘর ত্যাগ করার জন্যে গুনাহগার হবে। ইহরাম বেঁধে ফেলার পর হজ্জের যাবতীয় নিয়ম পালন করা তার জন্যে আবশ্যক, ইদ্দত পালনের জন্যে ঘরে বসে থাকা ঠিক নয়।

* হাম্বলী মযহাব ঃ ইবনে কুদামা তাঁর 'আল মুগনী' গ্রন্থে লিখেছেন যে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে, কোনো মহিলা যদি স্বামীর মৃত্যুর কারণে ইদ্দত পালনরতা থাকেন, তবে তিনি যেনো হজ্জ যাত্রা না করেন। কিন্তু চূড়ান্ত তালাকের ইদ্দত পালনকালে মহিলারা হজ্জ যাত্রা করতে পারেন। কারণ, স্বামীর মৃত্যুতে যে ইদ্দত পালন করতে হয়, তাতে ঘরে অবস্থান করা ওয়াজিব, কিন্তু চূড়ান্ত তালাকের ইদ্দত পালনকালে ঘরে অবস্থান করা ওয়াজিব নয়।

* শাফেয়ী মযহাব ঃ ইমাম শাফেয়ীর 'আল উম্ম' গ্রন্থে লেখা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ (الطلاق - ١)

"তারা (তালাকপ্রাপ্তারা) যেনো ঘর থেকে বের না হয়, তবে সুস্পষ্ট অপরাধ করে থাকলে ভিন্ন কথা।" [সূরা তালাক ঃ ১]

এ আয়াত থেকে যুক্তি গ্রহণ করে কোনো কোনো আলিম বলেছেন, কোনো নারী যদি এমন অপরাধ করে, যার কারণে তার উপর হদ জারি করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, সে ক্ষেত্রে হদ কার্যকর করার জন্যে ইদ্দতকালে তার বাইরে যাওয়া তো অনিবার্য হয়ে পড়ে। ফলে এ আয়াতে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হক আদায় করা বা দায়িত্ব পালন করা যদি ওয়াজিব হয়ে পড়ে, তবে সে ক্ষেত্রে ইদ্দত পালনকালে বাইরে যাবার অনুমতি আছে। কিন্তু কোনো মহিলা যদি অসৎকাজের জন্যে ইদ্দতকালে ঘর থেকে বের হয়, তবে এটা বিরাট গুনাহের কাজ। ইদ্দত পালনকালে হক আদায় করা কিংবা দায়িত্ব পালন করা ওয়াজিব হলে মহিলারা ঘর থেকে বের হতে পারবে, এ ব্যাপারে সকল আলিমের মাঝে পূর্ণ ঐকমত্য রয়েছে। আর ইদ্দত পালন কালে মুখ

www.bjilibrary.com

খারাপ করার জন্যে মহিলাদেরকে যে ঘর থেকে বের করে দেয়া যায়, তার প্রমাণ হাদীসেই রয়েছে। যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা বিনতে কায়েসকে বের করে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সুতরাং কুরআন মজীদ, সুন্নাতে রাসূল ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা একথা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, ইদ্দতপালন কালে যদিও বিনা প্রয়োজনে মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়া নিষেধ, তাসত্ত্বেও অপরিহার্য প্রয়োজনীয় কাজ, যেসব কাজ বাদ দেয়া যেতে পারেনা, সেসব কাজে বের হতে নিষেধ করা যায়না।

হজ্জও অপরিহার্য প্রয়োজনীয় কাজ। সুতরাং কোনো মহিলা যদি আর্থিক ও শারীরিকভাবে সক্ষম হয় এবং সাথে যাবার জন্যে মাহ্‌রাম কিংবা বিশ্বস্ত মহিলা বা মহিলা দল পাওয়া যায়, তবে তাকে হজ্জ যাত্রা করা থেকে নিষেধ করা যেতে পারেনা।

পথিমধ্যে যদি মাহ্‌রামের মৃত্যু হয়?

কোনো মহিলা যদি স্বামী বা মাহ্‌রামের সাথে হজ্জ যাত্রা করে আর পথিমধ্যে যদি তার স্বামী বা মাহ্‌রামের মৃত্যু ঘটে, তাহলে সে মহিলা কী করবেন। তিনি হজ্জ সম্পন্ন করবেন নাকি বাড়ি ফিরে আসবেন এবং স্বামীর মৃত্যু জনিত ইদ্দত পালন করবেন?

শাফেয়ীদের মতে, স্বামী বা মাহ্‌রামের মৃত্যু যদি ইহ্‌রাম বাঁধার পরে ঘটে, তবে হজ্জ সমাপন করা আবশ্যক। তবে শর্ত হলো তাকে নিজের নিরাপদ হজ্জ সমাপন করার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে হবে। যে কোনো ধরনের ফিতনার আশংকা থেকে মুক্ত হতে হবে। শর্ত পূর্ণ হলে ইহ্‌রাম খোলা হারাম। কিন্তু যদি ফিতনার আশংকা থাকে তবে ইহ্‌রাম খুলে বাড়ি ফিরে আসা ওয়াজিব। তাছাড়া স্বামী বা মাহ্‌রাম যদি ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বেই মারা যায়, সে ক্ষেত্রেও ফিরে আসা ওয়াজিব।

ইমাম ইবনে কুদামা আল মুগনী গ্রন্থে লিখেছেন, কোনো মহিলার মাহ্‌রাম যদি মক্কা যাবার পথে মারা যায়, তবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মত হলো, অনেক দূর পথ অতিক্রম করে থাকলে যাত্রা অব্যাহত রাখবে এবং হজ্জ পালন করে নিবে। অর্থাৎ কোনো মহিলা যদি তার স্বামীর সাথে হজ্জে রওয়ানা করে থাকে আর ঘটনাক্রমে পথে তার স্বামীর মৃত্যু হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে যেখান থেকে রওয়ানা করেছিল, সে শহর যদি কাছাকাছি হয়ে থাকে,

www.bjilibrary.com

তবে মহিলাটির কর্তব্য হলো বাড়ি ফিরে আসা। কিন্তু নিজ শহর ত্যাগ করে যদি অনেক পথ অতিক্রম করে এসে থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্ত নেবার স্বাধীনতা রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে নির্ভরযোগ্য সাথীদের সংগে যাত্রা অব্যাহত রাখতে পারেন এবং হজ্জ সম্পাদন করতে পারেন। অথবা ইচ্ছা করলে নিকটবর্তী কোনো শহরে অবস্থান করে ইদ্দত পালন করতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো অবস্থান নিরাপদ হতে হবে এবং ফিতনা থেকে বাঁচার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

www.bjilibrary.com

৩১. ইহরাম বাঁধার সময় মহিলাদের করণীয়

যেহেতু হজ্জ একটি অতি বড় ইবাদত, তাই যিনিই হজ্জ উমরার জন্যে ইহরাম বাঁধার সিদ্ধান্ত নেবেন, তার জন্যে উত্তম হলো একাজকে গুরুত্ব দিয়ে ভালভাবে এর প্রস্তুতি সম্পন্ন করা।

তাই যিনি ইহরাম বাঁধার সিদ্ধান্ত নেবেন, তার কর্তব্য হলো হাত পায়ের নখ কেটে নেয়া, নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা, বগলের লোম পরিষ্কার করা এবং পুরুষ হয়ে থাকলে মোঁচও ছেঁটে নেয়া। তাছাড়া চুলও আঁচড়ে নেবে। সকল মযহাব অনুযায়ীই একাজগুলো মুস্তাহাব, হজ্জের রুকন বা ফরয কাজ নয়। এ কাজগুলো নারী পুরুষ সকলের জন্যে সমভাবে মুস্তাহাব।

গোসল করা

ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব। খারিজা ইবনে যায়েদ ইবনে সাবিত বলেন, আমার পিতা যায়েদ ইবনে সাবিত বলেছেন : "ইহরামের প্রস্তুতি নেবার কালে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সবার থেকে পৃথক হয়ে গোসল করতে দেখেছি।" (তিরমিযী)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, কেউ যখন ইহরাম বাঁধার এবং মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করার এরাদা করবে, তখন তার জন্যে গোসল করে নেয়া উত্তম।

—এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বাযযার, দারুকুতনী এবং হাকিম। তারা এটিকে সহীহ হাদীস বলেছেন।

অধিকাংশ ফকীহ বলেছেন, কেউ ইহরাম বাঁধার নিয়ত করলে তার জন্যে ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল করে নেয়া মুস্তাহাব। এ মত যারা দিয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম তাউস, ইবরাহীম নখয়ী, মালিক, শাফেয়ী এবং হানাফী ও হাম্বলী উলামায়ে কিরাম।

নুফাসা ও ঋতুবতীর জন্যেও গোসল মুস্তাহাব

কোনো মহিলা যদি নিফাস বা মাসিক চলাকালে হজ্জ বা উমরার জন্যে ইহরাম বাঁধার এরাদা করে, তবে তার জন্যে ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল করে নেয়া মুস্তাহাব। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শাজারা

www.bjilibrary.com

নামক স্থানে আসমা বিনতে উমায়েসের গর্ভ থেকে আবু বকরের পুত্র মুহাম্মদ ভূমিষ্ঠ হয়। ফলে তাঁর নিফাস আরম্ভ হয়ে যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরকে বলেন, (তোমার স্ত্রী) আসমাকে বলো, সে যেনো গোসল করে ইহরাম বেঁধে নেয়। [মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, বায়হাকী, দারমী]

ইমাম নববী হাদীসটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এই হাদীস দ্বারা নিফাস ও মাসিক চলাকালে মহিলাদের ইহরাম বাঁধা সঠিক বলে প্রমাণ হয়। হাদীসটি থেকে একথাও জানা যায় যে, নিফাস ও মাসিক চলাকালে ইহরাম বাঁধতে হলে গোসল করে নেয়া মুস্তাহাব।

ইমাম নববী আরো বলেন, এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, নুফাসা ও ঋতুবতীদেরকে ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল করে নিতে বলতে হবে। তবে শাফেয়ী, মালিক ও আবু হানীফাসহ অধিকাংশ আলিমের মতে এই গোসল মুস্তাহাব। কিন্তু হাসান বসরী ও যাহেরী মযহাবের মতে, এ গোসল ওয়াজিব। তাঁরা ওয়াজিবের পক্ষে এই হাদীসটিকেই দলিল হিসেবে পেশ করেন। তারা বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমাকে গোসল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন নিফাসের কারণে। সুতরাং এ নির্দেশ সাধারণ নয়, বরং নিফাসের সাথে সংশ্লিষ্ট। নিফাসের কারণেই তাকে বিশেষভাবে গোসল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

তাছাড়া মুসনাদে আহমদ, সুনানে আবু দাউদ ও জামে তিরমিযীতে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিফাস ও ঋতুবতী মহিলারা গোসল করে নিয়ে ইহরাম বাঁধবে এবং তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের যাবতীয় নিয়ম পালন করবে। পবিত্র হওয়া ছাড়া তারা বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারে না।

ইহরাম বাঁধার সময় কেউ যদি পানি না পায়, তবে সে কী করবে? তাইয়াম্মুম করে নিলে চলবে কি? —এ বিষয়ে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ আছে ঃ

* হানাফী এবং মালিকীদের মতে পানি পাওয়া না গেলে তাইয়াম্মুম করা মুস্তাহাব নয়। কারণ এ গোসলের উদ্দেশ্য হলো পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা আর তাইয়াম্মুম দ্বারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা লাভ করা যায় না। তাই গোসলের পরিবর্তে তাইয়াম্মুম করা ঠিক নয়।

www.bjilibrary.com

* শাফেয়ী এবং হাম্বলী মযহাবের আলিমগণ বলেন, তাইয়াম্মুম করা মুস্তাহাব। তাদের যুক্তি হলো তাইয়াম্মুম যেহেতু অযুর বিকল্প, তাই এ ক্ষেত্রেও পানির অভাবে তাইয়াম্মুম করা মুস্তাহাব হওয়া উচিত।

ইবনে কুদামা আল মুগনী গ্রন্থে লিখেছেন, এ গোসল সুন্নত। সুতরাং পানি না পাওয়া গেলে গোসলের পরিবর্তে তাইয়াম্মুম করা মুস্তাহাব নয়। ফরয গোসল ও সুন্নত গোসলের মধ্যে পার্থক্য আছে। ফরয গোসলের উদ্দেশ্য হলো নামায দুরস্ত হওয়া। সুতরাং পানির অভাবে তাইয়াম্মুম করা দ্বারা সে উদ্দেশ্য হাসিল হয়। কিন্তু সুন্নত গোসলের উদ্দেশ্য হলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা এবং শরীরের দুর্গন্ধ দূর করা। তাইয়াম্মুম দ্বারা এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। বরং অপরিচ্ছন্নতা এতে আরো বৃদ্ধি পায়। ফলে তাইয়াম্মুম সুন্নত গোসলের বিকল্প হতে পারে না।

ইহরাম বাঁধার সময় মহিলাদের সুগন্ধি ব্যবহার করা কি বৈধ ?

এ বিষয়ে প্রথমেই কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইহরাম বাঁধতেন তখন আমি তাঁকে সময়ের সবচেয়ে উত্তম সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।" [আবু দাউদ, তিরমিযী]

(২) অপর একটি বর্ণনায় উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা বলেন ঃ "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইহরাম বাঁধার এরাদা করতেন, তখন তিনি সময়ের সব চাইতে উত্তম সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। যার চমক অনেক সময় পর্যন্ত তাঁর চুল ও দাড়িতে পরিলক্ষিত হতো।" [আবু দাউদ, তিরমিযী]

(৩) উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ "ইহরাম বাঁধার পূর্বে এবং তাওয়াফ করার পূর্বে আমি রাসূলুল্লাহকে খোশবু লাগিয়ে দিতাম।" [সহীহ মুসলিম]

(৪) উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি (আমার খালা) উম্মুল মু'মিনীন আয়েশাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ঃ "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইহরাম বাঁধতেন, তখন আপনি তাঁকে কী সুগন্ধি লাগাতেন ? জবাবে তিনি বলেন ঃ সময়ের সর্বোত্তম সুগন্ধি।"

www.bjilibrary.com

(৫) উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ " আমরা (অর্থাৎ নবীর স্ত্রীগণ) রাসূলুল্লাহর সংগে মক্কায় যাত্রা করতাম। ইহরাম বাঁধার সময় আমরা নিজেদের কপালে সুগন্ধির লেপন লাগিয়ে নিতাম। অতপর ঘাম এলে সেগুলো আমাদের মুখমন্ডলে বেয়ে পড়তো। রাসূলুল্লাহ্ আমাদের এ অবস্থা দেখতেন, কিন্তু নিষেধ করতেন না।"[মুসনাদে আহমদ, সুনানে আবু দাউদ]

উল্লেখিত হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইহরাম বাঁধার সময় সুগন্ধি লাগানো মুস্তাহাব এবং এই সুগন্ধি ইহরামের পরেও গায়ে লেগে থাকলে কোনো অসুবিধা নেই। সুতরাং ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল করে নিয়ে যতোটা সম্ভব উত্তম সুগন্ধি লাগানো মুস্তাহাব। কিন্তু ইহরাম বাঁধার পর সুগন্ধি লাগানো যাবে না। তবে চুল কামানো বা ছাঁটার মাধ্যমে হালাল হবার পর লাগানো যাবে।

এ বিধান পুরুষ ও মহিলাদের জন্যে সমভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ ইহরাম বাঁধার পূর্বক্ষণে সুগন্ধি লাগিয়ে নেয়া মহিলাদের জন্যেও মুস্তাহাব, পুরুষদের জন্যেও মুস্তাহাব। এর অকাট্য প্রমাণ হলো উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীস। তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, ইহরাম বাঁধার সময় উম্মুল মু'মিনীনগণ সুগন্ধির লেপন লাগাতেন এবং ইহরাম বাঁধার পরও সেগুলো তাদের শরীরে লেগে থাকতো। এমনকি ঘাম এলে সেগুলো মুখমন্ডলে পর্যন্ত গড়িয়ে পড়তো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ অবস্থা দেখতেন কিন্তু প্রতিবাদ করতেন না। তাঁর নিরব থাকাটা একাজ জায়েয হবার প্রমাণ। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোনো অন্যায় কাজ দেখে নিরব থাকতেন না। হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী বলেছেন, অধিকাংশ আলিমের মত এটাই।

হানাফীদের মতে, ইহরাম বাঁধার সময় শরীরে এবং কাপড়ে সুগন্ধি লাগানো মুস্তাহাব বটে, কিন্তু সুগন্ধিটা এমন হতে হবে যে, ইহরাম বেঁধে নেয়ার পর যেনো বেশীক্ষণ তার তীব্রতা না থাকে। তবে হালকা সুবাস থাকাতে দোষ নেই।

শাফেয়ীদের মতে, ইহরামের সময় গায়ে সুগন্ধি লাগানো মুস্তাহাব। এ বিধান পুরুষ মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। ইহরাম বাঁধার পরেও যদি এ সুগন্ধি শরীরে অবশিষ্ট থাকে তাতে কোনো দোষ নেই। তীব্রভাবে থাকলেও দোষ নেই, কাপড়ে লেগে গেলেও দোষ নেই।

www.bjilibrary.com

ইমাম নববী 'আল মিনহাজ' গ্রন্থে লিখেছেন, যিনি ইহরাম বাঁধবেন, তার উচিত নিজ শরীরে সুগন্ধি মেখে নেয়া। তবে কাপড়েও সুগন্ধি লাগিয়ে নেয়াটা সহীহ্ কথা। ইহরাম বাঁধার পরও যদি সুগন্ধি থেকে যায় তাতে কোনো দোষ নেই। শরীরে যদি তীব্র সুগন্ধিও লেগে থাকে তাতেও কোনো দোষ নেই। কেউ যদি ইহ্রামের সময় সুগন্ধি মাখা কাপড় পরে, অতপর তা খুলে রাখার পর না ধুয়ে আবার পরে, তাহলে তাকে ফিদইয়া দিতে হবে। এটাই বিশুদ্ধ মত। তাই যিনি ইহরাম বাঁধবেন তার সতর্ক থাকা উচিত, যাতে ইহ্রামের কাপড়ে সুগন্ধি না লাগে। কারণ এর ফলে তার দ্বারা এমন কাজ হয়ে যেতে পারে যা নিষেধ।

ইবনে হাজর এবং রমলী উভয়ের মতে ইহ্রামের কাপড়ে সুগন্ধি লাগানো মাকরূহ। এরা দু'জনই শাফেয়ী মযহাবের আলিম।

অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী, মুহাদ্দিস ও ফকীহর মত হলো, ইহ্রাম বাঁধার সময় সুগন্ধি লাগানো জায়েয এবং ইহরাম বাঁধার পর সুগন্ধি ব্যবহার করা হারাম। সাহাবীদের মধ্যে যারা এমত পোষণ করেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, মুয়াবিয়া, আয়েশা এবং উম্মে হাবীবা প্রমুখ রাদিয়াল্লাহু আনহুম। ফকীহদের মধ্যে এ মতের সমর্থক রয়েছেন আবু হানীফা, সুফিয়ান সওরী, আবু ইউসুফ, আহমদ ইবনে হাম্বল এবং দাউদ যাহেরী প্রমুখ।

মহিলাদের শোক পালনের সময় সুগন্ধি ব্যবহার

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, স্বামীর মৃত্যুর কারণে যে মহিলা শোকের ইদ্দত পালন করছে, তার জন্যে সুগন্ধি ব্যবহার করা মাকরূহ। কারণ শোকের দাবীই হলো, সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা পরিহার করা। আর সুগন্ধি সাজসজ্জারই অন্তর্ভুক্ত।

রোযাদারের সুগন্ধি ব্যবহার

কেউ যদি ইহরাম বাঁধার সময় রোযা থেকে থাকেন, তবে শাফেয়ীদের মতে তার সুগন্ধি লাগানো মাকরূহ।

কালইউবীতে লেখা হয়েছে যে, রোযাদার অবস্থায় ইহরাম বাঁধার সময় এবং শোকের ইদ্দত পালন কালে ইহরাম বাঁধার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা মাকরূহ।

www.bjilibrary.com

ইহ্‌রাম বাঁধার সময় যারা সুগন্ধি ব্যবহার নিষেধ মনে করেন

আগেই উল্লেখ করেছি, অধিকাংশ আলিম ও ফকীহ্‌র মতে ইহ্‌রামের সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়েয। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা, ইমাম মালিক, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান, যুহ্‌রী, ইমাম শাফেয়ীর কোনো কোনো সাথী এবং কিছু সংখ্যক শীয়া আলিমের ধারণা মতে ইহ্‌রাম বাঁধার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা না জায়েয। তবে ইনাদের মধ্যে আবার ইহ্‌রামের সময় সুগন্ধি লাগানো হারাম নাকি মাকরূহ্ এবং কেউ লাগিয়ে ফেললে তাকে ফিদইয়া দিতে হবে নাকি হবে না—এসব বিষয়ে মতভেদ আছে।

ইমাম মালিক এবং ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসানের মতে ইহ্‌রাম বাঁধার পরও যে সুগন্ধির গন্ধ অবশিষ্ট থাকে, তা ব্যবহার করা মাকরূহ্। এ মতের পক্ষে তাদের দলিল হলো ইয়ালী ইবনে উমাইয়া বর্ণিত একটি হাদীস। তিনি বলেন, জা'রানা[১] নামক স্থানে এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হয়। লোকটি ইহ্‌রাম বেঁধে নিয়েছিলেন। তার মাথা হলদে রঙে রঞ্জিত ছিলো আর পরণে ছিলো একটি জুব্বা। লোকটি নিবেদন করলো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমি উমরার নিয়ত বেঁধে নিয়েছি, অথচ আমার অবস্থা এ রকম যা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ

انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفر –

"জুব্বাটি খুলে ফেলো আর ঐ হলুদ রং ধুয়ে ফেলো।"

—ইবনে মাজাহ ছাড়া বাকী সব মুহাদ্দিস হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

এই যুক্তি খন্ডন করে দিয়েছেন স্বয়ং ইমাম শাফেয়ী। তিনি বলেন, এ হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জা'রানা থেকে উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে ছিলেন অষ্টম হিজরীতে। সুতরাং এ হাদীসের বক্তব্য অষ্টম হিজরীর। কিন্তু উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সুগন্ধি লাগাবার পক্ষে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা ছিলো দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সময়কার কথা। এ থেকে প্রমাণ হলো সুগন্ধি

---

১. জা'রানা মক্কাবাসীদের মীকাত। এ স্থানটি মক্কার বাইরে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখান থেকেই উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে ছিলেন।

www.bjilibrary.com

লাগাবার পক্ষের কথাটি পরের আর ইয়ালী ইবনে উমাইয়া বর্ণিত ঘটনাটি ঘটেছে দুই বছর পূর্বে। সুতরাং নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী হাদীস পূর্ববর্তী হাদীসের হুকুম রহিত করে দিয়েছে।

এ পর্যালোচনা থেকেও একথা পরিষ্কার হলো যে, ইহরাম বাঁধার সময় নারী পুরুষ উভয়ের জন্যেই সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। এমনকি সুগন্ধির তীব্রতা এবং হালকা গন্ধ অবশিষ্ট থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই। পরিধানের কাপড় সুগন্ধিময় হয়ে গেলেও কোনো অসুবিধা নেই। তবে একথা শোক পালনের জন্যে ইদ্দতরত এবং রোযাদার মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

কিন্তু শরীরের সুগন্ধি যদি কাপড়েও লেগে যায় এবং ইহরাম বাঁধার পর যদি মুহাররাম (যিনি ইহরাম বেঁধেছেন) কোনো কারণে কাপড় খুলেন, তবে সেই সুগন্ধি যুক্ত কাপড়টি পুনরায় পরা যাবে না। অবশ্য ধুয়ে নিয়ে পরতে কোনো অসুবিধা নেই।

ইহরাম বাঁধার সময় মেহেন্দী লাগানো

ইমাম নববী তাঁর 'আল মিনহাজ' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ মহিলাদের জন্যে ইহরাম বাঁধার সময় হাত রং করে নেয়া মুস্তাহাব। মহিলারা ইহরাম বাঁধার সময় দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত মেহেন্দী লাগিয়ে নেবে। কারণ কব্জি পর্যন্ত হাত উন্মুক্ত হয়ে যেতে পারে। একইভাবে মুখমন্ডলেও যেনো তারা কিছুটা মেহেন্দী লাগিয়ে নেয়।

কিন্তু ইহরাম বেঁধে নেয়ার পর মেহেন্দী লাগানো মাকরূহ। কেননা মেহেন্দী লাগানোটাও একপ্রকার সাজসজ্জা। তবে পুরুষ এবং নারী ভাবাপন্নরা যেনো ইহরাম বাঁধার সময়ও কোনো প্রকার রং বা মেহেন্দী না লাগায়।

'আদদীনুল খালিস ফী ইরশাদিন নাসিক' গ্রন্থের লিখকের মতে, ইহরাম বাঁধার সময় মহিলাদের মেহেন্দী লাগানো মুস্তাহাব। এমনকি স্বামী না থাকলেও এবং বৃদ্ধা হলেও একাজ তার জন্যে মুস্তাহাব। মহিলাদের কর্তব্য হলো ইহরাম বাঁধার সময় তারা কব্জি পর্যন্ত দুই হাতে এবং মুখমন্ডলে মেহেন্দী লাগিয়ে নেবে, যাতে করে এসব স্থান উন্মুক্ত হলে শরীরের ত্বক পরিলক্ষিত না হয়। কেননা ইহরামের সময় মহিলাদের মুখমন্ডল উন্মুক্ত রাখার বিধান রয়েছে এবং কখনো কখনো হাত উন্মুক্ত হয়ে পড়ে, তাই মেহেন্দী লাগিয়ে নেয়া উত্তম। তাছাড়া মেহেন্দী মহিলাদের একটি সাজ

www.bjilibrary.com

সৌন্দর্যও বটে। তাই ইহ্‌রামের সময় মেহেন্দী লাগানো মুস্তাহাব, যেমন মুস্তাহাব সুগন্ধি লাগানো এবং চুল আঁচড়িয়ে নেয়া। কিন্তু ইহ্‌রাম বেঁধে নেয়ার পর যেকোনো প্রকার রং লাগানো মাকরূহ। কেননা নীতিগতভাবে ইহ্‌রামের সময় সাজ সৌন্দর্যের প্রতি মনোনিবেশ করাটাই মাকরূহ আর মেহেন্দীও মহিলাদের একটা সাজ।

—উপরে বর্ণিত মত শাফেয়ী আলিমদের।

আসলে একাজ করা জরুরী নয়, করার অনুমতি আছে মাত্র। সুতরাং কোনো মহিলা ইচ্ছে করলে ইহ্‌রামের সময় মেহেন্দী লাগাতে পারে। কিন্তু না লাগালেও কোনো গুনাহ্‌ নেই।

একথাও প্রমাণিত আছে যে, উম্মুল মু'মিনীনগণ মেহেন্দী ব্যবহার করতেন না। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহেন্দীর গন্ধ পসন্দ করতেন না। বর্ণিত আছে যে, খাত্তাবের স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে মেহেন্দী সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, মেহেন্দী লাগানোর মধ্যে কোনো দোষ নেই। তবে আমি তা পসন্দ করি না, কারণ আমার প্রিয়তম মেহেন্দীর গন্ধ পসন্দ করেন না।

অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, বকরা বিনতে উকবা হলুদ রং লাগিয়ে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশার কাছে আসেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন, মেহেন্দী সম্পর্কে আপনার মত কি? জবাবে আয়েশা বলেন ঃ পবিত্র গাছ এবং পবিত্র পানি। অর্থাৎ মেহেন্দীর মধ্যে এ দু'টি পবিত্র জিনিসই থাকে।

শাফেয়ী আলিমদের মতে ইহ্‌রামের পূর্বে মেহেন্দী লাগানোর অনুমতি থাকা সত্ত্বেও ঐ মহিলার জন্যে তা হারাম যে স্বামীর মৃত্যুর কারণে ইদ্দত পালন করছে। একইভাবে তাদের মতে, রূপসী মহিলাদেরও হজ্জের সময় মেহেন্দী লাগানো হারাম, স্বামীর মৃত্যুর কারণে ইদ্দত পালনরতা না হলেও।

ইহ্‌রামের সময় নখপালিশ লাগানো

ইহ্‌রামের সময় মেহেন্দী লাগানো জায়েয বটে, কিন্তু এ ছাড়া অন্য যেকোনো প্রকার নখ পালিশ লাগানো সম্পূর্ণ নাজায়েয। ইহ্‌রামের পূর্বক্ষণেও নাজায়েয এবং ইহ্‌রামের পরেও নাজায়েয। কারণ পালিশ লাগানো থাকা অবস্থায় গোসল এবং অযু কোনোটাই দুরস্ত হয় না। তাছাড়া এটি এমন একটি প্রসাধনী যা থেকে হজ্জের সময় মুক্ত থাকা জরুরী।

www.bjilibrary.com

ইহরাম বাঁধার পরে মেহেন্দী লাগানো

মেহেন্দী প্রসংগে এ যাবত যা কিছু আলোচনা করে এলাম তা ইহরাম বাঁধার পূর্বে লাগানো সংক্রান্ত। কিন্তু ইহরাম বাঁধার পর মেহেন্দী লাগানোর বিষয়ে মতভিন্নতা আছে, যা নিম্নে আলোচিত হলো ঃ

* হানাফীদের মতে ইহরাম অবস্থায় মেহেন্দী লাগানো জায়েয নয়। কারণ মেহেন্দীর মধ্যে এক প্রকার সুগন্ধি থাকে আর ইহরাম অবস্থায় নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যেই সুগন্ধি লাগানো নিষেধ। ফলে ইহরাম বাঁধার পর নারী পুরুষ উভয়ের জন্যে মেহেন্দী লাগানো নাজায়েয। হাতে, মাথায়, দাড়িতে, শরীরে, যেখানেই লাগানো হোক না কেন তা নাজায়েয।

* শাফেয়ীদের মতে, ইহরাম বাঁধার পর মহিলাদের জন্যে মেহেন্দী লাগানো মাকরূহ।

* হাম্বলীদের মতে, নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যে ইহরাম অবস্থায় শরীরের কোনো অংগে মেহেন্দী লাগানো হারাম নয়। তবে পুরুষদের মাথায় লাগানো হারাম।

www.bjilibrary.com

৩২. ইহরামের অর্থ ও প্রকার ভেদ

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ইহরাম হলো হজ্জ করার, অথবা উমরা করার, কিংবা হজ্জ ও উমরা উভয়টি একত্রে করার নিয়ত করা।

হানাফীদের ছাড়া বাকী সকল মযহাবে ইহরাম হজ্জের রুকন (স্তম্ভ)। হানাফীদের মতে ইহরাম যদিও হজ্জের রুকন নয়, কিন্তু হজ্জ সহীহ্ হবার জন্যে ইহরাম শর্ত। এ হিসেবে হানাফীদের নিকটও ইহরাম হজ্জের রুকনের মর্যাদা সম্পন্ন।

একথা দলিল আদিল্লা দ্বারা প্রমাণিত যে, নিয়ত হলো মনে মনে এরাদা করা। মনে মনে এরাদা করলেই নিয়তের শর্তও পূর্ণ হয়ে যায়। অর্থাৎ মনে মনে এ ইচ্ছা ও এরাদা করবে যে, আমি নিয়ম বিধান অনুযায়ী অমুক ইবাদত পালন করছি।

নিয়তের স্থান হলো অন্তর। সুতরাং নিয়তকে শাব্দিক রূপ দিয়ে মুখে উচ্চারণ করা শর্ত নয়, ওয়াজিবও নয়। সুতরাং হজ্জ এবং উমরার ক্ষেত্রে মনে মনে এই এরাদা করাই নিয়ত যে, আমি হজ্জ বা উমরা শুরু করছি। এই নিয়তটাই হলো ইহরাম বাঁধা। ইহরাম শব্দটি এসেছে, 'হারাম' থেকে। ইহরাম মানে হারাম হওয়া বা হারাম করে নেয়া। নিয়ত করা বা ইহরাম বাঁধার সাথে সাথে এমন সমস্ত কাজই তার উপর হারাম হয়ে যায়, হজ্জ এবং উমরা পালন কালে যেগুলো করা নিষেধ।

কামাল বিন হুমাম ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে লিখেছেন, যেসব বর্ণনাকারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ্জ পালন সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমাদের জানা মতে তাদের একজনও বলেননি যে, রাসূলুল্লাহ 'আমি হজ্জের বা উমরার নিয়ত করছি' এরূপ বলে কখনো নিয়ত করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী লিখেছেন, ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ সায়ীদ আবদুর রহমানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বাঁধার সময় কখনো হজ্জ বা উমরার নাম মুখে উচ্চারণ করেননি।

www.bjilibrary.com

ইমাম শাফেয়ী আরো লিখেছেন ঃ কোনো ব্যক্তি ইহরাম বাঁধার সময় যদি হজ্জ বা উমরার কথা মুখে উচ্চারণ করে,তবে আমার দৃষ্টিতে এটা মাকরূহ হবে না।

'আল মুগনী' গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইহরাম বাঁধার সময় হজ্জ বা উমরার কথা মুখে উচ্চারণ করা মুস্তাহাব। আর মুখে উচ্চারণের সময় এভাবে বলা উচিত ঃ

"হে আল্লাহ ! আমি উমরা করবার এরাদা করলাম। তুমি আমার একাজ সহজ করে দাও এবং আমার এ উমরা তুমি কবুল করে নাও।"

অথবা এভাবে বলা উচিত ঃ

"হে আল্লাহ ! আমি হজ্জ করার নিয়ত করলাম, তুমি আমার একাজ সহজ করে দাও এবং কবুল করো।"

কিংবা এভাবে বলবে ঃ

"হে আল্লাহ ! আমি হজ্জ এবং উমরা উভয়টি করার এরাদা করলাম। তুমি এ উভয় কাজ আমার জন্যে সহজ করে দাও এবং কবুল করে নাও।"

নুফাসা ও ঋতুবতীর ইহরাম

মহিলারা হায়েয নিফাস চলাকালে ইহরাম বাঁধতে পারে। মীকাত অতিক্রমকালে তারা হজ্জ বা উমরার নিয়ত করে নেবে। হজ্জ ও উমরার নিয়ত করা তথা ইহরাম বাঁধার জন্যে পবিত্র হওয়াটা শর্ত নয়। তাই নিফাস এবং হায়েয ইহরাম বাঁধার জন্যে প্রতিবন্ধক নয়। এ ব্যাপারে একটু আগেই উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে আমরা হাদীস উল্লেখ করেছি। তাতে বলা হয়েছে 'শাজারা' নামক স্থানে আসমা বিনতে উমায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহা বাচ্চা প্রসব করেন ফলে তাঁর নিফাস আরম্ভ হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে গোসল করে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ পাঠান।

হায়েয ও নিফাস চলাকালে মহিলারা বাইতুল্লার তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের বাকী সকল নিয়ম বিধান পালন করতে পারে। তবে হজ্জ বা উমরার ইহরাম বাঁধার সময় যে দু'রাকাত নামায পড়তে হয়, তা তারা পড়তে পারবে না। কারণ হজ্জ ও উমরা বিশুদ্ধ হবার জন্যে এই দুই রাকায়াত আদায় করাটা

www.bjilibrary.com

শর্ত নয়। আসমা বিনতে উমায়েস উক্ত দুই রাকায়াত পড়েননি, তবু তাঁর হজ্জ সহীহ হয়ে গেছে।

ইহরামের প্রকার ভেদ

ইহরাম তিন প্রকারের হয়ে থাকে ঃ

১. ইফরাদ

২. তামাত্তু

৩. কিরান

(১) ইফরাদ ঃ এর মানে হজ্জযাত্রী মীকাত থেকে শুধুমাত্র হজ্জের ইহরাম বাঁধবে এবং হজ্জের যাবতীয় নিয়ম বিধান পালনের পর ইহরাম খুলে ফেলবে।

শাফেয়ীদের মতে হজ্জে ইফরাদ কিরান ও তামাত্তু থেকে উত্তম। মালিকীদেরও একটি বিখ্যাত মত এরূপ।

যারা ইফরাদ হজ্জ করেন, তাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়।

(২) তামাত্তু ঃ এর মানে মীকাত অতিক্রমকালে শুধুমাত্র উমরা করার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধবে। অর্থাৎ ইহরাম বাঁধার সময় এভাবে নিয়ত করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِىْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ –

"হে আল্লাহ ! আমি উমরা করার এরাদা করলাম। তুমি তা আমার জন্যে সহজ করে দাও এবং আমার থেকে কবুল করে নাও।"

যখন উমরা শেষ হবে অর্থাৎ কা'বা ঘরের তাওয়াফ করবে এবং সাফা মারওয়ায় সায়ী করবে, তখন চুল ছেঁটে বা কামিয়ে ইহ্রাম খুলে ফেলবে এবং হজ্জের সময় আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। অতপর যখন হজ্জের সময় এসে যাবে তখন হজ্জের ইহরাম বেঁধে নেবে।

এ পদ্ধতিকে তামাত্তু বলা হয় এ কারণে যে, এরূপ যিনি করেন তিনি উমরা শেষ করবার পর ইহরাম খুলে হজ্জ আরম্ভ হবার পূর্ব পর্যন্ত সবকিছু ভোগ ও গ্রহণ করতে পারেন।

হানাফীদের মতে তামাত্তু হজ্জ ইফরাদ হজ্জের চাইতে উত্তম। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে তামাত্তু হজ্জ ইফরাদ এবং কিরান উভয়ের

www.bjilibrary.com

চাইতে উত্তম। ইমাম শাফেয়ীরও একটি মত হলো তামাত্তু কিরানের চাইতে উত্তম।

তামাত্তু হজ্জ পালনকারীর জন্যে কুরবানী করা ওয়াজিব।

(৩) কিরান ঃ কিরান মানে একই সাথে হজ্জ এবং উমরা উভয়টির ইহরাম বাঁধা এবং এরূপ নিয়ত করা যে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَيَسِّرْهُمَا لِىْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّىْ -

"হে আল্লাহ ! আমি হজ্জ এবং উমরা উভয়টি একত্রে করবার নিয়ত করছি। তুমি আমার জন্যে একাজকে সহজ করে দাও এবং কবুল করে নাও।"

হানাফীদের মতে কিরান হজ্জ তামাত্তু ও ইফরাদ উভয়টির চেয়ে উত্তম। কিরান হজ্জ পালনকারী ততোক্ষণ পর্যন্ত ইহরাম খুলবেন না, যতোক্ষণ না হজ্জের সমস্ত নিয়ম বিধান পালন করে শেষ করবেন। তিনি ইফরাদ হজ্জ পালনকারীর মতোই হজ্জের সমস্ত বিধান পালন শেষে ইহরাম খুলবেন। কিরান হজ্জ পালনকারীর জন্যেও জামরায়ে উকবা (পাথর নিক্ষেপ) শেষে কুরবানী করা ওয়াজিব।

কোনো ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট করে হজ্জ কিংবা উমরার নিয়ত না করে শুধু মাত্র মানাসিকে হজ্জ বা হজ্জের বিধানসমূহ পালনের নিয়ত করে ইহরাম বাঁধে, তবু তার হজ্জ সহীহ্ হবে এবং তিনি মুহরেম হবেন। যিনি এরূপ নিয়ত করবেন তিনি ইচ্ছে করলে হজ্জের বিধানসমূহ পালন করতে পারেন আবার ইচ্ছা করলে উমরার নিয়মাবলীও পালন করতে পারেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে এরূপ ইহরামকে উমরার ইহরাম ধরে নেয়াই উত্তম। অর্থাৎ তিনি প্রথমে উমরা সেরে নিয়ে পরে হজ্জের ইহরাম বাঁধবেন এবং তামাত্তু করবেন। কেননা, ইফরাদের চাইতে তামাত্তু উত্তম।

আল মুগনী গ্রন্থে বলা হয়েছে, যিনি হজ্জ বা উমরার ইহরাম বেঁধেছেন, তার জন্যে মুস্তাহাব হলো তিনি ইহরাম বাঁধার সময় এই শর্ত লাগাবেন যে, হজ্জ বা উমরা পালনকালে যদি কোথাও বাঁধার সম্মুখীন হন, তবে সেখানে ইহরাম খুলে ফেলবেন। এই শর্তটির দুইটি ফায়দা আছে ঃ

(১) প্রথমটি হলো এই যে, শত্রুর আক্রমণ, রোগাক্রমণ বা পথের সম্বল শেষ হয়ে যাবার কারণে কিংবা অন্য কোনো কারণে যদি বাধ্য হয়ে হজ্জ বা

www.bjilibrary.com

উমরার মানাসিকসমূহ পালন করা না যায়, তবে নিয়তের সময় যিনি শর্তারোপ করে রাখবেন, তিনি ইচ্ছে করলে ইহরাম খুলে ফেলতে পারবেন।

(২) দ্বিতীয় ফায়দাটি হলো এই যে, এই শর্তের ভিত্তিতে কেউ যদি ইহরাম খোলেন, তবে তার পশু কুরবানী দেয়া ওয়াজিব হবে না এবং রোযা রাখাও জরুরী হবে না।

সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার যুবায়েরের কন্যা জবায়ার বাড়ী যান। তখন জবায়া আরয করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল ! আমি হজ্জের নিয়ত করেছি অথচ আমি অসুস্থ।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ

حجى واشترطى ان محلى حيث حبستنى -

"হজ্জ করো, তবে ইহরামের সময় এই শর্ত লাগাবে যে, রোগের কারণে যেখানে অক্ষম হয়ে পড়বো সেখানে ইহরাম খুলে ফেলবো।"

কেউ যদি ইফরাদ হজ্জের ইহরাম বেঁধে থাকে, তবে সে হজ্জের পরিবর্তে উমরা করতে পারে এবং উমরা শেষ করে দ্বিতীয়বার হজ্জের ইহরাম বেঁধে তামাত্তু করতে পারে।

একইভাবে কেউ যদি কিরান হজ্জের ইহরাম বেঁধে থাকে, তবে সে এই হজ্জের পরিবর্তে উমরা করতে পারে।

কিন্তু ইফরাদ ও কিরান হজ্জকে কেবল তখনই উমরাতে পরিবর্তন করা যাবে, যখন সে সাথে কুরবানীর পশু নিয়ে যাবে না। কিন্তু সাথে করে যদি কুরানীর পশু নিয়ে গিয়ে থাকে, তবে নিয়ত পরিবর্তন করা যাবে না। অর্থাৎ ইফরাদের নিয়ত করে থাকলে ইফরাদই করতে হবে আর কিরানের নিয়ত করে থাকলে কিরানই করতে হবে।

কিন্তু যিনি তামাত্তুর জন্যে ইহরাম বেঁধেছেন তিনি যদি কোনো কারণে হজ্জ না করতে পারার আশংকা করেন তবে ইহরাম না খুলে হজ্জ করার নিয়ত করে নিবেন এবং তামাত্তুর পরিবর্তে কিরান করবেন।

কেউ যদি উমরার নিয়তে ইহরাম বেঁধে থাকেন, তবে তিনি তার পরিবর্তে ইফরাদ হজ্জ করতে পারবেন না। একইভাবে যিনি কিরান হজ্জের নিয়তে ইহরাম বেঁধেছেন তিনি সেটার পরিবর্তে ইফরাদ হজ্জ করতে পারেন না।

www.bjilibrary.com

৩৩. ইহরামে মহিলাদের পোশাক

(১) আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিল ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! যে ইহরাম বাঁধবে সে কি ধরনের পোশাক পরবে?" জবাবে রাসূলুল্লাহ বলেছিলেন ঃ

لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احداً لا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس- (رواه مسلم رحـ وا لجماعة)

"জামা পরবে না, পা'জামা পরবে না, কোট পরবে না, পাগড়ী বাঁধবে না, মোজা পরবে না তবে কারো জুতা না থাকলে সে মোজা পরতে পারবে টাখনুর নিচে, তাছাড়া এমন কাপড়ও পরবে না যাতে জাফরান বা ওয়ারসের[১] রং লাগানো হয়েছে।" [সহীহ মুসলিম]

(২) আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لا تنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين -(احمد رحـ والبخاری رحـ والنسائ)-

"ইহরাম বাঁধা মহিলারা নিকাব লাগাবে না এবং দাস্তানা (হস্তাবরনী) পরবে না।" [মুসনাদে আহমদ, সহীহ বুখারী, সুনানে নাসায়ী]

(৩) মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "ইহরামের সময় মহিলারা দস্তানা ও নিকাব পরবে না এবং এমন কাপড় পরবে না যাতে জাফরান ও ওয়ারসের রং লাগানো হয়েছে।"

---

১. ওয়ারস এক প্রকার ছোট গাছ যা ইয়েমেন অঞ্চলে হয়ে থাকে। এর রং প্রায় জাফরানের মতো। রং এবং সুগন্ধি উভয় উদ্দেশ্যেই এটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

www.bjilibrary.com

এ হাদীসটি আবু দাউদেও বর্ণিত হয়েছে। সেখানকার বর্ণনায় অতিরিক্ত একথাগুলো রয়েছে ঃ

و لتلبس بعد ذلك ما احبت من الون الثياب معصفرا اوخزاً او حليا او سراويل او قميصا –

"এছাড়া অন্য যে কাপড় পসন্দ হয় তারা পরতে পারে, পুষ্প রং করা রেশমী কাপড় পরতে পারে, অলংকার, সেলোয়ার কামীস পরতে পারে।"

অনুরূপ হাদীস বায়হাকী এবং মুসতাদরাকে হাকিমেও বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাকারীরাও নির্ভরযোগ্য।

(৪) ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইহরাম অবস্থায় পুষ্প রং-এ রঞ্জিত কাপড় পরা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

"ইহরাম অবস্থায় মহিলারা কাপড়ের পট্টি বাঁধবে না বোরকা পরবেনা এবং এমন কোনো কাপড় পরবেনা যাতে ওয়ারস এবং জাফরানের রং লাগানো হয়েছে।"

উপরে বর্ণিত হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, মহিলারা ইহরাম বাঁধার পর পূর্ণ শরীর ঢাকার মতো সব ধরনের কাপড় পরতে পারে, সেটা সেলাই করা হোক কিংবা বিনা সেলাইতে হোক তাতে কিছু যায় আসেনা। তবে মুখ মন্ডল ঢাকা জায়েয নয় বরং এসময় নিকাব ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

সুতরাং ইহরাম অবস্থায় মহিলারা সাধরণত যেসব কাপড় ও পোশাক পরে থাকে, সেগুলোই পরতে পারে। জুতা এবং মোজা পরাও জায়েয। তবে উপরোক্ত হাদীসগুলোতে যে কয়েকটি জিনিস পরতে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলোর ব্যাখ্যায় ফকীহদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। সে জিনিসগুলো হলো ঃ

১. সুগন্ধি যুক্ত কাপড়

২. দস্তানা

৩. নিকাব ও বোরকা

৪. পুষ্প রং-এ রঞ্জিত কাপড়। এগুলোর ব্যাপারে শরীয়া বিশেষজ্ঞদের মতামত নিম্নে প্রদত্ত হলো।

www.bjilibrary.com

সুগন্ধিযুক্ত কাপড়

আমরা একটু আগেই জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'মহিলারা যেনো ইহরাম অবস্থায় এমন বস্ত্র পরিধান না করে যাতে জাফরান বা ওয়ারসের রং লাগানো হয়েছে।'

ওয়ারস হলো হলুদ রং-এর সুগন্ধিযুক্ত একপ্রকার ছোট গাছ। এর দ্বারা কাপড় রং করা হয়। এ গাছ দ্বারা অবশ্য সুগন্ধি তৈরী করা হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। এর কারণ হলো, তিনি আসলে ইহরামের সময় সুগন্ধি এবং সুগন্ধিযুক্ত কোনো জিনিস ব্যবহার করার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন।

ইমাম নববী লিখেছেন, গোটা মুসলিম উম্মাহ এ বিষয়ে একমত যে, ইহরাম অবস্থায় জাফরান এবং ওয়ারসের রং-এ রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করা হারাম। কেননা এই দুইটিই সুগন্ধিযুক্ত। আর ইহরামের অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার হারাম। এই দুইটি জিনিসের উপর কিয়াস করে উলামায়ে কিরাম এমন সব জিনিসই ইহরামের অবস্থায় ব্যবহার করাকে নাজায়েয মনে করেন যেগুলো সুগন্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

কিন্তু অধিকাংশ আলিমের মতে, ইহরাম অবস্থায় এমন রংগীন কাপড় পরিধান করাও নিষেধ, যাতে রং করার পরেও কিছু না কিছু সুগন্ধি অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং সুগন্ধি সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয়েছে এমন রংগীন কাপড় পরা জায়েয।

ইমাম মালিক এ ক্ষেত্রেও ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে, সুগন্ধি সুম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হবার পরও ইহরাম অবস্থায় রংগীন কাপড় পরা জায়েয নয়।

দস্তানা

হাদীসে কাফাযান (قفازان) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ করেছি আমরা দস্তানা। এর মানে এমন দস্তানা যেটা মহিলারা সাধারণত তাদের হাতে পরে থাকে এবং যা পরার পর আংগুলসহ পুরো হাত ঢেকে যায়।

উপরে উল্লেখিত হাদীস থেকে জানা যায়, ইহরাম অবস্থায় দস্তানা পরা মহিলাদের জন্যে হারাম। ইমাম মালিক এবং আহমদ ইবনে হাম্বলের মত

www.bjilibrary.com

এটাই। শাফেয়ীদের বিশুদ্ধতম মতও এটাই। আর হানাফীদের মাঝেও এমতের প্রচলনই খ্যাতি লাভ করেছে।

কিন্তু ইমাম আবু হানীফার দু'জন সেরা সাথীর একজন ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ শায়বানীর মতে, ইহরামের সময় মহিলাদের দস্তানা পরা জায়েয। মযনীর বর্ণনানুযায়ী ইমাম শাফেয়ীর মতও এটাই। ইমাম মালিকেরও একটি মত এ মতের সমর্থক। এই মতের পক্ষে তাদের দলিল হলো আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু বর্ণিত সেই হাদীসটি যাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

احرام المرأة فى وجهها –

"মহিলাদের ইহরাম তাদের মুখমন্ডলে।"[দারুকুতনী, বায়হাকী]

হাদীসটির তাৎপর্য হলো, ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের মুখমন্ডল ছাড়া গোটা শরীর ঢেকে রাখাতে কোনো গুনাহ নেই।

কিন্তু কোনো কোনো হাদীস বিশেষজ্ঞের মতে এ হাদীসটি জয়ীফ। আর যেসব হাদীসে দস্তানা পরতে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলো বিশুদ্ধ হাদীস। কোনো বিষয়ে যখন হাদীসের বক্তব্যে একাধিক মত পাওয়া যায়, তখন মূলনীতি অনুযায়ী সহীহ হাদীসের বক্তব্যকেই গ্রহণ করতে হয়। ফলে, হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের দস্তানা পরা হারাম—এ মতই অগ্রাধিকার পেয়েছে।

মালিকীদের মতে, ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের জন্যে কামিসের মধ্যে হাত লুকিয়ে রাখা হারাম নয়।

শাফেয়ীদের মত হলো, হাতে কেবল দস্তানা পরাটাই নিষেধ। এছাড়া অন্য কোনো জিনিস দিয়ে হাত ঢেকে রাখা জায়েয। বস্ত্র খন্ড হাতে বেঁধে রাখা যেতে পারে। এতে কোনো দোষ নেই।

আল্লাহ তা'আলা এই আলিমগণের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। কিন্তু আমাদের মতে হাদীসে যে দস্তানা পরতে নিষেধ করা হয়েছে, তার তাৎপর্য হলো, কোনো কিছু দিয়ে হাত ঢেকে না রাখা।

তবে মালিকী আলিমরা যে বলেছেন মহিলারা কামিসের মাঝে হাত লুকিয়ে রাখতে পারে, তাদের এ মতটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু দস্তানা

www.bjilibrary.com

ছাড়া সবকিছু দিয়ে হাত ঢাকা জায়েয এমনটি বেঁধে রাখাও জায়েয—এরূপ কথা কেবল ক্ষেত্র বিশেষেই প্রযোজ্য হতে পারে। যেমন, অসুখের কারণে যদি কারো হাতে ব্যান্ডেজ বা প্লাষ্টার লাগাতে হয়, তবে তা জায়েয। কারণ এটা একটা বাধ্য হওয়া কাজ। এটা না করলে ক্ষতির আশংকা আছে।

কুসুম ফুলের রঙে রঞ্জিত কাপড়

ইমাম সুফিয়ান সওরী এবং হানাফীদের মতে, ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের কুসুম ফুলের তৈরী রঙে রঞ্জিত করা কাপড় পরা হারাম। তাদের মতে কুসুম সুগন্ধিযুক্ত, তাই এর দ্বারা রঙ করা কাপড় পরলে ফিদইয়া দেয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। তবে সেই কাপড়টি যদি এমনভাবে ধুয়ে নেয়া হয় যাতে তার রঙে অন্য কাপড়ে রঙ না হয় তবে ফিদইয়া দিতে হবে না।

কিন্তু ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে, ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের কুসুমের রঙে রঙ করা কাপড় পরা জায়েয। নিম্নে বর্ণিত হাদীসগুলো হলো তাদের দলিল ঃ

(১) তাদের পয়লা দলিল আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত এবং আবু দাউদ, বায়হাকী ও মুসতাদরিকে হাকিমে বর্ণিত সেই হাদীসটি যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ঐ হাদীসে বলা হয়েছে ইহরাম অবস্থায় মহিলারা কিছু কিছু কাপড় যেগুলোর উল্লেখ সেখানে করা হয়েছে সেগুলো ছাড়া বাকী সবধরনের কাপড় এবং সব রঙের কাপড় পরতে পারে। যেমন কুসুমের রঙে রঙ করা কাপড় প্রভৃতি।

(২) তাদের দ্বিতীয় দলিল হলো বুখারীর সেই হাদীসটি, যাতে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইহরাম অবস্থায় কুসুম ফুলের রঙে রং করা কাপড় পরা ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাছাড়া জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমার দৃষ্টিতে কুসুম ফুল সুগন্ধি নয়।

ইহরাম অবস্থায় অলংকার ও কালো কাপড় পরা

হাদীসে যেসব পরিধেয়র কথা নিষেধ করা হয়েছে সেগুলো বাদে মহিলারা ইহরাম অবস্থায় যে রকম ইচ্ছে পোশাক ও অলংকার পরতে পারে। কেননা

www.bjilibrary.com

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের অলংকার, কালো কিংবা গোলাপী বস্ত্র এবং মোজা পরাকে দূষণীয় মনে করতেন না।

তাছাড়া পুষ্প রং এর কাপড়, রেশমী কাপড়, অলংকার এবং সেলোয়ার কামিস তারা পরতে পারে।

তবে সর্বোত্তম পরিধেয় হলো সাদা কাপড়ের পরিধেয়। যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

خير ثيابكم البياض فالبسوها احياءكم وكفنوها امواتكم -

"তোমাদের সর্বোত্তম লেবাস হলো সাদা লেবাস। সুতরাং তোমাদের জীবিতদের তা পরাও আর তোমাদের মৃতুদেরও তাই দিয়ে কাফন পরাও।" [তাবরানী, ইবনে মাজাহ]

www.bjilibrary.com

৩৪. ইহরামের সময় মুখমন্ডলে নিকাব পরা ও লাব্বায়েক বলা

হাদীসের বর্ণনা

ইহরাম অবস্থায় মহিলারা মুখমন্ডল ঢেকে রাখবে, নাকি উন্মুক্ত রাখবে ? এ ব্যাপারে ইসলামের বিধান কি ?

এ বিষয়ে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে প্রথমে সেগুলো উল্লেখ করা হলোঃ

(১) আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين –

"মহিলারা ইহরাম অবস্থায় নিকাব এবং দস্তানা পরবে না।" [মুসানাদে আহমদ, সহীহ বুখারী, সুনানে নাসায়ী, জামে তিরমিযী]

(২) আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের দস্তানা, নিকাব ও ওয়ারস্ বা জাফরানের রং লাগানো কাপড় পরতে নিষেধ করতে শুনেছি। [মুসনাদে আহমদ]

(৩) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "ইহরাম অবস্থায় মহিলারা কাপড় দিয়ে মুখমন্ডল ঢাকবে না, নিকাব লাগাবে না এবং এমন কোনো কাপড় পরবে না যাতে ওয়ারস্ বা জাফরানের রং লাগানো হয়েছে।" [সহীহ বুখারী]

(৪) উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা ইহরাম বেঁধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফর করতাম। এ সময় আমাদের মুখমন্ডল উন্মুক্ত থাকতো। আমাদের পাশে দিয়ে যখন পুরুষরা অতিক্রম করতো, আমরা মাথা থেকে মুখের উপর চাদরের আঁচল টেনে দিতাম। তারা আমাদের অতিক্রম করে চলে গেলে আবার মুখমন্ডল উন্মুক্ত করে নিতাম।

www.bjilibrary.com

নিকাব কি ?

নিকাব হলো সেই বস্ত্র খন্ড যা মহিলারা মুখমন্ডলের উপর ঝুলিয়ে দেয় এবং যাতে দেখবার জন্যে দুই চোখ বরাবর দুইটি ছিদ্র থাকে।

ইবনে হাজর আসকালানী ফতহুল বারীতে লিখেছেন, নিকাব মানে ওড়নাকে নাক এবং চিবুকের উপরে বেঁধে নেয়া, যাতে করে মুখমন্ডল ঢেকে যায় এবং চোখ খোলা থাকে।

ইমামদের মতামত

উপরে বর্ণিত হাদীসগুলোর ভিত্তিতে ইমাম ও আলিমগণ একমত যে, ইহরাম অবস্থায় কোনো কিছু দিয়ে মুখমন্ডল ঢেকে রাখা মহিলাদের জন্যে হারাম। তবে মাথা ঢেকে রাখা নিষেধ নয়, বরং ওয়াজিব। উপরোক্ত হাদীসগুলোতে ইহরাম অবস্থায় নিকাব ও দস্তানা পরতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং এ নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইমাম নববী লিখেছেন, ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের শরীর ঢেকে রাখতে হবে, তবে কোনো কিছু দিয়ে মুখমন্ডল ঢেকে রাখা হারাম।

ইবনে কুদামা আল মুগনী গ্রন্থে লিখেছেন, ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের মুখমন্ডল ঢাকা সে রকমই হারাম, যেমন পুরুষদের মাথা ঢাকা হারাম। এ ব্যাপারে কোনো মযহাবের দ্বিমত আছে বলে আমাদের জানা নেই।

ইবনুল মুনযির লিখেছেন, সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুম ইহরাম অবস্থায় বোরকা পরাকে মাকরূহ মনে করতেন। এ প্রসংগে কেউ দ্বিমত পোষণ করেন বলে আমাদের জানা নেই।

এ ব্যাপারেও আলিমগণ একমত যে, ইহরাম অবস্থায় মহিলারা কিছু শর্তের ভিত্তিতে পরপুরুষ থেকে নিজেদের মুখমন্ডল লুকাতে পারে। কিন্তু ঐকমত্য সত্ত্বেও কিছু কিছু প্রাসংগিক ব্যাপারে আলিমদের মাঝে কিছুটা মতপার্থক্য দেখা যায়। সেগুলো নিম্নরূপ :

* **মালিকী মযহাব :** মালিকীদের মতে, ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের মুখমন্ডলের এমন কোনো অংশ আবৃত করা নিষেধ যা আবৃত করলে মাথা বা খোঁপা আবৃত করা স্থগিত রাখতে হয়। একইভাবে মুখমন্ডল আবৃত করার

www.bjilibrary.com

উদ্দেশ্য যদি হয় পুরুষদের দৃষ্টি থেকে বাঁচা, তবে তা জায়েয। কিন্তু শর্ত হলো, যে জিনিস দিয়ে চেহারা ঢাকা হবে তা যেনো পরিধেয় বস্ত্রের সাথে সেলাই করা বা বেঁধে রাখা না হয়। যদি হয় তবে তা নিষেধ। অর্থাৎ এমন কোনো বস্ত্র খন্ড দিয়ে চেহারা ঢাকা হারাম যা পরিধেয় বস্ত্রের সাথে সেলাই করা হয়েছে কিংবা বেঁধে নেয়া হয়েছে। এভাবে চেহারা ঢাকা হয়ে থাকলে এজন্যে ফিদইয়া দিতে হবে।

*** শাফেয়ী মযহাব ঃ** শাফেয়ীদের মতে, মহিলারা ইহরাম অবস্থায় পরপুরুষ থেকে চেহারা লুকাতে পারে। তবে তা করতে হবে এমন বস্ত্রখন্ড দিয়ে যা চেহারার সাথে লেগে না থাকে বা চেহারা স্পর্শ না করে।

*** হানাফী মযহাব ঃ** হানাফীদের মতে, ইহরাম অবস্থায় মহিলারা পরপুরুষ থেকে নিজ চেহারা লুকাতে পারে। তবে তা করার নিয়ম হলো, চেহারার উপর কোনো কিছু এমনভাবে ঝুলাতে হবে, যেনো তা চেহারা স্পর্শ না করে।

*** হাম্বলী মযহাব ঃ** হাম্বলীদের মতে, ইহরাম অবস্থায় মহিলারা কোনো প্রয়োজনে নিজেদের চেহারা ঢাকতে পারে। যেমন, নিকট দিয়ে যদি পরপুরুষ অতিক্রম করে, তখন তারা চেহারা ঢাকতে পারে। আর যে বস্ত্র দিয়ে চেহারা ঢাকবে তা যদি চেহারা স্পর্শও করে তাতে কোনো দোষ নেই। কেননা চেহারা ঢাকার ক্ষেত্রে বস্ত্রখন্ড চেহারা স্পর্শ না করার যে শর্ত লাগানো হয় তা এতোই দুর্বল যে, তার পক্ষে কোনো দলিল নেই। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইহরাম অবস্থায় চাদরের আঁচল দিয়ে নিজ চেহারা লুকানোর যে তথ্য দিয়েছেন, তা থেকে একথা প্রমাণ হয় না যে, তা তাঁর চেহারা স্পর্শ করেনি। কোনো বস্ত্র দিয়ে চেহারা ঢাকবার পর তা চেহারা স্পর্শ করবে না, এমনটি অস্বাভাবিক। তাছাড়া চেহারা স্পর্শ না করাটা যদি শর্তই হতো, তবে নিশ্চয়ই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা স্পষ্ট করে বলে যেতেন।[১]

সুতরাং চেহারা ঢাকবার সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে কাপড় যদি চেহারা স্পর্শ করে এবং মহিলা যদি সাথে সাথে তা সরিয়ে দেয়, তবে তাতে ফিদইয়া দিতে হবে না। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে অবিরাম লাগিয়ে রাখলে ফিদইয়া দেয়া আবশ্যক।

---

১. নায়লুল আওতার, ৬ষ্ঠ খন্ড ৮৩ পৃষ্ঠা এবং ফিক্হুস সুন্নাহ, ১ম খন্ড ৬৭৪ পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

মহিলাদের লাব্বায়েক বলা

বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন যে, মহিলারা সাফা মারওয়ায় আরোহণ করবে না এবং উচ্চস্বরে লাব্বায়েক বলবে না।

ইমাম মালিক তাঁর মুআত্তা গ্রন্থে লিখেছেন, আমি জ্ঞানীদের কাছে শুনেছি, মহিলাদের উচ্চস্বরে লাব্বায়েক বলা জরুরী নয়। ইমাম মালিক আরো লিখেছেন যে, মহিলারা এমনভাবে লাব্বায়েক বলবে, যা কেবল নিজে এবং নিকটবর্তী লোকেরা শুনবে। এর চাইতে উচু আওয়াজে বলা তাদের জন্যে মাকরূহ।

আর রুইয়ানী, আবুত তাইয়্যেব এবং ইবনুর রাফয়া লিখেছেন, মহিলাদের উচ্চস্বরে লাব্বায়েক বলাটা হারাম নয়। কেননা বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী মহিলাদের কণ্ঠস্বর গোপনীয় (আওরাত) নয়। তবে উচ্চস্বরে লাব্বায়েক বলাটা তাদের জন্যে মাকরূহ।

হায়েয ও নিফাস অবস্থায় লাব্বায়েক বলা

মহিলারা হায়েয বা নিফাস অবস্থায় লাব্বায়েক বলতে পারে। কারণ, লাব্বায়েকের বাক্যগুলো কুরআন নয়। হায়েয ও নিফাস অবস্থায় তো কেবল কুরআন তিলাওয়াত নিষেধ। এ কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হায়েয ও নিফাস অবস্থায় মহিলাদেরকে নামায ও বাইতুল্লাহর তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের বাকী সকল নিয়ম সেভাবেই পালন করবার অনুমতি দিয়েছেন, যেভাবে পালন করে অন্যরা।

www.bjilibrary.com

৩৫. ইহরাম অবস্থায় যেসব কাজ হারাম

কেউ যখন ইহরাম বাঁধে অর্থাৎ হজ্জ বা উমরা করবার নিয়ত বেঁধে নেয়, তখন তার জন্যে কিছু কাজ হারাম হয়ে যায়। এ কাজগুলোর মধ্যে কিছু স্বয়ং কুরআনেই নির্দেশিত হয়েছে, আর কিছু হয়েছে হাদীসে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوْقَ وَلاَ جِدَالَ فِى الْحَجِّ - (البقرة -١٩٧)

হজ্জের মাসসমূহ সকলেরই জানা। এই নির্দিষ্ট মাসসমূহে যে হজ্জের নিয়ত করবে, তাকে সতর্ক থাকতে হবে হজ্জের সময় যেনো তার দ্বারা কোনো জৈবিক লালসা তৃপ্তির কাজ, কোনো কুকর্ম এবং ঝগড়া লড়াইর কাজ সংঘটিত না হয়। [আল বাকারা ঃ ১৯৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ -

হে ঈমানদার লোকেরা ! ইহরাম অবস্থায় তোমরা শিকার হত্যা করো না।" [আল মায়েদা ঃ ৯৫]

কুরআন পাকের আরো নির্দেশ হলো ঃ

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمًا-(الماعد -٩٦)

"ইহরাম অবস্থায় স্থলভাগের শিকারও তোমাদের উপর হারাম করা হলো।" [আল মায়েদা ঃ ৯৬]

ইহরাম অবস্থায় যেসব কাজ করা হারাম নিম্নে সেগুলো সবিস্তারে উল্লেখ করা গেলো ঃ

১. সংগম এবং প্রাসংগিক কার্যক্রম, যেমন চুম্বন, মন্থন ইত্যাদি।

২. আল্লাহ তা'আলার কোনো নির্দেশ বা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা।

৩. ঝগড়া, লড়াই ও মারামারি করা।

www.bjilibrary.com

৪. সেলাই করা বা গোটা শরীর ঢেকে ফেলে এমন কাপড় চোপড় পরা (পুরুষদের জন্যে) এবং দস্তানা পরা (মহিলাদের জন্যে)।

৫. এমন পোশাক পরা যাতে কোনো সুগন্ধিযুক্ত রং লাগানো হয়েছে।

৬. সুগন্ধি ব্যবহার করা।

৭. তৈল ব্যবহার করা।

৮. মেহেন্দী এবং খেজাব লাগানো।

৯. ফুল বা ঐ জাতীয় কোনো কিছুর ঘ্রাণ নেয়া।

১০. চুল কামানো।

১১. নখ কাটা।

১২ মহিলাদের মুখমন্ডল আবৃত্ত করা।

১৩. পুরুষদের মাথা ঢেকে রাখা।

১৪. বিয়ে করা।

১৫. শিকার করা বা শিকারের পিছে ধাওয়া করা।

১৬. এমন পশু শিকারে সাহায্য করা যার গোশ্‌ত হালাল।

১৭. শিকার তাড়া করা, হত্যা করা, কিংবা ক্রয় বিক্রয় করা।

১৮. বন্য শিকারের গোশ্‌ত খাওয়া।

১৯. শিকার যোগ্য বন্য প্রাণীর ডিম ভাংগা, কিংবা দুধ দোহন করা, অথবা দুধ ক্রয় বিক্রয় করা।

ইহরাম অবস্থায় হারাম এমন কতিপয় কাজের বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিম্নে আলেচিত হলো ঃ

চুল কামানো

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ ط فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْبِهٖ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ـ

"আর তোমরা মাথা কামিয়ো না, যতোক্ষণ না কুরবানী তার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি রোগী অথবা যার মাথায় অসুখ আছে

www.bjilibrary.com

এবং এ কারণে মাথা কামাবে, সে ফিদইয়া হিসেবে রোযা রাখবে, কিংবা দান করবে অথবা কুরবানী করবে।" [আল বাকারা ঃ ১৯৬]

এ আয়াতটি নাযিলের প্রেক্ষাপট বলেছেন কায়াব ইবনে উজরা রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন ঃ আমার মাথায় ভীষণ ব্যথা হচ্ছিল। এমতাবস্থায় আমাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। তখন আমার অবস্থা এমন ছিলো যে মাথার উকুন কপালে চলে এসেছিল। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ

ما كنت ارى ان الجهد قد بلغ منك ما ارى أتجد شاة ؟ الخ

"তোমার কষ্ট যে এতটা বেড়ে গেছে তা তোমাকে দেখার আগে আমি বুঝতে পারিনি। তোমার কি একটি বকরী কুরবানী করবার সামর্থ আছে ? আমি বললাম ঃ 'জী-না।' তখন উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হলো এবং তাতে ফিদইয়া হিসেবে রোযা রাখা, অথবা দান করা কিংবা কুরবানী করার কথা বলা হলো।"

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিন রোযা রাখতে কিংবা ছয়জন মিসকীনকে আহার করাতে বলেছেন।

অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কায়াব ইবনে উজরাকে বলেছিলেন ঃ

لعلك يوذيك هو ام رأسك ؟

"তোমাকে মনে হয় তোমার মাথার এই পোকাগুলোই কষ্ট দিচ্ছে।" তখন কায়াব বললেন ঃ জী-হাঁ ! হে আল্লাহর রাসূল।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او طعام ستة مساكين او انسك شاة -

"মাথার চুল কামিয়ে নাও। তারপর তিন দিন রোযা রেখে দাও, অথবা ছয়জন মিসকীন খাইয়ে দাও, কিংবা একটি বকরী কুরবানী করে দাও।"

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসের আলোকে আলিমগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, ইহরাম অবস্থায় কোনো হাজী বিনা ওযরে তার শরীর বা মাথার

www.bjilibrary.com

একটি চুল বা পশমও কাটাতে পারবে না। অর্থাৎ ইহ্রাম বাঁধার পর মাথার, ঠোঁটের, বগলের, নাকের, কানের, বা নাভীর নিচের কোনো প্রকার চুল বা পশমই কাটতে, কামাতে বা ছিঁড়তে পারবে না।

সুতরাং ভুলে হোক, ইচ্ছাকৃত হোক, কিংবা চুলকাতে গিয়ে হোক, অথবা চিরুনী দিয়ে আঁচড়াতে গিয়ে হোক কোনো চুল বা পশম ছিঁড়ে গেলে সেজন্যে হাজীকে ফিদইয়া দিতে হবে। ফিদইয়া দেয়া তার জন্যে ওয়াজিব।

ইমাম ইবনে কুদামা তাঁর আল মুগনী গ্রন্থে লিখেছেন, কারো চোখের ভ্রু যদি লম্ব হয়ে চোখ ঢেকে রাখে এবং এতে যদি তার অসুবিধা হয়, তবে সেই ভ্রুগুলো কেটে বা কামিয়ে ফেললে তার কারণে ফিদইয়া ওয়াজিব হবে না। অর্থাৎ এটা চুল বা পশম কাটা বা কামানো নয়, বরং এটা কষ্ট দূর করা।

চুল আঁচড়ানো

চুল আঁচড়ালে যেহেতু চুল উঠে যায় এবং ছিঁড়ে যায় সে কারণে কোনো কোনো ফকীহর মতে, ইহরাম অবস্থায় চুল আচঁড়ানো উচিত নয়।

হানাফী এবং মালিকীদের মতে ইহ্রাম অবস্থায় চুল আঁচড়ানো সম্পূর্ণ নিষেধ। শাফেয়ীদের মতে চুল আঁচড়ানো এবং নখ দিয়ে চুলকানো মাকরূহ। কিন্তু কেউ যদি চুলকায়, তার উপর ফিদইয়া ওয়াজিব হবে না। আঁচড়ালে অবশ্যি চুল ছিঁড়বে একথা যদি জানা থাকে, সে ক্ষেত্রে আঁচড়ানো হারাম। তাসত্ত্বেও কেউ যদি আঁচড়ায় তবে ফিদইয়া দেয়া ওয়াজিব।

হাম্বলী মযহাবের অন্যতম ইমাম ইবনে কুদামা তাঁর আল মুগনী গ্রন্থে লিখেছেন, ইহ্রাম অবস্থায় আকৃতি অবয়ব ঠিকঠাক করা, চুলে সিথি কাটা এবং কোনো প্রকার সাজসজ্জার উদ্দেশ্যে আয়না ব্যবহার করা ঠিক নয়। কিন্তু ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল নিজে বলেছেন, আয়না দেখাতে দোষ নেই, তবে সিথি কাটবেনা এবং শরীরের ধূলো ময়লা পরিষ্কার করবেনা। ইমাম আহমদ আরো লিখেছেন যে, সাজসজ্জার উদ্দেশ্যে আয়না দেখবে না। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সাজসজ্জা বলতে কি বুঝাচ্ছেন ? জবাবে তিনি বলেন ঃ যেমন এ উদ্দেশ্যে চুল দেখা যে, এলোমেলো হয়ে থাকলে পরিপাটি করে দেয়া হবে। আতা (র) থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে। এরূপ মতের কারণ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই হাদীস ঃ

www.bjilibrary.com

ان المحرم الا شعث الا غبر

"ইহ্‌রাম অবস্থায় চুল এলোমেলো থাকবে এবং শরীর ধূলো মলিন থাকবে।"

এই হাদীসটির শেষাংশ হলো ঃ

ان الله يباهى باهل عرفة ملائكته فيقول :- يا ملائكته انظروا الى عبادى قد اتونى شعثاء غيراء ضاحين -

"আল্লাহ তা'আলা আরাফায় উপস্থিত হাজীদের নিয়ে গর্ব করবেন। তিনি ফেরেশতাদের ডেকে বলবেন ঃ হে আমার ফেরেশতারা ! আমার এই দাসগুলোকে দেখো, তারা আমার কাছে উস্‌কো খুসকো ধূলো মলিন অবস্থায় উপস্থিত হয়েছে।"

এ কারণেই ইহ্‌রাম অবস্থায় নারী পুরুষ সকলের জন্যেই চুল আঁচড়ানো নিষেধ। কারণ এতে চুল ছিঁড়ে যেতে পারে আর চুল ছিঁড়ে গেলে ফিদইয়া দেয়া ওয়াজিব।

চুল ছিঁড়ার ফিদইয়া

* শাফেয়ীদের মতে, কেউ যদি ইহ্‌রাম অবস্থায় একটি চুল ছিঁড়লো, তবে তার উপর এক মুদ্দ গম ফিদইয়া দেয়া ওয়াজিব। দুইটি ছিঁড়লে দুই মুদ্দ আর অর্ধেকের হুকুম একটির মতো।

কেউ যদি তিনটির চাইতে বেশী চুল ছিঁড়ে, তবে সে কুরবানীর উপযোগী একটি বকরী যবাই করবে, অথবা ছয়জন মিসকীন খাওয়াবে, কিংবা তিন দিন রোযা রাখবে।

কেবল ইচ্ছাকৃতভাবে চুল ছিঁড়লেই যে ফিদইয়া দিতে হবে তা নয়, বরং অনিচ্ছাকৃত ছিঁড়লেও দিতে হবে।

* হাম্বলীদের মতে, পুরো একটি চুল বা আংশিক ছিঁড়লে এক মুদ্দ গম অথবা অর্ধ সা' যব ফিদইয়া দিতে হবে। চুলের সংখ্যা বেশী হলে অনুরূপ হারে ফিদইয়া বেশী হবে। তিনটি চুল ছেঁড়া পর্যন্ত এই হুকুম।

* হানাফীদের মতে, মাথা বা দাঁড়ির এক চতুর্থাংশ কামানো হলে অর্ধ সা' গম বা তার মূল্য ফিদইয়া দিতে হবে। যদি এক-চতুর্থাংশের বেশী মাথা

www.bjilibrary.com

বা দাঁড়ি কামানো হয়ে থাকে, কিংবা ঘাড়ের লোম, অথবা নাভির নীচের লোম, কিংবা দুই বা এক বগলের লোম কামানো হয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে মুহরেমের উপর একটি পশু কুরবানী করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। তবে ওয়াজিব হবে তখন যখন বিনা ওজরে কামিয়ে থাকে। কিন্তু যদি ওজরবশত কামিয়ে থাকে তবে নিম্নোক্ত তিনটি বিকল্পের যে কোনো একটি করতে হবে ঃ

১. হয়তো একটি বকরী যবাই করবে,

২. নয়তো তিনদিন রোযা রাখবে,

৩. অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে।

* মালিকীদের মতে, বারটি পর্যন্ত চুল ছিঁড়লে বা কামিয়ে ফেললে যে ফিদইয়া ওয়াজিব হয় তার পরিমাণ অর্ধ সা' গম বা তার মূল্য।

ইহ্‌রাম অবস্থায় বিয়ে করা

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لا يَنْكِحِ الْمحرم وَلَا يُنْكَحُ ولا يخطب-

"ইহ্‌রাম অবস্থায় বিয়ে করবে না, বিয়ে দেবে না এবং বাগদান করবে না।" [সহীহ বুখারী ব্যতীত সমস্ত জামে' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তবে জামে' তিরমিযীতে 'বাগদান করবে না' শব্দটি নেই।]

এ হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, ইহ্‌রাম অবস্থায় বিয়ে শাদী নাজায়েয। তাসত্ত্বেও এ ব্যাপারে আলিমদের মতভেদ আছে। একদল আলিম ইহ্‌রাম অবস্থায় বিয়ে শাদীর বিপক্ষে মত দিয়েছেন, কিন্তু আরেক দল আলিম মত দিয়েছেন পক্ষে।

বিপক্ষের বক্তব্য

* শাফেয়ী, মালিকী ও হাম্বলী আলিমগণ, ইমাম লায়েছ ও আওযায়ীর মতে, ইহ্‌রাম অবস্থায় কোনো হাজীর বিয়ে করা এবং অপরকে বিয়ে করানো হারাম। উমর, আলী, আবদুল্লাহ ইবনে উমর এবং যায়েদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুমেরও এটাই মত। তাদের দলিল হলো উপরে বর্ণিত হাদীসটি। তাদের ধারণা, কেউ যদি ইহ্‌রাম অবস্থায় বিয়ে করেও, তবে সে বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে।

www.bjilibrary.com

* শাফেয়ী মযহাবের অন্যতম ইমাম নববী লিখেছেন ঃ "জেনে রাখো, ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করা এবং করানো যে নিষেধ করা হয়েছে তার অর্থ একাজ করা এবং করানো হারাম। কেউ যদি ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করে, তবে সে বিয়ে কার্যকর হবেনা। চাই সে পুরুষ হিসেবে করুক কিংবা মহিলা হিসেবে তাকে বিয়ে দেয়া হোক অথবা নিজে অলী বা উকীল হয়ে অপর কাউকেও বিয়ে দিক এ সকল অবস্থাতেই বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে। এমনকি বর, কন্যা এবং উকীল নিজেরা যদি ইহরাম অবস্থায় নাও থাকে অথচ কোনো ইহরাম অবস্থার লোককে বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্যে উকীল বা ঘটক ধরে থাকে, সে অবস্থায়ও বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে।

* ইমাম মালিক তাঁর মু'আত্তা এবং দারুকুতনী তাঁর সুনান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জনৈক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর বিয়ে ভেংগে দেন। কারণ তারা ইহরাম অবস্থায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল।

* হাম্বলী মযহাবের অন্যতম ইমাম ইবনে কুদামা তাঁর আল মুগনী গ্রন্থে লিখেছেন, যখনই ইহরাম অবস্থায় একজন পুরুষ ও একজন মহিলা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে কিংবা তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করানো হবে, সে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে বর কনে দু'জনই ইহরাম অবস্থায় থাকুক কিংবা একজন, তাতে কিছু যায় আসেনা। বিবাহ তাদের ভেংগেই যাবে। কেননা এ অবস্থায় তো বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই এ বিয়ে সঠিক হতে পারেনা।

ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করা যারা জায়েয মনে করেন

হানাফী আলিমগণ এবং ইমাম সুফিয়ান সওরী এ প্রসংগে উপরোক্ত তিন মযহাবের চাইতে ভিন্নমত পোষণ করেন। হানাফীদের মতে ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করা জায়েয। কেননা, ইহরামের কারণে তো মহিলারা বিবাহের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেনা। বরঞ্চ ইহরাম কেবল সহবাস থেকেই বিরত রাখে। এটা ঠিক হায়েয, নিফাস কিংবা যিহারের সাথে তুলনীয়। এসব অবস্থায় যেমন সহবাস বৈধ নয়, তেমনি ইহরাম অবস্থায়ও সহবাস বৈধ নয়। তাই ইহরাম বিবাহের জন্যে প্রতিবন্ধক নয়, প্রতিবন্ধক সহবাসের জন্যে।

সুতরাং হানাফীদের মতে, ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করাও যায় এবং করানোও যায়। হানাফীরা তাদের এমতের পক্ষে ঐ হাদীসটিকে দলিল

www.bjilibrary.com

হিসাবে গ্রহণ করেছেন, যাতে বলা হয়েছে ঃ "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামের অবস্থায় মাইমুনা রাদিয়াল্লাহ্ আনহাকে বিয়ে করেছেন।"

অধিকাংশ আলিম হানাফীদের এই দলিল নিম্নোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা খন্ডন করে দিয়েছেন ঃ

১. আবু রাফে' রাদিয়াল্লাহ্ আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মাইমুনা রাদিয়াল্লাহ্ আনহাকে বিয়ে করেন তখন তিনি হালাল ছিলেন, অর্থাৎ ইহরাম খুলে ফেলেছিলেন। আবু রাফে' আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ এবং মাইমুনার মাঝে বিবাহের পয়গাম বাহক ছিলাম আমি নিজে। [আবু দাউদ, তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী এটিকে হাসান হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন।]

২. সুনানে আবু দাউদে উম্মুল মু'মিনীন মাইমুনা রাদিয়াল্লাহ্ আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাকে বিয়ে করেন, তখন আমরা দু'জনেই ইহরাম খুলে ফেলেছিলাম। তিনি যখন আমার সাথে বাসর যাপন করেন, তখনো তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন না।

তিরমিযীতে উল্লেখ হয়েছে যে, মাইমুনা রাদিয়াল্লাহ্ আনহার ইন্তেকাল হয়েছে, 'সারফ' নামক স্থানে আর তাঁকে সেই গম্বুজেই দাফন করা হয়, যেটি ওখানে নির্মাণ করা হয়েছিল।

'সারফ' তানয়ীমের কাছাকাছি একটি জায়গার নাম। আর তানয়ীম মক্কার বেশ নিকটবর্তী স্থান এবং হেরেমের সীমার খুব কাছে, তবে হেরেমের সীমার বাইরে।

উল্লেখিত হাদীস দু'টি থেকে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মাইমুনাকে বিয়ে করেন তার আগেই তিনি ইহরাম খুলে ফেলেছিলেন এবং বাসর রাত্রেও তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেননা, বরং আগেই ইহরাম খুলে ফেলেছিলেন।

ইবনে কুদামা তাঁর আল মুগনী গ্রন্থে লিখেছেন, আসলে এ ব্যাপারে আবু রাফে' এবং মাইমুনা রাদিয়াল্লাহ্ আনহুমার বক্তব্যই অধিক গ্রহণযোগ্য।

www.bjilibrary.com

কেননা ব্যাপারটির সাথে তারা দু'জনই জড়িত। কিন্তু ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু যে বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরেম অবস্থায় বিয়ে করেছেন, একথাটা তিনি ভুল বলেছেন। আর তাঁর বয়স যেহেতু তখন খুব কম ছিলো, সে জন্যে হয়তো তিনি প্রকৃত ব্যাপার বুঝে উঠতে পারেননি।

সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহ) ইবনে আব্বাসের বক্তব্য অস্বীকার করে বলেছেন ঃ ইবনে আব্বাস আসলে ভ্রম করেছেন। কেননা মূলত ব্যাপার হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উম্মুল মু'মিনীন মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করেন, তার আগেই তিনি ইহরাম খুলে ফেলেছিলেন। তাই ইবনে আব্বাসের বর্ণিত হাদীসটি এ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া ইবনে আব্বাস যে বলেছেন, 'তখন তিনি মুহরেম ছিলেন' এর অন্য অর্থও হতে পারে। এর অর্থ এও হতে পারে যে তখন তিনি হেরেমে অবস্থান করছিলেন, কিংবা তিনি হারাম মাসে (যিলহজ্জ) বিয়ে করেছেন। যেমন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে ঃ

قتلوا عثمان بن عفان الخليفة محرما –

'তারা খলীফা উসমানকে মুহরেম অবস্থায় হত্যা করেছে।'

'মুহরেম' শব্দটি দ্বারা বাহ্যত এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি ইহরাম বেঁধেছেন। অথচ হযরত উসমানের ব্যাপারে ঘটনা তা ছিল না। তিনি তো ইহরাম অবস্থায় নিহত হননি। বরং নিহত হয়েছেন হারাম মাসে। তাই এখানে মুহরেম' বলতে হারাম মাসে অবস্থানকারী বুঝনো হয়েছে।

ইবনে রুশ লিখেছেন এই বিপরীত ধরনের দুই হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় এভাবে যে, যে হাদীসের ইহরাম অবস্থায় বিয়ে নিষেধ করা হয়েছে, সেই নিষেধ দ্বারা হারাম বুঝানো হয়নি, বরং মাকরূহ ধরনের নিষেধ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বুঝানো হয়েছে যে, ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করা এবং করানো মাকরূহ। আর যে হাদীসে জায়েয বলা হয়েছে, তার অর্থ জায়েয তবে মাকরূহ, অর্থাৎ মাকরূহর সাথে জায়েয।

তবে আমাদের দৃষ্টিতে এ ক্ষেত্রে সঠিক মত হলো সেটা যেটা অধিকাংশ আলিম বলেছেন। অর্থাৎ ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করা এবং করানো উভয়টাই নাজায়েয।

www.bjilibrary.com

ইহরাম অবস্থায় বিয়ের সাক্ষী হওয়া

ইমাম নববী লিখেছেন, ইহরাম অবস্থায় যেমন নিজে বিয়ে করা নিষেধ, তেমনি অপর কারো বিয়ের সাক্ষী হওয়াও জায়েয নয়। যাদের বিয়ের সাক্ষী হবে সেই বর কনে মুহরেম না হলেও জায়েয নয়। কোনো কোনো আলিমের মতে তো মুহরেম যদি বিয়ের সাক্ষী হয় তবে সে বিয়ে শুদ্ধই হবে না। কেননা সাক্ষী বিয়ের একটি রুকন। আর যেহেতু মুহরেম সাক্ষী হতে পারে না, তাই সাক্ষী বিহীন বিয়ে মূলত অনুষ্ঠিতই হয়নি।

তবে অধিকাংশ আলিমের মতে বিয়ে শুদ্ধ হবে। আর এটাই সঠিক মত।

ইহরাম অবস্থায় বাগদান

উপরে যা কিছু আলোচনা হলো, তাছিলো ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করা এবং করানো সম্পর্কে। এখন প্রশ্ন হলো ইহরাম অবস্থায় বাগদান করা যায় কি না?

ইমাম নববী লিখেছেন, হাদীসে যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন 'এবং বাগদান করবে না' এর দ্বারা তিনি এ কাজকে হারাম বলে বুঝাননি বরং ইহরামের সময় বাগদান করা মাকরূহ তানযিহী।

ইমাম ইবনে কুদামা আল মুগনী গ্রন্থে লিখেছেন, ইহরাম অবস্থায় নারী কিংবা পুরুষ উভয়ের জন্যেই বাগদান করা মাকরূহ। তাছাড়া কোনো মুহরেম যদি গায়রে মুহরেমদের বাগদান করায়, তবে সেটাও মাকরূহ।

ইহরাম অবস্থায় তৈল ব্যবহার

ইহরাম অবস্থায় পুরুষ বা মহিলার জন্যে তৈল ব্যবহার করা কি জায়েয? এ প্রসঙ্গে আলিম ও ইমামগণের মতামত নিম্নে উল্লেখ করা গেলো :

* হানাফী মযহাব : হানাফী আলিমদের মতে, ইহরাম অবস্থায় গায়ে তেল ব্যবহার করা বা শীরা [ঘনরস বা কোনো বস্তুর নির্যাস] মাখা হারাম। কেননা, এগুলো সাজসজ্জার জন্যে ব্যবহার হয়ে থাকে, অথচ হাজীকে ইহরাম অবস্থায় উস্কো খুস্কো এবং ধূলো মলিন থাকতে হয়। যেমন আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

www.bjilibrary.com

ان اللّه يبا هى با هل عرفات اهل السماء فيقول لهم انظروا الى عبادى جاء وفى شعشاء غبراء -

"আল্লাহ্‌ তা'আলা আরাফায় উপস্থিত হাজীদের নিয়ে গর্ব করেন। তিনি ফেরেশতাদের ডেকে বলেন ঃ আমার এই দাসগুলোর দিকে চেয়ে দেখো ! তারা আমার কাছে উসকো খুশকো ধূলোমলিন অবস্থায় উপস্থিত হয়েছে।" [বায়হাকী]

এ হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, হাজীরা ইহ্‌রাম অবস্থায় উস্‌কো খুশ্‌কো ধূলোমলিন থাকুক, এটাই আল্লাহ্‌ পসন্দ করেন।

হানাফী আলিমরা আরো বলেন, যেসব জিনিস শরীরে ব্যবহার করা হয়, সে গুলো তিন প্রকারের হয়ে থাকে ঃ

১. সেসব জিনিস যেগুলো কেবল সুগন্ধির জন্যে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং কেবল সুগন্ধির উদ্দেশ্যেই তৈরী করা হয়ে থাকে। যেমন ঃ মিশ্‌ক, কর্পূর, আম্বর এবং এ ধরনের অন্যান্য সুগন্ধি জিনিস। এসব জিনিস ইহ্‌রাম অবস্থায় কোনোভাবেই ব্যবহার করা জায়েয নয়।

২. কিছু জিনিস এমন আছে যেগুলো মূলত সুগন্ধি নয় এবং সেগুলোকে সুগন্ধি বলাও যায়না আর সুগন্ধি হিসেবেও সেগুলোকে ব্যবহার করা হয়না। যেমন চর্বি। হাজীরা ইহ্‌রাম অবস্থায় চর্বি গায়ে বা মাথায় মালিশ করতে পারে। এরূপ জিনিস ব্যবহারে কোনো গুনাহ্‌ নেই। এবং এর জন্যে ফিদইয়াও দিতে হয়না।

৩. আরেক ধরনের জিনিস হলো সেগুলো, যেগুলো স্বয়ং সুগন্ধি নয়, তবে সুগন্ধির ভিত্তি হতে পারে। এসব জিনিস কখনো সুগন্ধি, কখনো তেল এবং কখনো ঔষধ হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন রওগনে যয়তুন (যয়তুন তেল)। তাই এসব জিনিস যদি সুগন্ধি বা তেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তবে তার হুকুম তাই হবে, যা সুগন্ধি ব্যবহারের হুকুম। অর্থাৎ ইহ্‌রাম অবস্থায় তা ব্যবহার করা জায়েয নয়। কিন্তু কেউ যদি এগুলো ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করতে চায় বাইরে অর্থাৎ মালিশ করা বা মাখা এবং ভিতরে অর্থাৎ খাওয়া উভয়টাই জায়েয।

* **মালিকী মযহাব ঃ** মালিকীদের মতে ইহ্‌রাম অবস্থায় চুলে, সারা শরীরে এবং শরীরের কিছু অংশে তেল ব্যবহার করা হারাম। যেকোনো

www.bjilibrary.com

ধরনের তেলই হোক না এবং তাতে সুগন্ধিও না-ই থাকুক না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না। সুতরাং কেউ যদি ইহরাম অবস্থায় মাথায় বা শরীরে তেল ব্যবহার করে, তবে তার উপর ফিদইয়া দেয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ যদি রোগের চিকিৎসা হিসেবে সুগন্ধি বিহীন কোনো তেল ব্যবহার করে, তবে তার ফিদইয়া দিতে হবেনা। আর সেই রোগ শরীরের যেকোনো স্থানেই হোকনা কেন তাতে কিছুই যায় আসেনা। রোগের নিরাময় হিসেবে ব্যবহার করা জায়েয।

*** শাফেয়ী মযহাব ঃ** শাফেয়ীদের মতে ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধিযুক্ত তেল ব্যবহার করা হারাম। এছাড়া সকল প্রকার তৈল মাথার চুল ছাড়া শরীরের যেকোনো অংশে ব্যবহার করা জায়েয। তবে প্রয়োজন দেখা দিলে মাথার চুলেও লাগাতে পারে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি বিহীন তেল ব্যবহার করতেন।" [মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী, তিরমিযী]

*** হাম্বলী মযহাব ঃ** হাম্বলী মযহাবের মতে, ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধিযুক্ত তৈল গোটা শরীরে কিংবা শরীরের কোনো অংশে লাগানো হারাম। তবে সুগন্ধি বিহীন তৈল মাথার চুল এবং মুখমন্ডলেও ব্যবহার করা জায়েয।

আলোচনার সারকথা

এ যাবত আমরা বিভিন্ন মযহাবের মতামত বিস্তারিতভাবে তুলে ধরলাম। তবে বিভিন্ন মযহাবের মতামতের সারকথা হলো ঃ

সবগুলো মযহাবেই এ ব্যাপারে একমত যে, ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধিযুক্ত তৈল ব্যবহার করা নাজায়েয। কেননা, ইহরামে অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এ ব্যাপারেও সব মযহাব একমত যে, ইহরাম অবস্থায় ঔষধ হিসেবে এমন জিনিস ব্যবহার করা জায়েয, যাতে সুগন্ধি নেই।

যেসব ব্যাপারে মতভেদ রয়ে গেছে, সেগুলো হলো ঃ

ঔষধ ছাড়া সুগন্ধি বিহীন তৈল ব্যবহার করা জায়েয কি না ? এ ক্ষেত্রে কেউ কেউ সাধারণভাবে হারাম বলেছেন। যেমন মালিকী মযহাব। কেউ কেউ সাধারণভাবে জায়েয বলেছেন। যেমন হাম্বলী মযহাব। কেউ কেউ বলেছেন

www.bjilibrary.com

মাথা এবং মুখমন্ডল ছাড়া গোটা শরীরে ব্যবহার করা জায়েয। কেউ কেউ এ প্রসংগে শ্রেণী বিভাগ করেছেন। তাদের মতে যেসব জিনিস সুগন্ধির ভিত্তি রূপে কাজ করে, সেগুলো ব্যবহার করা নাজায়েয। আর যেগুলো থেকে সুগন্ধির কাজ নেয়া যায়না সেগুলো সর্বাবস্থায় জায়েয। এমত হানাফীদের।

এ মতভেদ ইহরাম অবস্থায় স্বয়ং তৈল ব্যবহারটা জায়েয কি জায়েয নয়, তা নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়নি। বরং মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে সাজসজ্জা করাকে কেন্দ্র করে। ইহরাম অবস্থায় যেহেতু সাজসজ্জা করাটা নিষেধ, তাই তৈল ব্যবহার সাজসজ্জার মধ্যে পড়ে কি পড়েনা তাই নিয়েই মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে।

সারকথা হলো, কোনো মহিলা যদি ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি বিহীন তেল শরীরের কোনো অংশে মেখে নেয়, তবে তাতে গুনাহও হবেনা এবং এ কারণে ফিদইয়াও দিতে হবেনা। তবে মাথার চুলে সুগন্ধি বিহীন তৈলও না লাগানোই উত্তম। কারণ তৈল লাগানোর সময় চুল ছিঁড়ে যাবার আশংকা থাকে।

ইহরাম অবস্থায় সুরমা লাগানো

এ প্রসংগে প্রথমে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা গেলো ঃ

(১) নবীহা ইবনে ওহাব বর্ণনা করেছেন যে, উমর ইবনে উবায়দুল্লাহর চোখে ব্যথা দেখা দেয়। আমরা রাওহা নামক স্থানে পৌঁছুলে তাঁর ব্যথা চরম আকার ধারণ করে। ফলে তারা লোক পাঠিয়ে আব্বান ইবনে উসমানের কাছে জানতে চান, এমতাবস্থায় কী করা যেতে পারে ? আব্বান ইবনে উসমান বলে পাঠান ঃ তার চোখে মুসব্বরের (এক প্রকার পাহাড়ী গাছ) ঘনরস লাগানো হোক। কারণ উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুহরেমের্র চোখে মুসব্বরের লেপন লাগিয়ে ছিলেন। [মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, দারমী]

(২) নবীহা ইবনে ওহাব বলেছেন, উমর ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে মা'মারের চোখে বেদনা ছিল। তাই তিনি চোখে সুরমা লাগাবার ইচ্ছা করেন। কিন্তু আব্বান ইবনে উসমান তাকে সুরমা লাগাতে নিষেধ করেন। তিনি তার চোখে মুসব্বরের লেপন লাগাবার পরামর্শ দেন এবং উসমান ইবনে আফফানের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটিই করেছিলেন। [মুসলিম]

www.bjilibrary.com

(৩) শামীসা বলেছেন ঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় আমার চোখে ব্যথা আরম্ভ হয়। ফলে আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে চোখে সুরমা লাগাতে পারবো কিনা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ 'খনীজ সুরমা ছাড়া যা কিছু চাও চোখে লাগাতে পারো।' অথবা তিনি বলেছিলেন ঃ 'কালো সুরমা ছাড়া যে সুরমাই চাও লাগাতে পারো। তবে কালো সুরমা লাগানোটাও হারাম নয়। কিন্তু সুরমা একটা সাজ। আর ইহরাম অবস্থায় আমার মতে সাজ সজ্জা করাটা মাকরূহ।' অতপর তিনি বললেন ঃ 'তুমি ইচ্ছে করলে চোখে মুসব্বর লাগাতে পারো।' কিন্তু আমি মুসব্বর লাগাইনি। [বায়হাকী]

(৪) নাফে' বলেছেন, ইহ্‌রাম অবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার চোখে ব্যথা আরম্ভ হয়। তিনি চোখে কয়েক ফোটা মুসব্বরের রস ঢেলে দিয়ে বলেন ঃ মুহরেমের চোখে যদি ব্যথা হয়, তবে যেকোনো ধরনের সুরমা সে চোখে লাগাতে পারে। তবে সুরমা হিসেবে সুগন্ধিযুক্ত জিনিস ব্যবহার করতে পারেনা। আর ব্যথা না হলে চোখে সুরমাও লাগাতে পারেনা।' [বায়হাকী]

উপরোক্ত হাদীসগুলোর ভিত্তিতে আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ঔষধ হিসেবে সুরমা ব্যবহার করা জায়েয। তবে সাজসজ্জা হিসেবে ব্যবহার করা জায়েয নয়। এটা বিশেষ করে হানাফীদের মত। কোনো মুহরেম যদি সুগন্ধিযুক্ত সুরমা ব্যবহার করে তবে তার উপর ফিদইয়া দেয়া ওয়াজিব হবে। এমনকি ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করলেও। সুগন্ধি বিহীন জিনিসও চোখে বিনা প্রয়োজনে লাগানো নিষেধ। কেননা এগুলো সাজসজ্জার মধ্যে গণ্য হয়। তবে এই নিষেধাজ্ঞা মাকরূহ তানযীহি পর্যায়ের। তাই এতে ফিদইয়া ওয়াজিব হয় না।

ইমাম মালিক বলেছেন, মুহরেম যদি প্রচন্ড গরমের কারণে চোখে খনিজ কালো সুরমা বা অনুরূপ কোনো জিনিস লাগায় তবে তাতে কোনো দোষ নেই।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, ইহ্‌রাম অবস্থায় হাজীরা সুরমা লাগাতে পারে। তবে শর্ত হলো, উদ্দেশ্য যেনো সাজসজ্জা করা না হয়। ইমামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, পুরুষ মহিলা উভয়ই কি ব্যবহার করতে পারে? জবাবে তিনি বলেন ঃ হাঁ উভয়ই পারে।

যারা বলেন, ইহ্‌রাম অবস্থায় সুরমা লাগানো মাকরূহ, তাদের দলিল হলো এই যে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়েমেন থেকে এসে দেখেন ফাতিমা

www.bjilibrary.com

রাদিয়াল্লাহু আনহা ইহরাম খুলে ফেলেছেন, রংগীন কাপড় পরে নিয়েছেন এবং চোখে সুরমা লাগিয়ে নিয়েছেন। এটা দেখে আলী অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এতে ফাতিমা বললেন ঃ আমাকে এমনটি করার অনুমতি স্বয়ং আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান দিয়েছেন। আলী বিষয়টি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ ফাতিমা সত্য বলেছে। [সহীহ মুসলিম]

এ হাদীস থেকে জানা যায়, ইহরাম খোলার পূর্বে সুরমা লাগানো মানা। এ কারণেই আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তা অপসন্দ করেছিলেন। কিন্তু ফাতিমা যেহেতু ইহরাম খুলে ফেলেছিলেন, সে কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সুরমা লাগাতে এবং রংগীন কাপড় পরতে অনুমতি প্রদান করেন।

আল্লামা খারকী লিখেছেন, ইহরাম অবস্থায় যেনো মহিলারা কালো সুরমা না লাগায়। কেননা, ইহরাম অবস্থায় কালো সুরমা লাগানো নারী পুরুষ উভয়ের জন্যেই মাকরূহ। তবে বিশেষ করে মহিলাদের জন্যে মাকরূহ। কেননা সুরমা মহিলাদের জন্যে বিশেষভাবে একটি সাজ।

ইবনে কুদামা লিখেছেন, ইহরাম অবস্থায় কালো খনিজ সুরমা লাগানো মাকরূহ। কিন্তু ব্যবহার করলে ফিদইয়া দেয়া ওয়াজিব হয়ে পড়ে না। আমাদের জানা মতে এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই।

ইমাম শাফেয়ী লিখেছেন, মুহরেম বা মুহরেমা যদি সুরমা লাগিয়ে ফেলে, তবে তাদেরকে ফিদইয়া দিতে হবে বলে অন্তত আমি জানিনা।

মুজাহিদ বলেছেন, সুরমা একপ্রকার সাজ।

সারকথা হলো, ইহরাম অবস্থায় চিকিৎসার উদ্দেশ্যে সুরমা ব্যবহার করা জায়েয। আর উদ্দেশ্য যদি চিকিৎসা না হয় তবে নাজায়েয। অর্থাৎ মাকরূহ। কেউ যদি সুগন্ধিযুক্ত সুরমা ব্যবহার করে, তবে তার জন্যে ফিদইয়া দেয়া ওয়াজিব এমনকি ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করলেও।

---

www.bjilibrary.com

৩৬. ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস

মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ط (البقرة -١٩٧)

"হজ্জের মাস সকলেরই জানা। যে ব্যক্তি এ নির্দিষ্ট মাসগুলোতে হজ্জের নিয়ত করবে, তাকে সতর্ক থাকতে হবে যেনো হজ্জের সময় তার দ্বারা কোনো জৈবিক কামনার কাজ, কোনো কুকর্ম এবং কোনো লড়াই ঝগড়া সংঘটিত না হয়।" [আল বাকারা ঃ ১৯৭]

ইহরাম অবস্থায় যৌনসংগম এবং (সংগম পূর্ব) শৃংগার ইত্যাদি যে অকাট্যভাবে হারাম এ আয়াত থেকে তা স্পষ্টভাবে বুঝা গেলো। হজ্জের সময় যৌনসংগম সেইসব বড় বড় অপরাধের একটি যেগুলো হজ্জকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে দেয়। কেউ যদি এমনটি করে ফেলে তার যে জরিমানা তাও অত্যন্ত কঠিন। এর ফলে উট কুরবানী অথবা পুনরায় হজ্জ করতে হয়।

হজ্জ আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের একটি নিয়ম। সুতরাং এই মহান ইবাদত পালন কালে সংগম শৃংগারের মত আল্লাহর নিষেধ করা কোনো কাজ করে হজ্জকে বিনষ্ট করা কোনো হাজীরই উচিত নয়।

ইবনুল মুনযির লিখেছেন, এ ব্যাপারে সমস্ত আলিম একমত যে, ইহরাম অবস্থায় সংগম ব্যতীত এমন আর কোনো কাজ নেই যেটি সরাসরি হজ্জকে ফাসিদ করে দেয়।

ইবনে রুশদ লিখেছেন, এ ব্যাপারে সমস্ত উলামা একমত যে, কেউ ইহরাম বেঁধে বাইতুল্লাহর হজ্জ করবার নিয়ত করার সাথে সাথে তার জন্যে সহবাস হারাম হয়ে যায়।

সংগম করলে হজ্জ এবং উমরা উভয়টিই ফাসিদ হয়ে যায়। এ প্রসংগে বিশুদ্ধ মত হলো, কেউ ইচ্ছে করে সংগম করুক কিংবা ভুল করে, কিংবা

www.bjilibrary.com

ইহ্‌রাম অবস্থায় যে সংগম করা হারাম তা জেনে সংগম করুক বা না জেনে, সর্বাবস্থায়ই সংগম দ্বারা হজ্জ এবং উমরা উভয়টাই ফাসিদ ও বাতিল হয়ে যাবে।

শৃংগার অর্থাৎ স্পর্শ, মর্দন, চলাঢলি, চুম্বন ইত্যাদির হুকুমও সংগমের মতই।

সংগম নারীর যৌনাংগে করা হোক, কিংবা গুহ্যদ্বারে করা হোক, অথবা কোনো পশুর সাথে কুকর্ম করা হোক, এ সকল অবস্থাতে একই হুকুম। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবুস সওর এবং হাম্বলী মযহাবের এটাই মত।

ইমাম মালিক তাঁর মুআত্তায় বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি হজ্জের জন্যে ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় স্ত্রীসহবাস করে। তার ব্যাপারে উমর, আলী এবং আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুমের নিকট জিজ্ঞেস করা হলে তাঁরা বলেন, 'তারা দু'জনই এ বছর হজ্জের যাবতীয় কাজ পূর্ণ করবে আর আগামী বছর পুনরায় হজ্জ করবে এবং কুরবানী করবে।' হযরত আলী বলেছেন, আগামী বছর যখন তারা হজ্জ করতে আসবে, ইহ্‌রাম বাঁধার পর থেকে ইহ্‌রাম খোলা পর্যন্ত তারা বিচ্ছিন্ন থাকবে, একত্রে থাকবে না।

ইমাম মালিক আরো বর্ণনা করেছেন, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এক ব্যক্তির ব্যাপারে মাস'আলা জিজ্ঞেস করা হয় যে, তাওয়াফে ইফাদা করার পর মিনায় স্ত্রীসহবাস করে ফেলেছিল। জবাবে তিনি তাকে একটি উট কুরবানী করার নির্দেশ দেন।

ইমাম মালিক বর্ণনা করেছেন ঃ এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো যে, আমি এবং আমার স্ত্রী দু'জনই ইহ্‌রাম অবস্থায় সহবাস করে ফেলেছি, এখন আমরা কী করবো ? ইবনে উমর বললেন, তোমাদের হজ্জ নষ্ট হয়ে গেছে। এখন তোমাদের করণীয় হলো, তোমরা অন্যান্য হাজীদের সাথে হজ্জের যাবতীয় কার্য সম্পন্ন করো। অন্যরা যখন ইহ্‌রাম খুলবে, তোমরাও তখন ইহ্‌রাম খুলবে। অতপর তোমরা দু'জনেই আগামী বছর এসে হজ্জ করবে এবং প্রত্যেকে এক একটি করে উট কুরবানী করবে। তবে কুরবানী করা সম্ভব না হলে হজ্জের দিনগুলোতে তিনটি রোযা রাখবে এবং বাড়ী ফিরে গিয়ে সাতটি মোট দশটি রোযা রাখবে। [আল মুগনী]

বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম কুরতবী লিখেছেন, এ ব্যাপারে সমস্ত উলামা একমত যে, উকুফে আরাফার পূর্বে সহবাস করলে হজ্জ নষ্ট হয়ে যাবে। কেউ

www.bjilibrary.com

যদি এমনটি করে তার উপর পরবর্তী বছর এ হজ্জের কাযা করা এবং কুরবানী করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। তবে উকূফে আরাফার পরে সহবাস করলে তার হুকুম কি ? সে ব্যাপারে মতভেদ আছে। এ ক্ষেত্রে কেউ কেউ বলেছেন হজ্জ নষ্ট হয়ে যাবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন হজ্জ নষ্ট হবেনা, তবে ফিদইয়া দেয়া ওয়াজিব।

সহবাস পূর্ব কার্যক্রমের বিধান

সহবাস পূর্ব কার্যক্রম মানে শৃংগার জাতীয় কাজ, যেমন চুম্বন করা, স্পর্শ করা, মৈথুন করা ইত্যাদি। বিখ্যাত মুহাদ্দিস আছরান (র) তাঁর নিজস্ব সনদ এবং আবদুর রহমান ইবনে হারিছের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, উমর ইবনে আবদুল্লাহ্ ইহরাম অবস্থায় আয়েশা বিনতে তালহাকে চুম্বন দেয়। অতপর এ বিষয়টি আলিমদের কাছে পেশ করা হলে তাঁরা সর্বসম্মতভাবে ফায়সালা দেন যে তাকে একটি কুরবানী দিতে হবে।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় তাঁর স্ত্রীকে চুম্বন দিলে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাকে বলেছেন, তোমার হজ্জ নষ্ট হয়ে গেছে।

আতা (র) বলেছেন, কেউ যদি ইহরাম অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু খায় কিংবা কামোত্তেজিত হয়ে স্ত্রীকে স্পর্শ করে, তবে তার উপর একটি পশু কুরবানী করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (র) বলেছেন, ইহরাম অবস্থায় চুমু খেলে লালারস নির্গত হোক বা না হোক একটি পশু কুরবানী করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (র) আরো বলেছেন, কেউ যদি শৃংগার অর্থাৎ সহবাসপূর্ব কোনো কাজ করে ফেলে এবং সহবাস না করে থাকে, তবে তাকে একটি গরু কুরবানী করতে হবে।

হাসান বসরী (র) দাসীর যৌনাংগে হাত বুলিয়েছে এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে ফায়সালা দেন যে, তাকে একটি উট যবেহ করতে হবে।

চুম্বন, কামনাবশত দৃষ্টি নিক্ষেপ এবং সহবাস পূর্ব অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম ইহরাম অবস্থায় যদি কেউ করে ফেলে, তবে তার ব্যাপারে কি হুকুম সে বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন, একটি উট কুরবানী করতে হবে। কেউ বলেছেন উটও কুরবানী করতে হবে এবং হজ্জ/উমরাও কাযা করতে হবে। কেউ বলেছেন একটি বকরী যবেহ করাই যথেষ্ট।

www.bjilibrary.com

হজ্জের কার্যক্রম ও মানাসিক

হজ্জের কতিপয় আরকান (ফরয বিধান), কতিপয় ওয়াজিব ও সুন্নত কাজ রয়েছে। হজ্জের রুকন (ফরয বিধান) চারটি ঃ

১. ইহরাম বাঁধা,

২. তাওয়াফ [তাওয়াফে ইফাদা কিংবা তাওয়াফে রুকন]

৩. সায়ী [সাফা ও মারওয়ার মাঝে দৌড়াদৌড়ি]

৪. উকূফে আরাফা [আরাফায় অবস্থান]

তবে এ ক্ষেত্রে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারো কারো মতে হজ্জে রুকন মাত্র দু'টি। আবার কেউ কেউ এ চারটি ছাড়াও আরো দু'টি কাজকে রুকনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এছাড়া হজ্জের কিছু ওয়াজিব কাজও আছে। সেগুলোর ক্ষেত্রেও ফকীহদের মধ্যে মতভেদ আছে। মতভেদ হলো কোন্‌টি রুকন আর কোন্‌টি ওয়াজিব, তা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে। একটি আমলকে কেউ কেউ বলেছেন রুকন, আবার কেউ কেউ বলেছেন ওয়াজিব। ঠিক তেমনি আরেকটি আমলকে কেউ কেউ বলেছেন ওয়াজিব। কিন্তু অন্যরা বলেছেন রুকন। আমরা এখানে এসব মতভেদ আলোচনা করবোনা। মতভেদ আলোচনার দিকে না গিয়ে ইহরাম বাঁধার পর হাজীকে যেসব কার্যক্রম করতে হয় এখানে আমরা সেগুলোই আলোচনা করবো। আমরা আলোচনা করবো নিম্নোক্ত বিষয়গুলোঃ

১. তাওয়াফ,

২. সায়ী,

৩. উকূফে আরাফা,

৪. মুযদালিফায় অবস্থান,

৫. পাথর নিক্ষেপ,

৬. চুল কাটা,

৭. কুরবানী করা।

তবে আমরা এখানে হজ্জ ও উমরা সংক্রান্ত যাবতীয় বিধিবিধান আলোচনা করবোনা। আমরা আলোচনা করবো বিশেষভাবে মহিলাদের সাথে সম্পর্কিত দিকগুলো।

www.bjilibrary.com

৩৭. তাওয়াফ

হাজীদেরকে আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করতে হবে। বাইতুল্লাহর তাওয়াফ চার প্রকার ঃ

১. তাওয়াফে কুদূম। এ তাওয়াফ সুন্নত।

২. তাওয়াফে ইফাদা। এটি হজ্জের রুকন বা ফরয।

৩. তাওয়াফে বিদা। এ তাওয়াফকে 'তাওয়াফে সদর'ও বলা হয়। এ তাওয়াফ ওয়াজিব।

৪. নফল তাওয়াফ।

তাওয়াফের কিছু শর্ত শরায়েত, কিছু ওয়াজিব ও সুন্নত কাজ আছে। এখানে আমরা এগুলোর একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার পর বিভিন্ন প্রকার তাওয়াফ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

১. পবিত্রতা

তাওয়াফের শর্তসমূহের মধ্যে একটি শর্তহলো পবিত্র অবস্থায় তাওয়াফ করতে হবে। এ প্রসংগে প্রথমেই হাদীস উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

الطواف صلوة الا ان الله تعالى احل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير -

"তাওয়াফ মূলত নামাযই। তবে আল্লাহ তা'আলা এতে কথা বলা বৈধ রেখেছেন। সুতরাং কেউ যদি তাওয়াফ করার সময় কথা বলে, তবে যেনো কেবল ভালো কথাই বলে।"

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিযী এবং দারুকুতনী। হাকিম, ইবনে খাযীমা এবং ইবনে সিকান এটিকে সহীহ হাদীস বলেছেন।

(২) উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এসে দেখেন আমি কাঁদছি। আমার কান্না দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি মাসিক

www.bjilibrary.com

আরম্ভ হয়ে গেছে ? আমি বললাম, 'হাঁ'। তখন তিনি বললেন ঃ انفست ؟ [এতে কান্নার কিছু নেই]

ان هذا شيئ كتبه الله على بنات ادم فاقض ما يقضى الحاج غير ان لا تطوفى بالبيت حتى تغسلى -

"এ জিনিস আল্লাহ্ তা'আলা আদম কন্যাদের সহজাত করে দিয়েছেন। সুতরাং যাও হাজীদের করণীয় সব কাজই করো। তবে গোসল করার আগ পর্যন্ত তাওয়াফ করবেনা। [সহীহ্ মুসলিম]

হাদীস দু'টি থেকে পরিষ্কার হলো, তাওয়াফের জন্যে যেমন নাজাসাতে হাকীকী থেকে পাক হতে হবে, ঠিক তেমনি নাজাসাতে হুকমী থেকেও পাক হতে হবে।[১] উভয় ধরনের পবিত্রতাই তাওয়াফের জন্যে শর্ত।

সুতরাং অযু বিহীন অবস্থায় যেমন তাওয়াফ সহীহ্ হবেনা, তেমনি গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় এবং হায়েয নিফাসের অবস্থায়ও গোসল করে পবিত্র হবার আগ পর্যন্ত তাওয়াফ সহীহ্ হবেনা। একইভাবে কোনো ব্যক্তির শরীর বা পরিধেয়তে নাপাক লেগে থাকলেও তার তাওয়াফ শুদ্ধ হবেনা। এ হলো ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফেয়ীর মত। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলেরও একটি মত অনুরূপ। তাছাড়া অধিকাংশ ফকীহরই মত এটাই। এ প্রসংগে তাঁরা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটিকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। হাদীসটি হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

ان لنفساء و الحائض تغتسل وتحرم و تقضى المناسك كلها غير انها لا تطوف با لبيت حتى تطهر -

"নুফাসা ও ঋতুবতীরা গোসল করে ইহরাম বেঁধে নেবে এবং হজ্জের যাবতীয় মানাসিক পালন করবে। তবে পবিত্র হওয়া ছাড়া বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করবে না।"

---

১. নাজাসাতে হাকীকী হলো সেসব মলময়লা, যাতে মানুষের স্বাভাবিক ঘৃণার উদ্রেক হয়। শরীরে বা কাপড়ে চোপড়ে যেনো তা না লাগে সে ব্যাপারে মানুষ সজাগ থাকে। আর নাজাসাতে হুকমী হলো এমন অবস্থা যা দেখা যায়না, তবে শরীয়া তাকে নাপাক অবস্থা বলে ঘোষণা করে।—অনুবাদক

www.bjilibrary.com

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ, আবু দাউদ এবং তিরমিযী। তিরমিযী এটিকে 'গরীব' হাদীস বলেছেন।

এখানে 'পবিত্র হওয়া' মানে 'গোসল করা' যেমন হযরত আয়েশা বর্ণিত হাদীসে একটু আগেই বলা হয়েছে।

সুতরাং ঋতু বা নিফাসকাল শেষ করে গোসলের মাধ্যমে পবিত্র হবার পূর্ব পর্যন্ত মহিলাদেরকে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

* হানাফী মযহাব ঃ হানাফীদের মতে তাওয়াফের জন্যে নাজাসাতে হুকমী এবং নাজাসাতে হাকীকী থেকে পাক হওয়া শর্ত নয়। তবে অবশ্যই সুন্নতে মুআক্কাদা। কেউ যদি পাক না হয়ে তাওয়াফ করে এবং তার কাপড় চোপড় পুরো নাপাক থাকে তবু তার তাওয়াফ দুরস্ত হবে। তাকে ফিদইয়া দিতে হবেনা। তবে সে সুন্নত পরিত্যাগী বলে গণ্য হবে।

* তাওয়াফের জন্যে পবিত্রতা শর্ত নয় বলে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলেরও একটি মত পাওয়া যায়। তাঁর মতে কেউ যদি বিনা অযুতে তাওয়াফ করে ফেলে, তবে তার তাওয়াফ শুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু ফিদইয়া হিসেবে তাকে একটি বকরী যবাই করতে হবে।

আর কোনো পুরুষ বা মহিলা যদি গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় কিংবা হায়েয বা নিফাসের অবস্থায় বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করে, তবে তার তাওয়াফ দুরস্ত হয়ে যাবে বটে, কিন্তু তাকে পাঁচ বছরের একটি উট ফিদইয়া হিসেবে যবাই করতে হবে। আর মক্কায় থাকা অবস্থায় পুনরায় সে তাওয়াফ করে নেবে। এটি হানাফীদের মত। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলেরও একটি মত এরূপ।

এ আলিমগণ যে হায়েয নিফাস অবস্থায় তাওয়াফ করলে তার জন্যে পাঁচ বছরের একটি উট ফিদইয়া হিসেবে কুরবানী করতে বলেছেন, এটা যে তাওয়াফ সঠিক হয়নি বলে করতে বলেছেন তা নয়। বরং হায়েয নিফাসের অবস্থায় মসজিদে হারামে প্রবেশ করার কারণে এ কুরবানী করতে বলেছেন। কেননা হায়েয নিফাসের অবস্থায় মসজিদে হারামের সীমানায় প্রবেশ করা নিষেধ। তাই এ অবস্থায় কোনো মহিলা তথায় প্রবেশ করলে তার উপর ফিদইয়া হিসেবে পাঁচ বছরের একটি উট কুরবানী করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

মোটকথা হলো, হজ্জের মাস'আলার ক্ষেত্রে ফকীহদের মতামত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দু'টি অবস্থায় ফিদইয়া হিসেবে পাঁচ বছরের উট কুরবানী করার হুকুম পাওয়া যায় ঃ

www.bjilibrary.com

(১) একটি হলো, ইহরাম অবস্থায় সহবাস করলে,

(২) আরেকটি হলো, মসজিদে হারামে হায়েয, নিফাস বা গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় প্রবেশ করলে।

এস্তেহাযার রোগীদের তাওয়াফ

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি, অধিকাংশ ফকীহর মতে হায়েয নিফাসের অবস্থায় অর্থাৎ হায়েয নিফাস থেকে পবিত্র হবার পূর্বে মহিলাদের জন্যে তাওয়াফ করা জায়েয নয়। এখন প্রশ্ন হলো, যেসব মহিলা এস্তেহাযা বা কুরক্তের রোগী তাদের ব্যাপারে কি হুকুম?

এর জবাব হলো, হায়েযের মুদ্দতকালের আগে পরেও রোগের কারণে যাদের রক্ত নির্গত হয়, তাদের জন্যে উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবেনা। সুতরাং যাদের এস্তেহাযার রোগ রয়েছে বা অন্য কোনো আভ্যন্তরীণ কারণে সময়ে অসময়ে যাদের রক্ত নির্গত হয়, সেসব মহিলা এসব অবস্থায় তাওয়াফ করতে পারবে এবং তাদের কোনো ফিদইয়া দিতে হবেনা আর এর জন্যে তারা গুনাহগারও হবেনা।

ইমাম মালিক (র) বর্ণনা করেছেন, জনৈক মহিলা আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার নিকট এসে মাস'আলা জিজ্ঞেস করলো। মহিলা বললো ঃ "আমি তাওয়াফের উদ্দেশ্যে বাইতুল্লাহর দরজায় উপনীত হবার সাথে সাথে আমার রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করলো। সুতরাং আমি ফিরে গেলাম এবং রক্ত বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। রক্ত বন্ধ হবার পর পুনরায় তাওয়াফ করতে এলাম। এবারও মসজিদে হারামের দরজায় পৌছুতেই রক্ত দেখা দিলো।" তার বক্তব্য শুনে ইবনে উমর বললেন ঃ" এটা শয়তানের কর্ম তুমি গিয়ে গোসল করে নাও এবং কাপড়ের টুকরা দিয়ে শক্ত করে পট্টি বেঁধে নিয়ে তাওয়াফ করো।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের বক্তব্যের তাৎপর্য হলো, ঐ মহিলার যে রক্ত আসছিল তা মূলত হায়েয বা নিফাসের রক্ত নয়, বরং কোনো রোগের কারণে সে রক্ত দেখা দিয়েছিল। ফলে তার জন্যে তাওয়াফ করা নিষেধ ছিল না।

২. সতর

তাওয়াফের আরেকটি শর্ত হলো, তাওয়াফ করার সময় যেনো হাজীর শরীরের এমন কোনো অংশ উদোম বা উন্মুক্ত না হয় যা ঢেকে রাখা

www.bjilibrary.com

আবশ্যক। এ শর্তটি আরোপ করেছেন ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং সাধারণ ফকীহগণ।

এ শর্তটির পক্ষে তাদের দলিল হলো আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত একটি হাদীস। আবু হুরাইরা বলেন ঃ "বিদায় হজ্জের পূর্বের হজ্জে, যাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরকে আমীরুল হজ্জ বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন, আবু বকর কুরবানীর ঈদের দিন একটি গ্রুপের সাথে আমাকেও জনগণের মাঝে এ ঘোষণা প্রদানের জন্যে পাঠান ঃ "এ বছরের পর আর কোনো মুশরিক হজ্জ করতে পারবেনা এবং কোনো ব্যক্তি উলংগ অবস্থায় খানায়ে কা'বায় তাওয়াফ করতে পারবেনা।" [সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে নাসায়ী, বায়হাকী]

নামাযে মহিলাদের মুখমন্ডল এবং হাতের তালু ছাড়া গোটা শরীর ঢেকে রাখা ওয়াজিব। আর আগেই বলে এসেছি যে, তাওয়াফ নামাযেরই অনুরূপ। তবে কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলা তাওয়াফে কথাবার্তা বলার অনুমতি দিয়েছেন। সুতরাং যেসব কাজ নামাযের জন্যে শর্ত, সেগুলো তাওয়াফের জন্যেও শর্ত।

ইবনে কুদামা তাঁর আল মুগনী গ্রন্থে লিখেছেন, ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের জন্যে একই সংগে অবশ্য করণীয় দু'টি আমল রয়েছে, যেগুলো বাহ্যত বিরোধপূর্ণ।

১. একটি হলো মাথা ঢেকে রাখার নির্দেশ। আর

২. দ্বিতীয়টি হলো মুখমন্ডল উন্মুক্ত রাখার নির্দেশ।

এখন সমস্যা হলো পুরো মাথা ঢাকতে গেলে মুখমন্ডলেরও কিছু অংশ ঢেকে যায়। আবার পুরো মুখমন্ডল উন্মুক্ত রাখতে গেলে মাথারও কিছু অংশ উন্মুক্ত থেকে যায়। এমতাবস্থায় কোন্ পন্থা অবলম্বন করা উচিত ? আসলে এ ক্ষেত্রে মাথাকে পুরোপুরি ঢেকে নেয়াই উত্তম। কেননা মাথা ঢেকে রাখার বিষয়ে অধিক তাকিদ করা হয়েছে এবং মাথার সতর করা ওয়াজিব। তাছাড়া মাথা ঢেকে রাখা বা উন্মুক্ত রাখার বিষয়টি ইহরামের সাথে জড়িত কোনো বিষয় নয়। সর্বাবস্থায়ই মাথা ঢেকে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইহরামের বাইরেও মাথা উন্মুক্ত করা হারাম। ইহরামের সময়ও তা উন্মুক্ত করতে বলা হয়নি। কেবল মুখমন্ডলই ইহরামের সময় খুলে রাখতে বলা হয়েছে। এ

www.bjilibrary.com

নির্দেশই কেবল ইহ্‌রামের সাথে জড়িত। বরং আমাদের মতে ইহ্‌রামের অবস্থায়ও মুখমন্ডল ঢাকাটা মুবাহ্‌। সুতরাং ইহ্‌রামের সময় পুরো মাথা ঢাকতে গিয়ে যদি মুখমন্ডলেরও কিছু অংশ ঢেকে যায়, তবে এটা খারাপ বা অন্যায় কিছু নয়, বরং একটা উত্তম কাজ।

ইমাম ইবনে কুদামা তাঁর আল মুগনী গ্রন্থে আরো লিখেছেন, ইহ্‌রাম অবস্থায় না থাকলে মহিলাদের জন্যে নিকাব পরে তাওয়াফ করাতে দোষ নেই। কেননা উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিকাব পরে তাওয়াফ করেছেন। ইমাম আতা প্রথম প্রথম নিকাব পরে তাওয়াফ করাকে মাকরূহ মনে করতেন। কিন্তু পরবর্তীতে সে মত পরিবর্তন করেন।

আবু আবদুল্লাহ (র) ইবনে জুরাইজের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আতা (র) ইহ্‌রাম অবস্থায় না থাকলে মহিলাদের জন্যে হাঙ্গামী প্রয়োজনেও নিকাব পরে তাওয়াফ করাকে মাকরূহ মনে করতেন। অতপর আমি তাঁকে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশার নিকাব পরে তাওয়াফ করার ঘটনা শুনাই, যা হাসান ইবনে মুসলিম সুফিয়া বিনতে শাইবার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ ঘটনা শুনে ইমাম আতা তাঁর মত পরিবর্তন করেন।

হানাফীদের মতে, তাওয়াফের সময় মহিলাদের শরীরের সতরযোগ্য অংশগুলো ঢেকে রাখা ওয়াজিব। আর সতরযোগ্য অংশ বলতে সেইসব অংশের কথা বুঝানো হয়েছে, যেগুলো নামাযে ঢেকে রাখা ওয়াজিব। সুতরাং শরীরের যেসব অংশ নামাযে ঢেকে রাখা ওয়াজিব, তাওয়াফের সময় কোনো মহিলার যদি সেরূপ কোন অংশের এক-চতুর্থাংশ উন্মুক্ত হয়ে যায়, তবে সে ওয়াজিব তরক করলো। ফলে পুনরায় তাওয়াফ করা, অথবা ফিদইয়া হিসেবে একটি পশু কুরবানী করা তার উপর ওয়াজিব।

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার। তাহলো, সতর করা অর্থাৎ শরীরের ঢেকে রাখার যোগ্য অংশগুলোর সতর করা (ঢেকে রাখা) মূলত ফরয। কিন্তু এখানে ওয়াজিব বলার কারণ হলো, সতর না করলে তাওয়াফ বাতিল হয়ে যায়না, বরং হয়ে যায়। কিন্তু এমনটি করা গুনাহর কাজ। তাছাড়া এমনটি করলে পুনরায় তাওয়াফ করে নেয়া ওয়াজিব এবং যে ব্যক্তি এমনটি করবে, তার জন্যে ফিদইয়া হিসেবে একটি পশু কুরবানী করা আবশ্যক।

www.bjilibrary.com

তবে সতরযোগ্য অংগের এক-চতুর্থাংশের কম যদি উন্মুক্ত হয়ে থাকে, তাতে কোনো দোষ হবেনা। যেমনটি হয়না নামাযের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ নামাযেও সতরযোগ্য অংগের এক্‌চতুর্থাংশের কম খুলে গিয়ে থাকলে নামায নষ্ট হয়না।

আলোচনার সারকথা হলো, তাওয়াফের সময় মুখমন্ডল এবং হাতের তালু ছাড়া মহিলাদের শরীরের কোনো সতরযোগ্য অংশ যদি উন্মুক্ত থেকে থাকে, যা উন্মুক্ত রাখা জায়েয নয়, তবে পুনরায় তাওয়াফ করা ওয়াজিব। আর কোনো আলিমের মতে তাওয়াফের সময় চেহারা ঢাকাতে দোষ নেই। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে।

ইদ্‌তেবা' প্রসংগ

ইদ্‌তেবা' (اضطباع) মানে হাজীদের ইহরামের চাদরের মধ্যাংশ ডান বগলের নিচে রাখা এবং দুই মাথা বাম ঘাড়ের উপর দিয়ে ফেলে রাখা। সতর প্রসংগে ইদ্‌তেবা'র কথা আলোচনা করা দরকার।

হানাফীদের মতে এবং ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল এবং সাধারণ ফকীহদের দৃষ্টিতে এ পন্থা পুরুষদের জন্যে সুন্নত। এর দলিল একটি হাদীস। ইয়ায়লী ইবনে উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমতাবস্থায় খানায়ে কা'বার তাওয়াফ করেন যে, তাঁর পবিত্র দেহের উপর একটি মাত্র চাদর ছিলো। তিনি সেটিকে এমনভাবে পরে রেখেছিলেন যে, সেটির মধ্যভাগ ছিলো তাঁর ডান বগলের নীচে আর দুই মাথা ছিলো বাম ঘাড়ের উপর।"

এ হাদীসটি মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারমী, বায়হাকী এবং তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এটি সহীহ্ হাদীস।

এ ব্যাপারে সবগুলো বর্ণনারই ঐক্য রয়েছে ইদ্‌তেবা' কেবল পুরুষদের জন্যেই মুস্তাহাব, মহিলাদের জন্যে নয়। এ ক্ষেত্রেও সকল বর্ণনার ঐক্য রয়েছে যে, ইদ্‌তেবা' উমরার তাওয়াফ এবং হজ্জের তাওয়াফসমূহের মধ্যে কেবল একটিতে অর্থাৎ তাওয়াফে কুদূম বা তাওয়াফে ইফাদায় করা সুন্নত।

মোটকথা ইদ্‌তেবা' মহিলাদের জন্যে নয়, পুরুষদের জন্যে করণীয়। কেননা–

www.bjilibrary.com

১. ইদ্‌তেবা'তে ডান ঘাড় উন্মুক্ত রাখতে হয়, অথচ এসব অংগ মহিলাদের জন্যে সতরযোগ্য।

২. তাছাড়া ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের চাদর পরতে হয়না। তারা তাদের স্বাভাবিক পোষাকই পরে।

সুতরাং মহিলাদের জন্যে ইদ্‌তেবার প্রশ্নই উঠেনা। কারণ এমন পোষাক পরা তাদের জন্যে নিষেধ যা দ্বারা সতর করা যায়না। চেহারা এবং হাতের তালু ছাড়া শরীরের কোনো অংশ তাদের জন্যে উন্মুক্ত রাখা বৈধ নয়। একথা আমরা আগেই আলোচনা করে এসেছি। সুতরাং ইদ্‌তেবা' মহিলাদের জন্যে নয়।

৩. মহিলারা 'রমল' করবে না

'রমল' মানে ঘাড় উঁচু করে হ্রস্ব কদমে তীব্র গতিতে চলা। রমল করতে হয় পুরুষদেরকে। মহিলারা রমল করবেনা। পুরুষরা হজ্জ করুক কিংবা উমরা, তাওয়াফে কুদূমের পূর্বে তিন চক্করে রমল করা তাদের জন্যে সুন্নত। রমল দৌড় নয়, দৌড়ের চেয়ে কম। এটা ঘাড় উঁচু করে বীরত্ব প্রকাশ করে চলা, লম্প ঝম্প নয়।

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরে আসওয়াদ থেকে হিজরে আসওয়াদ পর্যন্ত তাওয়াফের তিনটি চক্করে রমল করেছেন। চতুর্থ চক্করে এসে স্বাভাবিকভাবে চলেছেন।" [মুসনাদে আহমদ, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, বায়হাকী]

মহিলাদের জন্যে রমল করা জায়েয নয়। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন "মহিলারা বাইতুল্লাহর তাওয়াফের সময় তীব্রতার সাথে চলবেনা (রমল করবেনা) এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে তীব্র গতিতে সায়ী করবে না।" [বায়হাকী]

ইবনুল মুনযির লিখেছেন, এ বিষয়ে ইজমা (ঐকমত্য) রয়েছে মহিলারা তাওয়াফের সময় রমল করবেনা এবং সাফা মারওয়ায় সায়ী করার সময় তীব্রগতিতে চলবে না আর ইহরাম অবস্থায় ইদ্‌তেবা'ও করবেনা। কারণ এসবই করা হয়ে থাকে শক্তি ও বীরত্ব প্রকাশের জন্যে। আর মহিলাদের শক্তি ও বীরত্ব প্রকাশ করা কাম্য নয়।

www.bjilibrary.com

৪. পালাক্রমে তাওয়াফ করা

আলিমরা এ ব্যাপারে একমত যে, বাইতুল্লাহর খুব নিকটবর্তী হয়ে তাওয়াফ করা সুন্নত। কেননা, নামাযে যতোটা বাইতুল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া যায়, ততোই উত্তম। আর তাওয়াফ নামাযেরই অনুরূপ। সুতরাং তাওয়াফেও বাইতুল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া উত্তম। কিন্তু এই নিকটবর্তী হবার জন্যে শর্ত হলো, এতে যেনো অন্যদের এবং নিজেরও কষ্ট না হয়। সুতরাং নিকটবর্তী হবার চেষ্টা করলে যদি নিজের কষ্ট হয়, কিংবা অন্যদের কষ্ট হয়, তবে দূরে থাকাই উত্তম। তবে এই হুকুম পুরুষদের জন্যে।

মহিলাদের জন্যে মুস্তাহাব হলো, পুরুষদের তাওয়াফের সময় তারা যেনো খানায়ে কা'বার নিকটবর্তী না হয়। বরং তারা পুরুষদের আগে পরে পালাক্রমে তাওয়াফ করবে, যাতে করে পুরুষদের সাথে সংমিশ্রণ না ঘটে।

মহিলাদের জন্যে রাত্রে তাওয়াফ করা মুস্তাহাব। কারণ এ পন্থাই তাদের ও পুরুষদের হিফাযতের জন্যে উত্তম। তাওয়াফের স্থান যখন পুরুষমুক্ত থাকে, তখন মহিলাদের জন্যেও বাইতুল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া মুস্তাহাব, যেমন মুস্তাহাব পুরুষদের জন্যে।

এ মাস'আলার ভিত্তি হলো ইবনে জুরাইজের বর্ণনা। তিনি বলেছেন, হিশাম ইবনে আবদুল মালিক যখন মহিলাদেরকে পুরুষদের সাথে তাওয়াফ করতে নিষেধ করেন, তখন ইমাম আতা তাকে বলেন ঃ 'আপনি কিভাবে মহিলাদেরকে তাওয়াফ থেকে নিষেধ করছেন, অথচ উম্মুল মু'মিনীনগণ পুরুষদের সাথে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন'? এ সময় আমি ইমাম আতাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'উম্মুল মু'মিনীনগণ কি হিজাবের হুকুম নাযিল হবার পূর্বে পুরুষদের সাথে তাওয়াফ করেছেন, নাকি পরে?' জবাবে ইমাম আতা বলেন ঃ 'আমি তো মনে করি হিজাবের হুকুম নাযিল হবার পরেও তারা পুরুষদের সাথে তাওয়াফ করেছেন'। আমি বললাম ঃ 'তাঁরা কেমন করে পুরুষদের সাথে একত্রে তাওয়াফ করেছেন?' আতা বললেন ঃ তারা পুরুষদের সাথে মিলে মিশে তাওয়াফ করতেননা। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা পুরুষদের থেকে পৃথক হয়ে তাওয়াফ করতেন। এভাবে তারা পুরুষদের সংগেই একই সাথে দল বেঁধে তাওয়াফ করতেননা, পৃথক হয়ে করতেন, পুরুষদের সাথে তাদের সংমিশ্রণ ঘটতোনা। একবার এক মহিলা হযরত আয়েশাকে বলেন ঃ 'হে উম্মুল মু'মিনীন! আসুন হিজরে আসওয়াদে গিয়ে চুমু

www.bjilibrary.com

খাই।' আয়েশা ঐ মহিলাকে বিদায় দিলেন এবং তার সাথে হিজরে আসওয়াদে গিয়ে চুমু খেতে অস্বীকার করলেন। মোটকথা, উম্মুল মু'মিনীনগণ হিজাবের সাথে বের হতেন এবং পুরুষদের সাথে মিশে তাওয়াফ করতেননা। বুখারী এবং বায়হাকীতে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

এ হাদীস থেকে জানা যায়, মহিলারা পুরুষদের থেকে পৃথক হয়ে তাওয়াফ করতেন এবং তাদের জন্যে রাত্রে তাওয়াফ করা মুস্তাহাব। অর্থাৎ এমন সময় তাদের তাওয়াফ করা উচিত, যখন তাওয়াফের স্থা.ন পুরুষ থাকবেনা।

শাফেয়ীদের মতে, মহিলাদের জন্যে হিজরে আসওয়াদে চুমু খাওয়া বা স্পর্শ করা কেবল তখনই সুন্নত, যখন তাওয়াফের স্থান পুরুষ মুক্ত থাকবে, তা রাত হোক কিংবা দিন তাতে কিছু যায় আসেনা।

www.bjilibrary.com

হজ্জের তাওয়াফ তিনটি। সেগুলো হলোঃ ১. তাওয়াফে কুদূম, ২. তাওয়াফে ইফাদা. ৩. তাওয়াফে বিদা।

তাওয়াফে কুদূম

কুদূম মানে আগমন। অর্থাৎ এটি হজ্জের জন্যে বাইতুল্লায় শুভাগমনের তাওয়াফ। এ তাওয়াফকে 'তাওয়াফে তাহ্ইয়া' [অভিবাদন তাওয়াফ] এবং 'তাওয়াফে লিকা' [সন্দর্শন তাওয়াফ]-ও বলা হয়।

হানাফী, শাফেয়ী এবং হাম্বলীদের মতে এ তাওয়াফ সুন্নত। কারণ এ তাওয়াফ দ্বারা বাইতুল্লাহকে সালাম ও সম্ভাষণ জানানো হয়ে থাকে। যেমন 'তাহ্ইয়াতুল মসজিদ' দুই রাকায়াত নামায ওয়াজিব নয়, তেমনি এ তাওয়াফও ওয়াজিব নয়। আসলে মসজিদে হারামকে সম্ভাষণ জানানোর পন্থাই হলো তাওয়াফ। তাই যিনিই সেখানে উপস্থিত হবেন, তিনি হজ্জ বা উমরার নিয়ত করুন বা গায়রে মুহরেম হোন, সর্বাবস্থায়ই তিনি তাওয়াফের মাধ্যমে আল্লাহর ঘরকে সম্ভাষণ জানাবেন, এটাই স্বাভাবিক।

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন ঃ "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় আগমন করলে সর্বপ্রথম যে কাজটি করেন, তাহলো তিনি অযু করে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করেন।" [বুখারী, মুসলিম, বায়হাকী]

ইমাম মালিক এবং কোনো কোনো শাফেয়ী আলিমের মতে, তাওয়াফে কুদূম এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যেই ওয়াজিব যিনি হজ্জের ইহরাম বেঁধে মক্কায় প্রবেশ করেন, এমনকি তিনি মক্কার বাসিন্দা হয়ে থাকলেও। অর্থাৎ তিনি মক্কারই বাসিন্দা, তবে কোনো কারণে মক্কার বাইরে গিয়েছিলেন এবং ফেরার পথে ইহরাম বেঁধে নিয়েছেন। তবে হায়েয ও নিফাসের অবস্থায় মহিলাদের জন্যে তাওয়াফে কুদূম ওয়াজিব নয়।

www.bjilibrary.com

তাওয়াফে উমরা

তবে কেউ যদি উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে থাকে, তবে উমরার তাওয়াফ তার জন্যে ওয়াজিব। কেননা এই তাওয়াফ উমরার রুকন (ফরয)। এ ব্যাপারে সকল আলিমই একমত।

আল্লামা ইবনে রুশদ 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ' গ্রন্থে লিখেছেন, এ ব্যাপারে সমস্ত ফকীহ্ একমত যে, কোনো ব্যক্তি যদি তামাত্তু হজ্জ করতে চায় এবং সে যদি উমরা করার পর ইহ্‌রাম খুলে ফেলে এ উদ্দেশ্যে যে হজ্জের তারিখ এলে আবার ইহ্‌রাম বাঁধবে, তবে তার জন্যে দু'টি তাওয়াফ ওয়াজিব। একটি হলো উমরার তাওয়াফ আর অপরটি তাওয়াফে ইফাদা।

এ আলোচনা থেকে পরিষ্কার হলো যে, তাওয়াফে কুদূম এবং তাওয়াফে উমরা দু'টি ভিন্ন ভিন্ন তাওয়াফ। কেননা উমরা পালনকারীর জন্যে তাওয়াফে কুদূম জরুরী নয়, অথচ তার উপর তাওয়াফে উমরা ওয়াজিব।

একইভাবে যে ব্যক্তি ইফরাদ হজ্জের জন্যে ইহ্‌রাম বাঁধবে, তার জন্যে একটি মাত্র তাওয়াফ ওয়াজিব। আর সেটা হলো তাওয়াফে ইফাদা। কিন্তু সে যদি তাওয়াফে কুদূমও করে, তবে তা হবে সুন্নত পালন।

কিরান হজ্জ পালনকারীর ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইমাম আবুস সওরের মতে কিরান হজ্জ পালনকারীর জন্যে একটি তাওয়াফ অর্থাৎ তাওয়াফে ইফাদা এবং একটি সায়ীই যথেষ্ট।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম সুফিয়ান সওরী, ইমাম আওযায়ী এবং ইবনে আবী লায়লার মতে কিরান হজ্জ পালনকারীর জন্যে দু'টি তাওয়াফ এবং দু'টি সায়ী ওয়াজিব।

তবে আমাদের মতে পয়লা মতটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

তাওয়াফের পূর্বে মাসিক দেখা দিলে কি করণীয়

অনেক সময় এমন হয়ে যায় যে, কোনো মহিলা হজ্জের জন্যে ইহ্‌রাম বেঁধে নিয়েছেন, কিন্তু এখনো বাইতুল্লাহ্‌র তাওয়াফ সারতে পারেননি, এরি মধ্যে তার মাসিক বা নিফাস শুরু হয়েছে। এ সমস্যা ইফরাদ, কিরান এবং

www.bjilibrary.com

তামাত্তু সবধরনের হজ্জের ক্ষেত্রেই দেখা দিতে পারে। এখন প্রশ্ন হলো, এরূপ অবস্থা দেখা দিলে করণীয় কি ?

এরূপ অবস্থা দেখা দিলে ঐ মহিলার জন্যে তো সমস্যা নেই যিনি কিরান বা ইফরাদ হজ্জের জন্যে ইহরাম বেঁধেছেন। কেননা এ দু'টি হজ্জেই একটি মাত্র তাওয়াফ, অর্থাৎ তাওয়াফে ইফাদা ছাড়া আর কোনো ওয়াজিব তাওয়াফ নেই। ইফরাদ হজ্জের ক্ষেত্রে তো উমরার তাওয়াফ নেই-ই। আর ওযরের কারণে তাওয়াফে কুদূমও রহিত হয়ে গেছে। একইভাবে কিরান হজ্জের ক্ষেত্রেও ওযরের কারণে তাওয়াফে কুদুম রহিত হয়ে যায়। এখন তার জন্যে করণীয় থাকে কেবল তাওয়াফে ইফাদা। তার হজ্জ এবং উমরা উভয়টির জন্যেই এ তাওয়াফ যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে সকল মযহাবের আলিমগণ একমত।

কিন্তু যে মহিলা তামাত্তু হজ্জের ইহরাম বেঁধেছেন, তার বিষয়টি কিছুটা জটিল। কেননা এর কয়েকটি অবস্থা রয়েছে।

(১) একটি অবস্থা এমন হতে পারে যে, তিনি তামাত্তু হজ্জ করার উদ্দেশ্যে উমরার ইহরাম বাঁধার পর মাসিক বা নিফাস শুরু হয়েছে এবং হজ্জের দিনগুলোতেই পবিত্র হয়ে গেছেন। এমতাবস্থায় পবিত্র হবার পূর্বে তাওয়াফ করবেননা, বরং পবিত্র হবার পর কা'বা ঘরের তাওয়াফ করে ইহরাম খুলে ফেলবেন। তারপর হজ্জের ইহরাম বাঁধবেন এবং তামাত্তু করবেন।

তার জন্যে এটাও জায়েয যে, তিনি ইহরাম খুলবেননা বরং একই ইহরামে হজ্জে প্রবেশ করবেন এবং তামাত্তুর পরিবর্তে কিরান হজ্জ করবেন। এমতাবস্থায় তাওয়াফে ইফাদার পরে ইহরাম খুলবেন। কিন্তু এটা করা যাবে ঐ অবস্থায় যখন হজ্জ ফউত হয়ে যাবে বলে আশংকা থাকবেনা।

(২) আরেকটি অবস্থা এই হতে পারে যে, ইহরাম বাঁধার সময়ই তিনি মাসিক বা নিফাসের অবস্থায় ছিলেন এবং সামনে যে সময় আছে তা কম হবার কারণে ধারণা করছেন যে, হজ্জের পূর্বে পবিত্র হতে পারবনা। এমতাবস্থায় তিনি তামাত্তুর পরিবর্তে ইফরাদ হজ্জের নিয়ত করতে পারেন। এতে তার উপর পশু কুরবানী করা ওয়াজিব হবেনা। অথবা কিরান হজ্জের নিয়ত করতে পারেন। এরূপ অবস্থায় একটি তাওয়াফই হজ্জ ও উমরার জন্যে যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ এমতাবস্থায় তিনি তাওয়াফে ইফাদা করবেন আর পশু কুরবানী করাও তার উপর ওয়াজিব হবে।

www.bjilibrary.com

(৩) তৃতীয় অবস্থা এই হতে পারে যে, একজন মহিলা তামাত্তু হজ্জ করবার নিয়তে উমরার ইহরাম বেঁধেছেন এবং তাওয়াফ ও সায়ী করার আগেই তার মাসিক আরম্ভ হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় পবিত্র না হবার কারণে হজ্জ ফউত হয়ে যাবার আশংকা করছেন। আর আমরা আলোচনা করে এসেছি যে, উমরার তাওয়াফ উমরার রুকন। অর্থাৎ তাওয়াফ ছাড়া উমরাই হয়না। এমতাবস্থায় মহিলাটির করণীয় কি ?

এ প্রসংগে আল্লামা খারকী লিখেছেন, কোনো মহিলা যদি তামাত্তুর নিয়তে ইহরাম বাঁধে, অতপর মাসিক দেখা দেয় আর এর ফলে যদি তার হজ্জ ফউত হয়ে যাবার আশংকা হয়, তবে তার উচিত উমরার পরিবর্তে হজ্জের নিয়ত করা। অর্থাৎ এমতাবস্থায় তিনি কিরান হজ্জ করবেন। এতে তাওয়াফে কুদূম করতে না পারার কারণে তার কাযা দিতে হবেনা।

এ বিষয়টির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইবনে কুদামা তাঁর আল মুগনী গ্রন্থে লিখেছেন, সারকথা হলো, কোনো মহিলা যদি তামাত্তুর নিয়ত করে থাকেন আর তাওয়াফে উমরার পূর্বেই তার মাসিক দেখা দেয়, তবে একথা তো পরিষ্কার যে তার পক্ষে এ অবস্থায় তাওয়াফ করা সম্ভব নয়। কারণ তাওয়াফ আর নামাযের তো একই হুকুম। দ্বিতীয়ত, মাসিক চলাকালে তিনি মসজিদে হারামেও প্রবেশ করতে পারছেননা, আবার তাওয়াফ করা ছাড়া উমরার ইহরামও খুলতে পারছেন না। সুতরাং তার যদি হজ্জ ফউত হয়ে যাবার আশংকা হয়, তবে অপেক্ষা না করে উমরার সাথেই হজ্জের ইহরাম বেঁধে নেবেন এবং তামাত্তুর পরিবর্তে কিরান হজ্জ করবেন। এটি ইমাম মালিক, আওযায়ী, শাফেয়ী এবং অন্যান্য আলিমগণের মত। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মত হলো, ঐ মহিলা উমরা পরিত্যাগ করবেন এবং শুধুমাত্র হজ্জের নিয়ত করবেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল লিখেছেন, ইমাম আবু হানীফা যে বলেছেন, কোনো মহিলা তামাত্তুর নিয়তে ইহরাম বাঁধার পর তাওয়াফের পূর্বেই যদি তার মাসিক দেখা দেয়, তবে সে উমরা ত্যাগ করলে তার হজ্জ সহীহ হবে, একথাটি তিনি ছাড়া আর কেউ বলেননি। এ প্রসংগে আবু হানীফার দলিল হলো, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সূত্রে উরওয়া ইবনে যুবায়েরের বর্ণিত একটি হাদীস। উরওয়া বলেন, আয়েশা বলেছেন, আমি উমরার ইহরাম বেঁধে ছিলাম। কিন্তু মক্কা পৌঁছুতেই আমার মাসিক দেখা দেয়। ফলে আমি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ এবং সাফা মারওয়ায় সায়ী করতে পারিনি। আর এ

www.bjilibrary.com

অবস্থার কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালে তিনি আমাকে নির্দেশ দেন ঃ

انقضى رأسك وامتشطى، واهلى بالحج ودعى العمرة –

"মাথার চুল খুলে নাও। চিরুনি দিয়ে আচঁড়িয়ে নাও। উমরা ত্যাগ করো। হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে নাও।"

আয়েশা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক কাজ করি। অতপর যখন হজ্জের কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়, তখন রাসূলুল্লাহ্ আমাকে আমার ভাই আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরের সাথে তানয়ীমের দিকে পাঠান এবং আমি সেখান থেকে উমরা করার জন্যে ইহ্‌রাম বেঁধে নিই। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ আমাকে বলেছিলেন ঃ

هذه عمرة مكان عمرتك –

"এই উমরাটি তোমার সেই উমরাটির পরিবর্তে যেটি তুমি করতে পারোনি।"

এই হাদীসটি সহীহ্ বুখারী এবং সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা মাসিক আরম্ভ হয়ে যাবার কারণে তার উমরা ত্যাগ করে হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন। হাদীসের তিনটি বাক্য থেকে একথা প্রমাণিত হয় ঃ

১. তোমার উমরা ত্যাগ করো,

২. চিরুনি দিয়ে মাথা আঁছড়িয়ে নাও এবং

৩. এই উমরাটি তোমার সেই উমরাটির পরিবর্তে যেটি তুমি করতে পারোনি।

ইবনে কুদামা লিখেছেন, পক্ষান্তরে আমাদের মতের পক্ষে দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদীসগুলো ঃ

(১) জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে ছিলেন। অতপর সারফ নামক স্থানে পৌঁছার পর তাঁর মাসিক দেখা দেয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে গিয়ে দেখেন, তিনি কাঁদছেন। তিনি জানতে চান, তোমার কী হয়েছে? আয়েশা বললেন ঃ আমার মাসিক আরম্ভ হয়েছে।

www.bjilibrary.com

অথচ লোকেরা উমরার তাওয়াফ করে ইহরাম খুলে নিয়েছে। আমি তাওয়াফও করতে পারলামনা, ইহরামও খুলতে পারলামনা। আর লোকেরা হজ্জের জন্যে অগ্রসর হচ্ছে! একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ বললেন ঃ

ان هذا امر كتبه اللّه على بنات ادم فا غتسلى ثم اهلى با لحج

"এটি আদম কন্যাদের একটি সহজাত বিষয়। আল্লাহ তাদের জন্যে এটা লিখে দিয়েছেন। সুতরাং তুমি উঠে গোসল করো এবং হজ্জের ইহরাম বেঁধে নাও।"

আয়েশা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক কাজ করলাম এবং হজ্জের যাবতীয় কার্যসম্পাদন করলাম। ইতিমধ্যে আমি পবিত্র হয়ে গেলাম এবং তাওয়াফ ও সায়ী করে নিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ আমাকে বললেন ঃ

قد حللت من حجك و عمرتك -

"তুমি তোমার হজ্জ ও উমরা উভয়টি থেকে মুক্ত (হালাল) হয়েছো।"

আয়েশা বলেন, আমি আরয করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আমি মনে মনে কিছুটা খটকা অনুভব করছি। আমি হজ্জ থেকে মুক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারিনি। ফলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরকে বললেন ঃ

فاذهب يا عبد الرحمن فا عمرها من التنعيم -

"হে আবদুর রহমান ! একে তানয়ীম নিয়ে যাও এবং সেখান থেকে ইহরাম বাঁধিয়ে উমরা করিয়ে নাও।"

(২) তাউস উম্মুল মু'মিনীন আয়েশার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি উমরার ইহরাম বেঁধে যাত্রা করি। কিন্তু তাওয়াফ করবার আগেই আমার মাসিক দেখা দেয়। তখন আমি হজ্জের নিয়ত করে হজ্জের যাবতীয় কার্য (মানাসিক) সম্পন্ন করে নিই। প্রত্যাবর্তনের দিন রাসূলুল্লাহ বললেন ঃ

يسعك طوافك لحجك وعمرتك -

"তোমার এই তাওয়াফ তোমার হজ্জ ও উমরা উভয়টির জন্যেই যথেষ্ট।"

www.bjilibrary.com

কিন্তু আমি তাঁর কথা মেনে নিইনি। তাতে তিনি (আমার ভাই) আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরকে পাঠালেন। সে আমাকে তানয়ীম নিয়ে যায় এবং আমি সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে উমরা করে নিই। [সহীহ মুসলিম]

এ দু'টি বর্ণনা থেকে আমাদের উপরে আলোচিত সবগুলো কথাই প্রমাণিত হয়ে যায়। কেননা, উমরার নিয়ত করার পর হজ্জে প্রবেশ করা সকলের মতেই জায়েয, হজ্জ ফউত হয়ে যাবার আশংকা থাকুক বা না থাকুক তাতে কিছু যায় আসেনা। সুতরাং সত্যিই যদি হজ্জ ফউত হবার আশংকা দেখা দেয়, তখন তো উমরাকে হজ্জে পরিবর্তন করা ভালভাবেই জায়েয।

মাথার চুল না খোলা

উমরার ইহরাম বাঁধার পর [মাসিক দেখা দেবার কারণে] কোনো মহিলা যদি হজ্জের নিয়ত করে নেন, তবে তার মাথার চুল খোলা উচিত নয়।

ইবনুল মুনযির লিখেছেন, যতো আলিমের কথা আমি স্মরণ রাখতে পেরেছি, তাঁরা সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, কোনো মহিলা উমরার ইহরাম বাঁধার পর বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করে না থাকলে তিনি তার উপর হজ্জের ইহরাম বাঁধতে পারেন। বিদায় হজ্জের সময় স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সেইসব সাহাবীকে উমরার সাথেই হজ্জেরও নিয়ত করে নিবার নির্দেশ দেন, যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিলো। সুতরাং বুঝা গেলো, উমরার ইহরামে থাকা অবস্থায় হজ্জেরও নিয়ত করা যেতে পারে। কিন্তু উমরা ত্যাগ করা জায়েয নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা তো নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ –

"আর হজ্জ এবং উমরা পূর্ণ করো (যখন উভয়টির নিয়ত করবে)।"

তাছাড়া এ কারণেও উমরা ত্যাগ করা জায়েয নয়। যেহেতু মাসিক আরম্ভ হবার কারণে উমরার ইহরাম বাঁধার পর হজ্জের নিয়ত করতে বাধ্য হয়েছে, সুতরাং কোনো ক্ষতি ছাড়াই উমরা করে নিতে পারে। তাই উমরা ত্যাগ করা জায়েয নয়।

এবার উরওয়া বর্ণিত হাদীসের কথায় আসা যাক। তাতে যে বলা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশাকে বলেছিলেন ঃ 'চুল খুলে ফেলো, চিরুনি দিয়ে আঁচড়িয়ে নাও এবং উমরা ত্যাগ করো।'—এর জবাব

www.bjilibrary.com

হলো, হাদীসটি হযরত উরওয়ার একক বর্ণনা। এর সমর্থনে অনুরূপ আর কোনো বর্ণনা নেই, শুধু তাই নয়, বরং এ বর্ণনাটি স্বয়ং হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত সে সময়কার সবগুলো বর্ণনার খেলাফ। হযরত আয়েশা থেকে বিখ্যাত বিখ্যাত তাবেয়ী তাউস কাসিম, আসওয়াদ বর্ণনা করেছেন। তাদের কারো বর্ণনায় হযরত উরওয়ার বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায়না।

তাছাড়া হাম্মাদ ইবনে যায়েদ উরওয়ার পুত্র হিশাম থেকে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তাতে হিশাম বলেন ঃ আমার পিতা উরওয়া আমাকে তাওয়াফের পূর্বে আয়েশার মাসিক আরম্ভ হবার ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ একাধিক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশাকে বলেছিলেন ঃ উমরা ত্যাগ করো, চুল খুলে ফেলো, চিরুনি করে নাও ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ থেকে বুঝা গেলো হযরত উরওয়া যে অতিরিক্ত কথাটি বর্ণনা করেছেন, তা তিনি স্বয়ং (তাঁর খালা) আয়েশার কাছ থেকে শুনেননি। সুতরাং তাঁর এই বর্ধিতাংশটুকু যেহেতু অন্যান্য হাদীসের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক, সে কারণে সেই বক্তব্যটুকুকে তাঁর ধারণা বলা যেতে পারে।

তাছাড়া সে কথাটা স্বয়ং কুরআন মজীদ এবং ইসলামের মূলনীতিরও খেলাফ। কেননা উমরা করা সম্ভব হলে তা ত্যাগ করা জায়েয বলে অন্য কোথাও বলা হয়নি।

শাইখ আছরম আসওয়াদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আসওয়াদ বলেন, আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ঃ আপনি কি হজ্জের পর উমরা করেছিলেন ? জবাবে আয়েশা বলেছিলেন, সেটা উমরা ছিলনা, সেটা ছিলো যিয়ারত মাত্র। আমি গিয়ে বাইতুল্লাহ যিয়ারত করে নিয়েছিলাম মাত্র।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল লিখেছেন, শুধুমাত্র আয়েশার বার বার অনুনয় বিনয়ের কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উমরা করিয়েছিলেন। কারণ তিনি আরয করছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! সবাইতো দু'টি ইবাদত (হজ্জ ও উমরা) করে ফিরে যাচ্ছে, অথচ আমি কেবল একটি ইবাদত করে ফিরে যাচ্ছি (অর্থাৎ হজ্জ)। একথার উপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরকে

www.bjilibrary.com

নির্দেশ দেন, উম্মুল মু'মিনীনকে তানয়ীম নিয়ে গিয়ে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধিয়ে তাওয়াফ করিয়ে নিতে।

আল্লামা খারকী লিখেছেন, হযরত আয়েশার তাওয়াফে কুদূম থেকে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর উপর এর কাযা আবশ্যক ছিল না। যদি আবশ্যকই থাকতো, তাহলে স্বয়ং নবী করীমই তাঁকে কাযা তাওয়াফ করবার নির্দেশ দিতেন। হযরত আয়েশা তাওয়াফে কুদূমের কাযাও করেননি।

তাওয়াফের আগে মাসিক শুরু হলে কুরবানী ওয়াজিব

উমরার ইহ্‌রাম বাঁধার পর যদি কোনো মহিলার মাসিক আরম্ভ হয়ে যায় এবং সে কারণে যদি তিনি উমরার সাথে হজ্জের নিয়ত করতে বাধ্য হন, তবে তার এ হজ্জ হবে কিরাণ হজ্জের মতো। ফলে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব হয়ে পড়বে। কুরবানী দিতে হবে একটি বকরী, কিংবা একটি উট কিংবা একটি উটের সাত ভাগের এক ভাগ। চারজন ইমামের মতেই এ কুরবানী করতে হবে হেরেমের মধ্যে এবং কুরবানীর দিন অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে। কারণ তিনি প্রথমে তো উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে ছিলেন, অতপর হজ্জও করে নিলেন। ফলে তিনি যেনো হজ্জ এবং উমরা দু'টিরই ফায়দা উঠালেন। কুরআন মজীদ এবং সাহাবায়ে কিরামের পরিভাষায় একেই তামাত্তু বলা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

"তবে তোমাদের মধ্যে যে কেউ হজ্জের সময় পর্যন্ত উমরার ফায়দা গ্রহণ করবে, সে যেনো সামর্থানুযায়ী কুরবানী দেয়।"

[সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৬]

এ সুযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে যিনি কিরান করলেন এবং যিনি তামাত্তু করলেন, উভয়ই যেনো শামিল হয়ে গেলেন।

তাওয়াফে ইফাদা

পবিত্র কুরআন মজীদে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ

www.bjilibrary.com

"পরে তারা নিজেদের ময়লা কালিমা দূর করবে, নিজেদের মান্নতসমূহ পূর্ণ করবে আর এই প্রাচীনতম ঘরের তাওয়াফ করবে।"

[সূরা আল হজ্জ ঃ ২৯]

এই পবিত্র আয়াতটির তাৎপর্য হলো, কুরবানী, মাথা কামানো, শয়তানকে পাথর মারা প্রভৃতিসহ হজ্জের যাবতীয় আরকান সমাপন করার পর হাজীরা 'বাইতুল আতীক' অর্থাৎ খানায়ে কা'বার তাওয়াফ করবে। এই তাওয়াফ করতে হয় জুমরায়ে উকবায় পাথর নিক্ষেপের পর। এই তাওয়াফকেই বলা হয় 'তাওয়াফে ইফাদা'। এটাকেই তাওয়াফে যিয়ারত এবং তাওয়াফে রুকন বলা হয়। এ তাওয়াফটিই হজ্জের রুকন। তাওয়াফে ইফাদা যে হজ্জের রুকন, এ ব্যাপারে সকল মযহাব একমত। কোনো হাজী যদি এই তাওয়াফ পরিত্যাগ করে তবে তার হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে।

তাওয়াফে ইফাদার সময়

* ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে তাওয়াফে ইফাদার সময় আরম্ভ হয় কুরবানীর দিন অর্ধরাত থেকে এবং শেষ হবার নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। কিন্তু এই তাওয়াফ আইয়্যামে তাশরীকের শেষ পর্যন্ত বিলম্ব করা মাকরূহ। তবে এই বিলম্বের জন্যে কোনো পশু কুরবানী করা আবশ্যক নয়।

* ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম মালিকের মতে, এই তাওয়াফ আরম্ভের সময় হলো কুরবানীর দিন (দশ যিলহজ্জ) সকাল থেকে। কিন্তু শেষ সময়ের ব্যাপারে উভয় ইমামের মধ্যে মতপার্থক্য আছে।

ইমাম আবু হানীফার মতে এ তাওয়াফ কুরবানীর দিনগুলোর মধ্যে শেষ করতে হবে। কেউ যদি এর চাইতে বিলম্ব করে, তবে তার উপর একটি পশু কুরবানী করা ওয়াজিব।

ইমাম মালিকের মতে, তাওয়াফে ইফাদাকে আইয়্যামে তাশরীকের শেষ দিন পর্যন্ত বিলম্ব করাতে কোনো দোষ নেই। তবে আগে আগে করে ফেলা উত্তম। তাঁর মতে যিলহজ্জ মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত এ তাওয়াফের সময় থাকে। কেউ যদি এর চাইতেও বিলম্ব করে, তবে তার উপর একটি পশু কুরবানী করা ওয়াজিব। কিন্তু এই বিলম্ব সত্ত্বেও তার হজ্জ হয়ে যাবে। ইমাম মালিকের মতে গোটা যিলহজ্জ মাসই হজ্জের মাস।

www.bjilibrary.com

মহিলাদের তাড়াতাড়ি ইফাদা করা উচিত

কুরবানীর দিনই (অর্থাৎ দশই যিলহজ্জ) তাওয়াফে ইফাদা করে নেয়া উত্তম। ইমাম আহমদ, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ এবং ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেছেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ যিলহজ্জে প্রথমত মক্কায় গিয়ে তাওয়াফে ইফাদা করেন এবং তারপরে মিনায় ফিরে এসে যোহর নামায আদায় করেন।

সুতরাং মহিলাদের যদি মাসিক আরম্ভ হয়ে যাবার আশংকা থাকে, তবে তাড়াতাড়ি তাওয়াফে ইফাদা সেরে নেয়া উচিত, বরং মুস্তাহাব। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা মহিলাদেরকে কুরবানীর দিনই (দশ যিলহজ্জ) তাওয়াফে ইফাদা সেরে নিতে নির্দেশ দিতেন। তিনি এরূপ করতেন মাসিক আরম্ভ হয়ে যাবার আশংকায়।

আতা বলেছেন, কোনো মহিলার যদি মাসিক আরম্ভ হয়ে যাবার আশংকা হয়, তবে পাথর নিক্ষেপের পূর্বেই তার তাওয়াফে ইফাদা করে নেয়া উচিত।

ইফাদার পূর্বেই মাসিক আরম্ভ হলে কি করবে?

কোনো মহিলার যদি উকূফে আরাফা ও পাথর নিক্ষেপের পর এবং তাওয়াফে ইফাদার পূর্বে মাসিক দেখা দেয়, তাহলে তিনি কি করবেন?

এমতাবস্থায় তার যদি পবিত্র হওয়া পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করা সম্ভব হয়, তবে আর কোনো সমস্যা থাকেনা। এ অবস্থায় তিনি অপেক্ষা করবেন এবং পবিত্র হবার পর তাওয়াফে ইফাদা সেরে নেবেন। বরং এ অবস্থায় তার পবিত্র হওয়া পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করারই চেষ্টা করা উচিত এবং পবিত্র হয়ে তাওয়াফে ইফাদা সম্পন্ন করে প্রত্যাবর্তন করা উচিত। কিন্তু কোনো মহিলার পক্ষে যদি অপেক্ষা করা সম্ভবই না হয়, তবে তিনি কি করবেন?

এ প্রসংগে ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। নিম্নে তাদের মতামত উল্লেখ করা গেলো ঃ

(১) আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ধারণা হলো, যেহেতু তাওয়াফে ইফাদা হজ্জের রুকন আর রুকন আদায় না হলে হজ্জ বাতিল হয়ে যায় এবং পুনরায় হজ্জ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, সে কারণে এমতাবস্থায় সে

www.bjilibrary.com

মহিলা যেনো সাময়িকভাবে মাসিক বন্ধ থাকে এমন কোনো ঔষধ খেয়ে তাওয়াফে ইফাদা সেরে নেন। কারণ তখন এমনটি করাতে কোনো দোষ হবেনা।

সায়ীদ ইবনে মনসুর বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোনো মহিলা যদি সাময়িকভাবে মাসিক বন্ধ হবার জন্যে ঔষধ খায় যাতে করে সে তাওয়াফে ইফাদা সেরে নিতে পারে, তবে কি তার কোনো দোষ হবে ? তিনি বলেছিলেন, এতে কোনো দোষ নেই। এমনটি করার জন্যে তিনি আরাক গাছের রস খাবারও পরামর্শ দিয়েছিলেন।

(২) এ প্রসংগে ইমাম শাফেয়ীর দু'টি মত পাওয়া যায়। এর মধ্যে যে মতটি খ্যাতি লাভ করেছে, তাহলো মাসিকের দিনগুলোতে সাধারণত কোনো কোনো দিন রক্ত দেখা যায় আবার কোনো কোনো দিন রক্ত দেখা যায়না। যে দিন রক্ত দেখা যায়না সেদিন সে পবিত্র। ইমাম শাফেয়ীর একদল সাথী এ মতটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মযহাব থেকেও এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

এ মতানুযায়ী যে মহিলা একদিন রক্ত দেখে আরেকদিন রক্ত দেখেনা, তার জন্যে রক্ত না দেখার দিন সুবিধা মতো সময় তাড়াহুড়া করে তাওয়াফ করে নেয়া জায়েয, কেননা সেদিন সে পবিত্র।

(৩) ইমাম আবু হানীফার মতে, যে মহিলার রক্তই বন্ধ হয়না তার জন্যে সে অবস্থায়ই তাওয়াফ করা জায়েয। কিন্তু যদি সে ঋতুবতী হয়ে থাকে, তাহলে তার উপর পাঁচ বছরের একটি উট কুরবানী করা ওয়াজিব। সুতরাং কেউ যদি মাসিকের সময় তাওয়াফে ইফাদা করে ফেলে এবং পাঁচ বছরের উট বা গরু কুরবানী দেয়, তবে তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে যাবে এবং ফরয আদায় হয়ে যাবে।

(৪) আল্লামা ইবনে রুশদ লিখেছেন ইমাম মালিকের সাথীদের মধ্যে একদলের মত হলো, এমতাবস্থায় তাওয়াফে কুদূমই তাওয়াফে ইফাদার পক্ষ থেকে যথেষ্ট। অর্থাৎ তাদের মতটা হলো হজ্জে কেবল একটি তাওয়াফই ওয়াজিব। সুতরাং কেউ যদি তাওয়াফে কুদূম করে থাকে, তবে তাওয়াফে ইফাদা করতে না পারলেও তার হজ্জ পূর্ণ হবে।

মালিকীদের মতে যেহেতু তাওয়াফে কুদূম ওয়াজিব, সে হিসেবেই তাঁরা এমত দিয়েছেন।

www.bjilibrary.com

ইমাম কুরতবী লিখেছেন, ইবনে হাকাম ইমাম মালিকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কেউ যদি তাওয়াফে ইফাদা করা ছাড়াই বাড়ী ফিরে যায় এবং সে যদি তাওয়াফে কুদূম এবং সাফা মারওয়া সায়ী করে থাকে, তবে তার তাওয়াফে ইফাদার পরিবর্তে এই তাওয়াফ আর সায়ীই যথেষ্ট। তবে এই অবস্থায় তাকে কুরবানী দিতে হবে। একইভাবে কেউ যদি মক্কায় প্রবেশ কালে তাওয়াফে কুদূম না করে থাকে, তবে তার পরিবর্তে সায়ী এবং তাওয়াফে ইফাদাই তার জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু এই অবস্থায়ও তাকে কুরবানী দিতে হবে। এই কথার ভিত্তি হলো এই মত যে, তাওয়াফে ইফাদার মতো তাওয়াফে কুদূমও ওয়াজিব। এ কারণে এর একটি আরেকটির স্থলাভিষিক্ত হিসেবে যথেষ্ট। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলাও হাজীদের উপর কেবল একটি তাওয়াফই ফরয করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ

"হজ্জের জন্যে লোকদেরকে সাধারণ অনুমতি দিয়ে দাও।"

এ প্রসংগেই আরো বলে দিলেন ঃ

وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ - (الحج -٦٩)

"এবং তারা যেনো এই প্রাচীনতম ঘরের তাওয়াফ করে।"

মালিকীদের মতে, আয়াতের শেষাংশে যে 'এবং' রয়েছে তা প্রথমাংশের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। তাতে প্রমাণ হয় যে, একটি হজ্জের জন্যে কেবল একটি তাওয়াফই ওয়াজিব আর তা তাওয়াফে কুদূম বা তাওয়াফে ইফাদার যে কোনো একটি হতে পারে। এ থেকে মালিকীরা যুক্তি গ্রহণ করেছেন যে, কেউ যদি তাওয়াফে কুদূম করে থাকে আর তাওয়াফে ইফাদা না করতে পারে, তবে তার তাওয়াফে কুদূমই তাওয়াফে ইফাদার স্থলাভিষিক্ত হবে।

উপরে ফকীহদের যেসব মতামত উল্লেখ করা হলো, তাতে দেখা যায়, হানাফীরা বলছেন ঋতুবতী তাওয়াফ করতে পারে। কিন্তু তাদের এমতটি অধিকাংশ আলিমের মতের বিপরীত। অন্যদিকে মালিকীরা যে বলছেন, তাওয়াফে কুদূম তাওয়াফে ইফাদার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে, সেটাও অধিকাংশ ওলামার মতের বিপরীত। আসলে ইজতিহাদের ভিত্তিতে রায় প্রদানের কারণেই ফকীহগণের মতের মধ্যে এ পার্থক্য হয়েছে।

www.bjilibrary.com

(৫) এ প্রসংগে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মত সকলের চাইতে ভিন্ন ধরনের। তাঁর ফাতাওয়া সমগ্রে দেখা যায়, তাঁর মতে, পবিত্রতা ছাড়া কা'বা তাওয়াফ করা জায়েয নয়। তিনি মনে করেন তাওয়াফের জন্যে পবিত্রতা ওয়াজিব। এখানে তিনি হানাফীদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করছেন। অন্য দিকে তিনি মালিকীদের সাথেও মতপার্থক্য করছেন। অর্থাৎ তিনি তাওয়াফে কুদূমকে তাওয়াফে ইফাদার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার বিষয়টিকে সঠিক মনে করেননা। তিনি মনে করেন, যে ঋতুবতীর জন্যে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা সম্ভব নয়, সে ঐ অবস্থায়ই তাওয়াফে ইফাদা করতে পারে এবং এ জন্যে ফিদইয়া হিসেবে তার উপর পশু কুরবানী করা ওয়াজিব হবেনা।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, সমস্ত অপরিহার্য করণীয় (ফরয ওয়াজিব) বিধানের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো এই যে, যেগুলো পালন করতে সক্ষম সেগুলো অবশ্যি পালন করবে, আর যেগুলো পালন করতে অক্ষম, সেগুলো তার উপর থেকে রহিত হয়ে যায়। সুতরাং হায়েয অবস্থায় থাকলেও একজন মহিলার উচিত বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করে নেয়া। তবে ইহরাম বাঁধার সময় যেভাবে গোসল করেছে সেভাবে গোসল করে নেয়া উচিত। আরো উত্তম হলো এস্তেহাযার রোগীরা যেভাবে পট্টি বেঁধে নেয়, সেভাবে পট্টি বেঁধে নেয়া। এ অবস্থায় তার উপর ফিদইয়া হিসাবে পশু কুরবানী করা ওয়াজিব হবে না।

ইবনে তাইমিয়ার যুক্তি হলো, আসলে মহিলাটি এ সময় অক্ষম (মাজুর)। সুতরাং অক্ষম হবার কারণে তার উপর থেকে 'পবিত্রতার' শর্ত রহিত হয়ে যাবে। তাঁর এই যুক্তিটি শরীয়তের অন্যান্য ক্ষেত্রে অক্ষম অবস্থার জন্যে যে মূলনীতি রয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সকল ফরয, ওয়াজিব, মুস্তাহাব ইবাদতের ব্যাপারে মূলনীতি হলো, কোনো ব্যক্তি যদি এসব ইবাদতের অবশ্য পালনীয় কোনো আমল পালন করতে অক্ষম হয়, তখন তা তার জন্যে অসাধ্য বলে রহিত হয়ে যায়। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিদায়াত হলো ঃ

اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم –

"আমি যখন তোমাদেরকে কোনো কাজের নির্দেশ দিই, তখন তোমরা তা 'সাধ্যানুযায়ী' পালন করবে।"

রাসূলুল্লাহর এই বাণী মূলত কুরআনেরই প্রতিধ্বনি। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

www.bjilibrary.com

فَا تَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ - (التغابن -١٦)

"অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো সাধ্যানুযায়ী।"

পবিত্রতা নামাযের জন্যেও শর্ত। বরং তাওয়াফের তুলনায় এ শর্তটি নামাযের জন্যে অধিকতর কঠোর করা হয়েছে। কিন্তু কোনো মহিলা যদি এস্তেহাযা বা কুরক্তের রোগী হয়ে থাকে, অথবা কোনো ব্যক্তির যদি অবিরাম ফোটা ফোটা পেশাব ঝরার রোগ থাকে, কিংবা কোনো ব্যক্তির যদি অনুরূপভাবে পবিত্র হতে না পারার অন্য কোনো রোগ থেকে থাকে, তবে সর্বসম্মতভাবে এরা সকলেই এমতাবস্থায় নামাযও পড়তে পারবে এবং তাওয়াফও করতে পারবে। এরূপ মহিলা পুরুষদের উপর কেবল অক্ষমতা ও অসাধ্যের কারণেই পবিত্রতার শর্তটি রহিত হয়ে যায়। আর এ শর্ত যদি নামাযের ক্ষেত্রে রহিত হতে পারে, তবে তাওয়াফের ক্ষেত্রে তো অনায়েসেই পারে। একইভাবে নামায পড়ার জন্যে কেউ যদি বস্ত্র না পায় তবে সে বিবস্ত্রেই নামায পড়তে পারে। এস্তেহাযা বা কুরক্তের রোগী মহিলা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় প্রকার নাপাকী নিয়েই নামায পড়তে পারে। জুনুবী (যার উপর গোসল ফরয হয়েছে) এবং ঋতুর মেয়াদ পূর্ণকারিনী পানি না পেলে তাইয়াম্মুম করেই নামায পড়তে পারে, এমনকি কোনো কোনো আলিমের মতে তো পানি এবং মাটি কোনোটাই পাওয়া না গেলে তাইয়াম্মুম ছাড়াও তারা নামায পড়তে পারে। একইভাবে হজ্জের ক্ষেত্রেও যখন কেউ প্রচলিত পন্থায় হজ্জ করতে অক্ষম হবে, তখন অন্য কোনো পন্থায় হজ্জ পালন করবে। যেমন, কেউ যদি পায়ে হেটে হজ্জ করতে না পারে, তবে সে যানবাহনে করে করবে। কেউ যদি নাজাসত থেকে পবিত্র হয়ে করতে না পারে, তবে সে সেই অবস্থায় করবে।[১]

এই গোটা আলোচনার সারকথা হলো, কোনো মহিলার যদি তাওয়াফে ইফাদার পূর্বে মাসিক দেখা দেয়, তবে তিনি অক্ষম। কিন্তু এই অক্ষমতার কারণে তার উপর থেকে তাওয়াফে ইফাদা রহিত হয়ে যাবেনা। তবে তাওয়াফের একটি ওয়াজিব অর্থাৎ পবিত্রতা অর্জন-এর শর্ত রহিত হয়ে যাবে এবং মাসিকের অবস্থায়ই তিনি তাওয়াফ করতে পারবেন।

এ ক্ষেত্রে কারো কারো মত হলো, এমতাবস্থায় তাকে ফিদইয়া হিসেবে একটি পশু কুরবানী দিতে হবে। কিন্তু আমাদের মতে তার উপর পশু কুরবানী

১. ইমাম ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য এখানে শেষ।

www.bjilibrary.com

করা আবশ্যক হবেনা। কেননা, কেউ যদি বাধ্য হয়ে কোনো ওয়াজিব ত্যাগ করে তবে তার উপর পশু কুরবানী করা ওয়াজিব হয়না। পক্ষান্তরে কেউ যদি ভুলে বা অজ্ঞতার কারণে কোনো ওয়াজিব ত্যাগ করে তবে তার উপর পশু কুরবানী করা ওয়াজিব হবে। তাছাড়া সহীহ হাদীসে একথার প্রমাণ আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋতুবতীর উপর থেকে তাওয়াফে বিদা রহিত করে দিয়েছিলেন।

কেউ কেউ যে বলেছেন পবিত্রতা তাওয়াফের একটি ফরয এবং শর্ত। সে ব্যাপারে কথা হলো, পবিত্রতা নামাযের জন্যে যতোটা কঠোর, তাওয়াফের জন্যে আসলে ততোটা কঠোর নয়। একথা সকলেরই জানা যে, কঠোর শর্ত হওয়া সত্ত্বেই অক্ষমতার অবস্থায় নামাযের জন্যে পবিত্রতার শর্তটি রহিত হয়ে যায়। তবে সে হিসেবে অক্ষমের জন্যে তাওয়াফের ক্ষেত্রেও পবিত্রতার বিষয়টি রহিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

তাওয়াফে বিদা

আবদুল্লাহ ইবেন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده با لبيت -

“কোনো হজ্জ পালনকারীই যেনো বাইতুল্লাহর শেষ যিয়ারত অর্থাৎ বিদায়ের সময় একটি তাওয়াফ করা ছাড়া বাড়ী প্রত্যাবর্তন না করে।”
[সহীহ মুসলিম]

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হজ্জ পালন শেষে মক্কা থেকে বিদায়ের সময় হাজীদের একটি শেষ তাওয়াফ করে নেয়া উচিত। এটিকে তাওয়াফে ‘বিদা’ (বিদায়ী) এবং তাওয়াফে সদর বলা হয়। এ তাওয়াফের সাথে সাফা মারওয়ায় সায়ী করা অন্তরভুক্ত নেই।

এ হাদীস থেকে এটাও প্রমাণ হয় যে, তাওয়াফে বিদা ওয়াজিব। কেউ যদি এ তাওয়াফ ত্যাগ করে, তবে ফিদইয়া হিসেবে একটি পশু কুরবানী করা তার উপর ওয়াজিব। শাফেয়ী মযহাব, জমহুর উলামা, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম হাসান বসরী, হাকাম, হাম্মাদ, সুফিয়ান সওরী, ইসহাক এবং আবুস সওর-এর এটাই মত।

www.bjilibrary.com

ইমাম মালিক, ইমাম দাউদ যাহেরী এবং ইবনুল মুনযিরের মতে তাওয়াফে বিদা সুন্নত। কেউ যদি এ তাওয়াফ না করে, তবে তার উপর ফিদইয়া ওয়াজিব হবেনা।

এ প্রসংগে মুজাহিদের দু'টি মত পাওয়া যায়। তাঁর একটি মতানুযায়ী তাওয়াফে বিদা ওয়াজিব, তবে আরেকটি মত অনুযায়ী ওয়াজিব নয়, সুন্নত।

তাওয়াফে বিদা ও ঋতুবতী

উপরে আলোচিত মতভেদের প্রেক্ষিতে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়, যদি হজ্জ ও তাওয়াফে ইফাদা সম্পন্ন করার পর তাওয়াফে বিদার পূর্বে কোনো মহিলার মাসিক আরম্ভ হয়ে যায়, তবে তিনি কি করবেন?

এ ব্যাপারে সমস্ত ফকীহর ইজমা (ঐকমত্য) রয়েছে যে, এমতাবস্থায় ঐ মহিলার উপর থেকে তাওয়াফে বিদা রহিত হয়ে যাবে। এ প্রসংগে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "লোকদেরকে হজ্জ শেষে যাত্রা করার পূর্বে একটি তাওয়াফ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু যাত্রার পূর্বে যে মহিলার মাসিক আরম্ভ হয়ে যাবে, তার জন্যে এ নির্দেশ হালকা করা হলো।" [বুখারী, মুসলিম]

এছাড়া উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন : তাওয়াফে ইফাদার পর পরই উম্মুল মু'মিনীন সুফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাবের মাসিক আরম্ভ হয়। আয়েশা বলেন, তার এ বিষয়টি অর্থাৎ মাসিক আরম্ভ হবার কথাটি আমি রাসূলুল্লাহকে জানালে তিনি বললেন : 'তবে তো সে আমাদেরকে রওয়ানা করা থেকে বিরত রাখবে'? আমি আরয করলাম : "হে আল্লাহর রাসূল! তাওয়াফে ইফাদা করার পর তার মাসিক আরম্ভ হয়েছে। একথা শুনে তিনি বললেন : তবে কোনো অসুবিধা নেই, এখন সে যাত্রা করতে পারে।" [সহীহ মুসলিম]

ইমাম নববী লিখেছেন, এ হাদীস থেকে প্রমাণ হয়, সকল হাজীর উপরই তাওয়াফে বিদা ওয়াজিব, তবে ঋতুবতীর উপর থেকে এ তাওয়াফ রহিত হয়ে যায়। এ হাদীস থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, এ তাওয়াফ ত্যাগ করলে ফিদইয়া হিসেবে পশু কুরবানী করা ওয়াজিব হয়না। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং অন্যান্য

www.bjilibrary.com

উলামায়ে কিরামের এটাই মত। হাদীসের নিম্নোক্ত বাক্যটিই এ মতের দলীল ঃ তবে কোনো অসুবিধা নেই, এখন সে যাত্রা করতে পারে।" এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহাকে ফিদইয়া আদায় করবার নির্দেশ দেননি। সুতরাং এরূপ অবস্থায় মহিলাদের উপর ফিদইয়া ওয়াজিব হয়না।

ইমাম নববী আরো লিখেছেন, এ হাদীস থেকে প্রমাণ হয়, তাওয়াফে ইফাদা হজ্জের রুকন, যা আদায় করা সর্বাবস্থায় বাধ্যতামূলক। কোনো হাজীর উপর কোনো অবস্থায়ই তা রহিত হয়ে যায়না। এমনকি মাসিক দেখা দিলেও নয় এবং অন্য কোনো ওযর দেখা দিলেও নয়। এমতাবস্থায় ঋতুবতীকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করতে হবে, যাতে করে পবিত্র হবার পর তাওয়াফে ইফাদা করে নিতে পারে। কিন্তু তাওয়াফে ইফাদা না করেই যদি সে বাড়ী ফিরে যায়, তবে তার ইহরাম শেষ হবেনা। ইহরাম অবস্থা চলতে থাকবে। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সুফিয়াকে ততোক্ষণ পর্যন্ত যাত্রার অনুমতি দেন নাই যতোক্ষণ না তিনি জানতে পেরেছেন যে তিনি ইফাদা সেরে নিয়েছেন।

ইবনে কুদামা লিখেছেন, আমাদের দলীল হলো এই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানতে পারলেন হযরত সুফিয়ার মাসিক আরম্ভ হয়েছে, তখন তিনি বললেন ঃ 'তবে তো সে আমাদেরকে রওয়ানা করা থেকে বিরত রাখবে।' কিন্তু যখন তাঁকে জানানো হলো যে, দশই যিলহজ্জ সুফিয়া তাওয়াফে ইফাদা সেরে নিয়েছেন। তখন তিনি বললেন ঃ 'তবে কোনো অসুবিধা নেই, এখন সে যাত্রা করতে পারে।' এ থেকে বুঝা গেলো তাওয়াফে ইফাদা না করে উপায় নেই। কেউ যদি মাসিক আরম্ভ হবার আগে এ তাওয়াফ না করে থাকে তবে মাসিক শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে। সে যদি ইহরাম থেকে মুক্ত হবার উদ্দেশ্যে ইহরাম খুলেও ফেলে, তবু সে ইহরাম থেকে মুক্ত হবেনা। তার ইহরাম খতম হবেনা। কেননা কেউ যদি ইহরাম বাঁধার পর ইহরাম শেষ করবার উদ্দেশ্যে ইহরাম খুলে ফেলে, তবু হজ্জ বা উমরার নিয়ত করে থাকলে সেগুলো সম্পন্ন করার পূর্ব পর্যন্ত তার ইহরাম শেষ হবেনা। কারণ সে নিয়ত পূর্ণ করেনি। সুতরাং কোনো মহিলা যদি তাওয়াফে ইফাদা না সেরেই ইহরাম খুলে মক্কা ত্যাগ করে, তবু ফিরে এসে তাওয়াফে ইফাদা সেরে নেবার আগ পর্যন্ত সে ইহরাম থেকে হালাল (মুক্ত) হবেনা।

www.bjilibrary.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছেন ঃ 'তবে তো সে আমাদেরকে রওয়ানা করা থেকে বিরত রাখবে।' একথা থেকে এই ইংগিত পাওয়া যায় যে, কাফেলাকে ততোদিন বা ততোক্ষণ পর্যন্ত বিলম্ব করতে হবে, যতোদিন না তাদের সাথী ঋতুবতী পবিত্র হয়ে তাওয়াফে ইফাদা সেরে নেবে।

যে মহিলা যাত্রার সময় তাওয়াফে ইফাদা করে

যে মহিলা মাসিক আরম্ভ হবার কারণে তাওয়াফে ইফাদা পূর্বে করতে পারেনি, বরং বাড়ী ফেরার পূর্বক্ষণে করেছেন, তারও কি তাওয়াফে বিদা করতে হবে?

ইমাম ইবনে কুদামা লিখেছেন, এ প্রসংগে দু'টি মত পাওয়া যায় ঃ

(১) একটি হলো এই যে, তার তাওয়াফে ইফাদাই তাওয়াফে বিদার স্থলাভিষিক্ত হবে। কেননা তাওয়াফে বিদা তো হলো বিদায়ের সময়ের তাওয়াফ। আর এ সময় তাওয়াফে ইফাদা করার কারণে সেটিই বিদায়ী তাওয়াফে পরিণত হবে।

(২) দ্বিতীয় মতটি হলো, তাওয়াফে ইফাদা তাওয়াফে বিদার স্থলাভিষিক্ত হবেনা। কেননা বিদায়ের সময় করলেও তা তাওয়াফে ইফাদার নিয়তেই করা হয়েছে। তাছাড়া দু'টিই পৃথক পৃথক ওয়াজিব ইবাদত। তাই একটির পক্ষ থেকে আরেকটি যথেষ্ট হতে পারেনা। যেমন করে একটি ফরয নামায আরেকটি ফরয নামাযের স্থলাভিষিক্ত হয়না।

আমাদের মতে এ দু'টি মতের মধ্যে প্রথমটিই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। কেননা সেটি অধিকতর যুক্তিসংগত ও বাস্তব সম্মত।

তাওয়াফে বিদা অন্যদের জন্যে রহিত হয়না

ইমাম মালিক ব্যতীত অন্য সকল ফকীহর মতে তাওয়াফে বিদা ওয়াজিব। তবে নুফাসা ও ঋতুবতীর জন্যে শরীয়ত এ তাওয়াফ হালকা করে দিয়েছে। এ ব্যতিক্রম কেবল তাদের জন্যেই সীমিত। অন্যদের জন্যে এটি হালকা করা হয়নি।

তাই কোনো ব্যক্তি যদি তাওয়াফে বিদা না করেই মক্কা ত্যাগ করে থাকে, তবে নিকটের লোক হলে ফিরে এসে তাওয়াফে বিদা করে নেবে।

www.bjilibrary.com

আর দূরের লোক হলে ফিদইয়া হিসেবে একটি কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দেবে। এ মত হলো ইমাম আতা, সুফিয়ান সওরী, শাফেয়ী, আবুস সওর এবং ইসহাকের। এ তাওয়াফ সে ইচ্ছে করে ত্যাগ করে থাকুক, কিংবা ভুলে, বিনা ওযরে অথবা ওযর বশত তাতে কিছু যায় আসে না। এসকল অবস্থায় হুকুম একই। কেননা এটি হজ্জের ওয়াজিবসমূহের একটি। আর ওয়াজিব ইচ্ছাকৃত, ভুলবশত, ওযর বশত অথবা বিনা ওযরে যেভাবেই ত্যাগ করা হোকনা কেন, হুকুম একই থাকে।

---

www.bjilibrary.com

৩৯. সাফা মারওয়ায় সায়ী করা

ফকীহদের মতে সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করা হজ্জের একটি রুকন। ইমাম আবু হানীফার মতে সায়ী ওয়াজিব। অধিকাংশ আলিমের মতে সায়ী করার জন্যে পবিত্র হওয়া শর্ত নয়।

নুফাসা ও ঋতুবতীর সায়ী

ইমাম ইবনে কুদামা লিখেছেন, অধিকাংশ আলিমের মতে সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করার জন্যে পবিত্র হওয়া শর্ত নয়। যারা এমত দিয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আতা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবুস সওর এবং আসহাবুর রায়।

ইমাম হাসান বসরী বলতেন, কেউ যদি বিনা পবিত্রতায় সাফা মারওয়ায় সায়ী করে থাকে এবং ইহরাম খুলবার পূর্বেই তা মনে পড়ে, তবে তার জন্যে পবিত্র হয়ে পুনরায় সায়ী করা জরুরী। কিন্তু ইহরাম খুলে ফেলার পরে মনে হলে পুনরায় সায়ী করা জরুরী নয় এবং তাকে ফিদইয়াও দিতে হবে না।

ইমাম ইবনে কুদামা লিখেছেন, এ প্রসংগে আমাদের দলীল হলো, হযরত আয়েশার যখন মাসিক আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন ঃ

اقض ما يقضى الحاج غير ان لا تطوفى بالبيت

"তাওয়াফ ছাড়া অন্য হাজীদের মতোই হজ্জের যাবতীয় কার্য সম্পাদন করো।"

এ থেকে বুঝা গেলো, বাইতুল্লাহর তাওয়াফ ছাড়া নুফাসা ও ঋতুবতীর জন্যে হজ্জের যাবতীয় কার্যসম্পাদন করাই জায়েয। তাছাড়া সায়ী হজ্জের এমন একটি রুকন, বাইতুল্লাহর সাথে যেটির সম্পর্ক নেই, যেমনটি নেই আরাফায় অবস্থানের। সুতরাং নুফাসা ও ঋতুবতী যেভাবে আরাফায় অবস্থান করতে পারে, ঠিক তেমনি সাফা মারওয়ায়ও সায়ী করতে পারে।

আবু দাউদ বলেছেন, আমি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে বলতে শুনেছি, বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করবার পর যদি কোনো মহিলার মাসিক আরম্ভ হয়, তবে

www.bjilibrary.com

সে ঐ অবস্থায় সাফা মারওয়ায় সায়ী করবে এবং আরাফায় অবস্থানের জন্যে চলে যাবে।

ইমাম আছরাম থেকে বর্ণিত। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা ও উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন ঃ বাইতুল্লাহর তাওয়াফ এবং তাওয়াফের দুই রাকায়াত নামায পড়ার পর কোনো মহিলার মাসিক দেখা দিলে সে ঐ অবস্থায়ই সাফা মারওয়ায় সায়ী করে নেবে।

তবে যার পক্ষে পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব, তার জন্যে সায়ীসহ হজ্জের যাবতীয় মানাসিক পাকপবিত্র অবস্থায় পালন করা মুস্তাহাব।

ইমাম ইবনে কুদামা লিখেছেন, আমাদের কোনো কোনো আলিম বলেছেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মত হলো সাফা মারওয়ায় সায়ী ঠিক সেভাবে পবিত্র হয়ে করা জরুরী, যেভাবে পবিত্র হয়ে তাওয়াফ করতে হয়। কিন্তু এমত সত্ত্বেও ইমাম আহমদ ঐ ব্যক্তির পুনরায় সায়ী করা জরুরী নয় বলে মনে করেন। যে পবিত্রতা ছাড়াই সায়ী করে ফেলেছে।

আলোচনার সারকথা হলো, চার ইমামের মতে সায়ী করার জন্যে নাজাসাতে হাকীকী এবং নাজাসাতে হুকমী থেকে পবিত্র হওয়া এবং শরীরের সতরযোগ্য অংগসমূহ ঢেকে রাখা সুন্নত। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি বিনা অযুতে সায়ী করে, অথবা গোসল ফরয হওয়া অবস্থায়, কিংবা হায়েয নিফাসের অবস্থায় অথবা পরিধেয় বস্ত্রে নাপাক লেগে থাকা অবস্থায়, কিংবা শরীরের সতরযোগ্য কোনো অংগ উন্মুক্ত অবস্থায় সায়ী করে, তবে তার সায়ী দুরস্ত হবে। এজন্যে তাকে ফিদইয়া দিতে হবে না। অবশ্য অন্যদের সামনে সতরযোগ্য কোনো অংগ বিবস্ত্র করা হারাম।

সায়ীর স্থান কি মসজিদে হারামের অংশ ?

কোনো কোনো আলিম মনে করেন, সাফা মারওয়ায় সায়ীর ব্যাপারে যেসব মতামত উল্লেখ হয়েছে, সেগুলো সে সময়কার কথা, যখন কা'বার হারাম প্রশস্ত করা হয়নি। প্রশস্ত করার পর সায়ী করার স্থান মসজিদের সীমানার মধ্যে পড়ে গেছে। সুতরাং সায়ীর হুকুম মসজিদের হুকুমের মতোই হবে। আর মসজিদে যেভাবে 'হদসে আকবরের' অবস্থায় প্রবেশ করতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তেমনি এখন পবিত্রতা ছাড়া সায়ী করাও জায়েয হতে পারে না।

www.bjilibrary.com

তবে আমাদের জানা মতে প্রশস্ত করা সত্ত্বেও মসজিদের সীমা থেকে সায়ী করার স্থান পৃথক করে রাখা হয়েছে। সুতরাং এমতাবস্থায় মসজিদে হারামের হুকুম এবং সায়ীর হুকুম এক রকম হবে না।

সায়ীর সময় মহিলারা কি সাফা মারওয়ায় উঠবে ?

হজ্জ বা উমরার জন্যে সায়ী করবার সময় সাফা মারওয়ায় আরোহণ করা এবং সেখানে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' উচ্চারণ করা সুন্নত।

মুসলিম এবং আবু দাউদে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ করার পর সাফায় গমন করেন এবং পাহাড়ে আরোহণ করেন। সেখানে উঠে তিনি বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে হামদ ও সানা পাঠ করেন এবং দোয়া করেন।

মুসলিম এবং নাসায়ীতে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ের নিকট উপস্থিত হলে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (البقرة : ١٥٨)

"অবশ্যি সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভূক্ত।"

(সূরা আল বাকারা ঃ ১৫৮)

সেখানে উপস্থিত হবার পর তিনি আরো বলেন ঃ

ابدأ بما بدأ الله به

"আল্লাহ যেটির নাম আগে নিয়েছেন আমিও সেটি থেকে শুরু করছি।" একথা বলে তিনি পয়লা সাফা পাহাড়ে উঠেন। সেখানে উঠে তিনি বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে দাড়ান। এরপর তিনি মারওয়াতে আসেন। এখানে এসেও ঠিক তাই তাই করেন, যা যা করেছিলেন সাফা পাহাড়ে।

এখানে একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। তাহলো মহিলাদেরও কি পুরুষদের মতো সাফা মারওয়ায় আরোহণ করা জরুরী ?

ইমাম ইবনে কুদামা লিখেছেন, মহিলাদের সাফা মারওয়ায় আরোহণ করা সুন্নত নয়। এতে পুরুষদের সাথে ধাক্কা ধাক্কি হবার আশংকা থাকে। তাছাড়া পাহাড়ে আরোহণ না করাটাই মহিলাদের সতর রক্ষার অনুকূলে।

www.bjilibrary.com

ইমাম মালিকের মতে পুরুষদের সাথে ধাক্কা ধাক্কির আশংকা না থাকলে নারী পুরুষ উভয়ের জন্যেই সাফা মারওয়ায় আহরোণ করা সুন্নত। কিন্তু ধাক্কা ধাক্কির আশংকা থাকলে মহিলাদের আরোহণ না করা উচিত।

শাফেয়ীদের মতে, মহিলাদের জন্যে কেবল সেই অবস্থায় সাফা মারওয়ায় আরোহণ করা সুন্নত, যখন সেখানে কোনো পুরুষ না থাকে। তবে সাফা মারওয়ায় না উঠার অর্থ এই নয় যে, তারা মধবর্তী পূর্ণ এলাকারও সায়ী করবে না। কাযী ইয়ায লিখেছেন, হাজীদের কর্তব্য হলো সাফা মারওয়ার পুরো এলাকা সায়ী করা। পায়ের গোড়ালী দিয়ে সাফা পাহাড়ের নিম্নাংশে আঘাত করে সায়ী আরম্ভ করবে এবং মারওয়ায় এসে পৌঁছুবে। পাহাড়ে আরোহণ করা সম্ভব না হলে পায়ের আংগুল দিয়ে পাহাড়ের গাত্র স্পর্শ করবে।

ইমাম ইবনে কুদামা লিখেছেন, সায়ী করবার সময় মহিলাদের জন্যে সাফা মারওয়ার পূর্ণ পথ সায়ী করা তেমনি ওয়াজিব যেমনি পুরুষদের জন্যে ওয়াজিব।

মহিলাদের রাত্রে সায়ী করা মুস্তাহাব

মহিলাদের জন্যে সাফা মারওয়ার মাঝে সায়ী রাত্রে করা মুস্তাহাব। অর্থাৎ এমন সময় করা মুস্তাহাব যখন সায়ীর এলাকায় পুরুষ থাকে না। তবে দিনের বেলায়ও তাদের জন্যে সায়ী করা দুরস্ত আছে। দিনের বেলায় সায়ী করলে কোনো ফিদইয়া দিতে হবে না এবং কোনো গুনাহও হবে না। এর আগে আমরা বুখারী ও বায়হাকীর হাদীস উল্লেখ করেছি যে, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা এবং অন্যান্য উম্মুল মু'মিনীনগণ রাত্রিবেলা সায়ী করতেন। তবে তখন পুরুষরাও সায়ী করতো, মহিলারা তাদের পিছে পিছে সায়ী করতেন।

মহিলারা সায়ীতে রমল করবে না

তাওয়াফ এবং সায়ী করার সময় রমল করা সুন্নত। তবে এ সুন্নত পুরুষদের জন্যে, মহিলাদের জন্যে নয়। যেমন আমরা ইতোপূর্বে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণনা করেছি যে, 'তাওয়াফ ও সায়ীতে মহিলারা রমল করবে না।' রমল মানে ঘাড় উঁচু উঁচু করে তীব্র পদক্ষেপে চলা। এটা করা হয়ে থাকে বীরত্ব প্রকাশের জন্যে।

www.bjilibrary.com

৪০. উকূফে আরাফা

এ ব্যাপারে সকল উলামা ও সকল মযহাব একমত যে, 'উকূফে আরাফা' বা 'আরাফায় অবস্থান' হজ্জের এমন একটি রুকন, যেটি ছাড়া হজ্জ হয় না। অর্থাৎ যিনি উকূফে আরাফা করেননি তার হজ্জ হয়নি।

আবদুল্লাহ ইবনে ইয়া'মর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ আরাফায় অবস্থান কালে আমি তাঁর খিদমতে হাযির হই। এ সময় নজদের কিছু লোক তাঁর নিকট আসে। তারা তাঁকে জিজ্ঞসা করে ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! হজ্জ কি ? জবাবে তিনি বলেন ঃ

الحج عرفة فمن جاء قبل صلوة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه -

"হজ্জ হলো, আরাফায় অবস্থান। যে ব্যক্তি জমা'র রাত্রে (অর্থাৎ মুযদালিফার রাত) ফজর নামাযের পূর্বে আরাফায় পৌঁছলো, সে হজ্জ সম্পন্ন করলো।"

'লাইলাতুল জমা' বা 'জমার রাত' মানে মুযদালিফার রাত। 'আরাফায় অবস্থান' বা 'উকূফে আরাফার' মেয়াদ হলো আরাফার দিন। অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের নয় তারিখ অপরাহ্ন অর্থাৎ সূর্য পশ্চিম দিকে গড়িয়ে পড়ার সময় থেকে কুরবানীর দিন অর্থাৎ দশই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। এ হলো হানাফী, শাফেয়ী, মালিকী ও জমহুর আলিমদের মত।

আরাফায় অবস্থানের ব্যাপারে এতটুকুই যথেষ্ট যে, হাজী ইহরাম অবস্থায় 'আরাফার দিন' অর্থাৎ নয়ই যিল হজ্জ তারিখে আরাফাত ময়দানের কোনো এক অংশে উপস্থিত থাকবে। দাঁড়ানো থাকুক, বসে থাকুক, শুইয়ে থাকুক, কিংবা যানবাহনে থাকুক তাতে কিছু যায় আসে না।

এটাই হলো হানাফী এবং শাফেয়ীদের মত। ইমাম মালিকেরও একটি মশহুর মত অনুরূপ। তবে অবস্থান যদি দিনে করা হয়, সে ক্ষেত্রে হানাফী এবং মালিকীদের মতে অবস্থান অবশ্যি সূর্যাস্তের পরও কিছুক্ষণ হতে হবে।

আরাফায় অবস্থানের জন্যে পবিত্রতা শর্ত নয়

ইমাম ইবনে কুদামা তাঁর আল মুগনী গ্রন্থে লিখেছেন, আরাফায় অবস্থানের জন্যে পবিত্রতা, পর্দা টানানো, কেবলা মুখী হওয়া এবং নিয়্যত করা

www.bjilibrary.com

শর্ত নয়। আমাদের জানা মতে এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত, কারো দ্বিমত নেই।

ইবনুল মুনযির বলেছেন, কেউ যদি পবিত্রতা ছাড়াই আরাফাত ময়দানে অবস্থান করে, তবে তার হজ্জ হয়ে যাবে এবং তাকে ফিদইয়া দিতে হবে না।

এ থেকে বুঝা গেলো, কোনো মহিলার যদি হজ্জের সময় নিফাস বা মাসিক আরম্ভ হয়ে যায়, তবে তিনি এ অবস্থায় আরাফায় অবস্থান করতে পারবেন। কেননা উম্মুল মু'মিনীন আয়েশার যখন হজ্জের সময় মাসিক আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন, 'তুমি তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের সকল কাজই সম্পাদন করো।'এ হাদীস থেকেই প্রমাণ হয় যে, পবিত্রতা ছাড়া উকূফে আরাফা জায়েয। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহর অনুমতিতে মাসিক চলাকালে উকূফে আরাফা করেছিলেন।

আরাফায় তাকবীর ও তাহলীল পাঠ

আরাফার দিন অধিক অধিক আল্লাহর যিক্‌র করা এবং দোয়া করা মুস্তাহাব। এটি এমন একটি দিন, যেদিনের দোয়া কবুল করা হবে বলে আশা করা যায়।

'আল্লাহু আকবার' ও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করা এবং দোয়া করার জন্যে পবিত্রতা শর্ত নয়। সুতরাং মহিলারা নিফাস ও মাসিকের অবস্থায় 'আল্লাহু আকবার' ও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করতে পারে এবং আল্লাহর নিকট দোয়া প্রার্থনা করতে পারে। কুরআন ও হাদীসে যেসব দোয়ার উল্লেখ আছে, এঅবস্থায় তারা সেসব দোয়াও করতে পারে। তবে জমহুর আলিমদের মতে এ অবস্থায় তাদের জন্যে ইবাদত হিসাবে কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয নয়। ইমাম দাউদ যাহেরীর মতে সর্বাবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয।

---

www.bjilibrary.com

৪১. মুযদালিফায় রাত্রি যাপন

মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা হজ্জের মানাসিক সমূহের একটি। মুযদালিফার তিনটি নাম রয়েছে ঃ

১. মুযদালিফা,

২. মাশআ'রিল হারাম,

৩. জমা'।

আরাফায় অবস্থান শেষ করে মুযদালিফায় রওয়ানা করতে হয়। মুযদালিফায় উপস্থিত হয়ে সেখানে মাগরিব ও ইশার নামায জমা'(একত্রিত) করে পড়তে হয়। মাগরিবের নামায আখেরী ওয়াক্তে এবং ইশার নামায আওয়াল ওয়াক্তে এনে এই দু'টি নামায এখানে একত্রে পড়তে হয়। তাছাড়া এশার নামায কসর করতে হয় অর্থাৎ দুই রাকায়াত পড়তে হয়। এই মুযদালিফা বা মাশ'আরিল হারামে অবস্থানের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ص وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰكُمْ ج وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"অতপর যখন আরাফাতের ময়দান থেকে রওয়ানা করবে, তখন মাশআ'রিল হারামের কাছে থেমে আল্লাহকে স্মরণ করবে। তেমনি ভাবে তাঁকে স্মরণ করবে, যেভাবে স্মরণ করবার জন্যে তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যথায় এর পূর্বে তো তোমরা পথভ্রষ্টই ছিলে। এরপর যেখান থেকে সবলোক প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করো। আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।" (সূরা আল বাকারাহ ঃ ১৯৮—১৯৯)

www.bjilibrary.com

মুযদালিফায় রাত্রি যাপন প্রসংগে বিভিন্ন মযহাবের মতামত নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

* হাম্বলীদের মতে রাত্রে মুযদালিফায় অবস্থান করা ওয়াজিব। কেউ যদি মুযদালিফায় অবস্থান না করে, তবে তাকে ফিদইয়া হিসাবে একটি পশু কুরবানী করতে হবে।

* শাফেয়ীদের মতে, রাতের দ্বিতীয়াংশে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে হলেও মুযদালিফায় অবস্থান করা ওয়াজিব। অর্ধরাতের পরে কোনো হাজী যদি এক মুহূর্তের জন্যে হলেও মুযদালিফায় অবস্থান না করে থাকে, তবে তার উপর ফিদইয়া হিসাবে একটি পশু কুরবানী করা ওয়াজিব।

* হানাফীদের মতে মুযদালিফায় রাত্রি যাপন সুন্নত। কুরবানীর দিন অর্থাৎ দশই যিলহজ্জ ফজরের পূর্বে কমপক্ষে এক মুহূর্তের জন্যে হলেও প্রত্যেক হাজীকে মুযদালিফায় উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব। কেউ যদি এই হাযিরা ত্যাগ করে, তবে তার উপর একটি পশু কুরবানী করা আবশ্যক।

* মালিকীদের মতে, মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা ওয়াজিব নয়,বরং সেখানে কিছু সময়ের জন্যে বিরত হওয়া ওয়াজিব। রাত্রে ফজর উদয়ের পূর্বে কেবল এতোটা সময় মুযদালিফায় বিরত হওয়া ওয়জিব, আরাফা থেকে মিনার দিকে সফর অব্যাহত রাখা অবস্থায় মুযদালিফায় বাহন থেকে অবতরণ করতে যতোটা সময় লাগে। তাও কেবল সেই অবস্থায়ই এটা ওয়াজিব, যখন কোনো ওযর থাকবে না। কোনো ওযরের কারণে যদি অবতরণ করতে না পারে, তবে অবতরণ করাও ওয়াজিব নয়।

মালিকীদের মতে কেবল রাত্রে অবতরণ করাটাই ওয়াজিব। আর তা রাত্রের যেকোনো অংশেই হোক না, প্রথমাংশে কিংবা দ্বিতীয়ার্ধে, তাতে কোনো পার্থক্য নেই।

হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মযহাব অনুযায়ী বর্তমান কালে মুযদালিফায় কিছু সময় বা পূরোরাত যাপন করা কঠিন। কেননাময়াল্লিমরা হাজীদেরকে আরাফা থেকে সোজা মিনায় নিয়ে যায়। কেবল সামান্য সময়ের জন্যে মুযদালিফায় গাড়ি একটু থামায়। এ সময় যদি হাজীরা মুযদালিফায় নেমে থাকে, তবে মিনায় পৌঁছা তাদের জন্যে খুবই কষ্টকর হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে হাজীরা যদি মালিকী মযহাব অনুযায়ী আমল করে, অর্থাৎ যদি গাড়ি থেকে

www.bjilibrary.com

অবতরণ করেই আবার গাড়িতে উঠে যায়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। কেননা, মালিকীদের এই মতের পক্ষে যথেষ্ট মজবুত দলিল প্রমাণ আছে।[১]

মুযদালিফায় অবস্থানের ব্যাপারে আমরা বিভিন্ন মযহাবের মতপার্থক্য দেখতে পেলাম। আসলে মতপার্থক্যের ভিত্তি হলো রুখসত ও আযীমত। হানাফী ও হাম্বলী মত অধিকতর কঠিন। আসলে তারা আযীমতের (দৃঢ়তা) উপর আমল করতে বলেছেন। শাফেয়ীদের মত তাদের চেয়ে কিছুটা হালকা। মালিকী মত আরো সহজতর। আসলে এসব বুযর্গ রুখসতের (অবকাশ) উপর আমল করতে বলেছেন।

ইমাম আবদুল ওয়াহহাব শা'রানী সব মযহারে মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে বলেছেন, পরিবেশ পরিস্থিতি ও সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী আমল করা উচিত। সুযোগ সুবিধা থাকলে আযীমতের উপর এবং সমস্যা থাকলে রুখসতের উপর আমল করা উচিত।

---

১. তাফসীরে কুরতবী ঃ ২য় খণ্ড, ৪২৫ পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

শয়তানের স্তম্ভসমূহে পাথর মারা হজ্জের ওয়াজিবসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে সকল মযহাবের আলিমগণ একমত। কেউ যদি পাথর নিক্ষেপ না করে থাকে, তবে নিম্নোক্ত তিনটি পন্থার যেকোনো একটি পন্থায় তাকে ফিদইয়া দিতে হবে ঃ

১. ফিদইয়া হিসাবে একটি বকরী কুরবানী করবে। কিন্তু কারো যদি একটি বকরী কুরবানী করবার সামর্থ না থাকে, তবে সে—

২. দশ দিন রোযা রাখবে। এর মধ্যে তিনটি রোযা রাখবে হজ্জের দিনগুলোতে আর বাকী সাতটি রাখবে বাড়ি ফিরে গিয়ে। কিন্তু কেউ যদি রোযা রাখারও সামর্থ না রাখে তবে সে—

৩. ছয়জন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে।

এই ফিদইয়া প্রসংগেও বিভিন্ন মযহাবের মধ্যে কিছুটা মতভেদ আছে। কেউ কেউ এ প্রসংগে কঠিন মনোভাব পোষণ করেন আবার কেউ কেউ সহজ। এ বিষয়ে অধিক জানার জন্যে ফিক্‌হের গ্রন্থাবলী দেখতে পারেন।

এখানে আমরা বিশেষভাবে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তাহলো পাথর নিক্ষেপের সময় ভীষণ ভিড়ের চাপে হাজীগণ দারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হন। বিশেষ করে বৃদ্ধ, দুর্বল ও মহিলারা খুবই শোচণীয় অবস্থার সম্মুখীন হন। ঠেলাঠেলি এবং চাপাচাপিতে পড়ে অনেক হাজীর মৃত্যুও ঘটে। এর কারণ হলো হাজীরা প্রায় সকলেই দ্রুত ও কম সময়ের মধ্যে পাথর নিক্ষেপের কাজ সেরে নিতে চান। কিন্তু একাজ কখনো সম্ভব হয় না। এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করে এর সমাধান পেশ করতে চাই।

পাথর নিক্ষেপকে আরবী ভাষায় বলা হয় 'রামীয়ে জিমার'। 'রামী' মানে নিক্ষেপ করা। জিমার শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো 'জুমরা'। জুমরা মানে পাথর। মিনার পথে অগ্রসর হলে কিছু দূরে দূরে তিনটি স্তম্ভ আছে। এগুলোর উপরই পাথর মারতে হয়। তাই এগুলোকেও জুমরাত বলা হয়। এই স্তম্ভ তিনটির নাম হলো জুমরায়ে উলা, জুমরায়ে উস্তা এবং জুমরায়ে উকবা। মক্কা থেকে যাত্রা করার পর প্রথমেই যে স্তম্ভটি পড়ে, সেটিই হলো জুমরায়ে উকবা। আর পরেরটি জুমরায়ে উস্তা এবং শেষেরটির নাম জুমরায়ে উলা।

www.bjilibrary.com

যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে অর্থাৎ পয়লা দিন শুধু জুমরায়ে উকবাতে পাথর মারতে হয়। তারপর এগার বার তারিখে তিনটিতেই মারতে হয়। প্রতিবার সাতটি করে সাতবারে সর্বমোট উনপঞ্চাশটি পাথর মারতে হয়। সাতবারের বেশী পাথর মারা মাকরূহ।

জুমরায়ে উকবা

মুযদালিফায় রাত্রিযাপন বা অবস্থানের পর হাজীদেরকে জুমরায়ে উকবায় পাথর মারার জন্যে মিনা অভিমুখে যাত্রা করতে হয়। জুমরায়ে উকবায় পাথর মারার চারটি সময় আছে। সেগুলো হলো ঃ

১. আদায় ঃ অর্থাৎ সেই সময় যখন পাথর মারলে হজ্জের এই রুকনটি আদায় হয়ে যায়। এ সময়টি হলো, দশই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের সময় থেকে এগারই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত।

২. মুস্তাহাব সময় ঃ এ সময়টি হলো দশই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্য পশ্চিম দিকে গড়িয়ে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত।

৩. মুবাহ সময় ঃ দশই যিলহজ্জ সূর্য পশ্চিম দিকে গড়িয়ে পড়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

৪. মাকরূহ সময় ঃ দশ তারিখ সূর্যোদয়ের পূর্বে পাথর নিক্ষেপ করা মাকরূহ। দশ তারিখ সূর্যাস্তের পরও পাথর নিক্ষেপ করা মাকরূহ। এ সময়গুলোতে কেবল বিনা ওযরে পাথর নিক্ষেপ করলেই তা মাকরূহ হবে। তবে ওযর থাকলে মাকরূহ হবে না। সুতরাং বৃদ্ধরা যদি সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং রাখালরা যদি সূর্যাস্তের পরে পাথর মারে তবে তা মাকরূহ হবে না। কারণ তাদের ওযর রয়েছে।

ফকীহরা আরো একটি সময়ে পাথর মারাকে মাকরূহ বলেছেন। সেটা হলো সেই সময় যখন চরম ভিড় দেখা দেয় এবং ভিড়ের চাপে আহত নিহত হবার আশংকা থাকে। মূলত ফকীহরা যে সময়টিকে মুস্তাহাব সময় বলেছেন, সে সময়ই ভীষণ ভিড় এবং চাপের সৃষ্টি হয়ে আহত নিহত হবার আশংকা দেখা দেয়। ফলে এরূপ আশংকা দেখা দেয়ার কারণে এ সময়টিকেও অনেকে মাকরূহ সময় বলে গণ্য করেছেন।

এ প্রসংগে আমাদের মত হলো, ফকীহরা যে সময়টিকে মুস্তাহাব সময় বলে লিখেছেন, সেটিকে মুস্তাহাব সময় না বলে 'আযীমতের সময়' বলা

www.bjilibrary.com

উচিত। আর যে সময়কে তাঁরা মাকরূহ সময় বলেছেন, সেটাকে রুখসতের সময় বলা উচিত।[১] কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

ان الله يحب ان توتى رخصه كما توتى عز النمه

"আল্লাহর দেয়া অবকাশ (রুখসাত) গ্রহণ করাকে তিনি তেমনি ভাল বাসেন, যেমন ভালবাসেন আযীমতকে।" [মুসনাদে আহমদ]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের উপর আমল করা কতইনা কল্যাণকর। অবকাশ গ্রহণ না করে, কঠোরতা অবলম্বন করতে গিয়ে মানুষ অনেক সময় দারুণ অসুবিধা ও ধ্বংসের কূলে পৌঁছে যায়। অথচ যিনি কঠোরতা অবলম্বন করতে বলেছেন, অনেক ক্ষেত্রে তিনিই আবার অবকাশ দিয়েছেন এবং দু'টিকেই তিনি সমানভাবে পছন্দ করেন। এরি ভিত্তিতে আমাদের মতে জুমরায়ে উকবায় পাথর মারার সময় নিম্নোরূপ ঃ

১. আদায়ের সময় ঃ কুরবানীর দিন অর্থাৎ দশই যিলহজ্জ অর্ধরাত থেকে এগারই যিলহজ্জ সূর্যোদয় পর্যন্ত।

২. আযীমতের সময় ঃ দশই যিলহজ্জ সূর্যোদয় থেকে সূর্য পশ্চিম দিকে গড়িয়ে পড়া পর্যন্ত।

৩. মুবাহ সময় ঃ দশই যিলহজ্জ সূর্য পশ্চিম দিকে গড়িয়ে পড়ার সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

৪. রুখসত সময় ঃ এ সময়টি হলো নয়ই যিলহজ্জ দিবাগত অর্ধরাতের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং দশ যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পর থেকে এগার যিলহজ্জ সূর্যোদয় পর্যন্ত।

যেসব ফকীহর মতে নয়ই যিলহজ্জ দিবাগত অর্ধরাতের পর থেকে রামী করা জায়েয, তাঁরা হলেন আতা, ইবনে আবী লায়লা, ইকরামা ইবনে খালিদ এবং ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুমুল্লাহ) নিজেদের মতের পক্ষে এই ফকীহগণের দলীল হলো হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত সেই হাদীস, যাতে বলা হয়েছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামাকে কুরবানীর দিন রাত্রে রামী করার জন্যে পাঠান এবং তিনি পাথর নিক্ষেপ করে

১. আযীমত মানে কঠোরতা, দৃঢ়তা, অটলতা। আর রুখসত মানে অবকাশ।

www.bjilibrary.com

এসে তাওয়াফে ইফাদা করেন।—এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ এবং বায়হাকী। তাঁরা বলেছেন এর সনদ সম্পূর্ণ সহীহ।

এই ফকীহগণ আরেকটি হাদীসকেও দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাত্রে মুযদালিফার কাছাকাছি বাহন থেকে অবতরণ করেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করেন। নামায শেষ করে জিজ্ঞেস করেন, চাঁদ কি অস্তমিত হয়েছে? তখন তাঁকে বলা হয়, হাঁ চাঁদ ডুবে গেছে। এ জবাব শুনে তিনি বললেন, এবার সবাই উঠো। অতপর সবাই উঠে গেলেন। হযরত আসমা পাথর নিক্ষেপ করে স্বীয় অবস্থান স্থলে ফিরে আসেন এবং ফজর নামায আদায় করেন।—এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বুখারী এবং মুসলিম।

পক্ষান্তরে যেসব ফকীহ বলেছেন, জুমরায়ে উকবায়ে ফজর বা সূর্যোদয়ের পর রামী করা ওয়াজিব, তাদের মতের পক্ষেও সহীহ হাদীস রয়েছে। এই উভয় প্রকার হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের পন্থা হলো এই যে, যেসব আলিম সময়ের ক্ষেত্রে কঠোরতা ও কড়াকড়ি বজায় রাখার পক্ষপাতী, তাদের দলিলগুলোর ব্যাপারে বলা যেতে পারে যে, সেগুলোর উপর আমল করা মুস্তাহাব। পক্ষান্তরে যেসব হাদীসে সময়কে সহজসাধ্য ও প্রশস্ত করা হয়েছে, সেগুলোর উপর আমল করা মুবাহ।

কেউ যদি বিনা ওযরে জুমরায়ে উকবায় পাথর নিক্ষেপের কাজ কুরবানীর দিন সূর্যাস্তের পর পর্যন্ত বিলম্ব করে, তবে তাকে অবশ্যি সেই রাত্রের মধ্যে রামী করে নিতে হবে। একাজটি যদিও মাকরূহ, কিন্তু এর জন্যে কোনো ফিদইয়া নাই, কোনো পশু কুরবানী করতে হবে না।—এটা হানাফী ও শাফেয়ীদের মত। ইমাম মালিকেরও একটি মত অনুরূপ। এমতের পক্ষে তাদের দলীল হলো একটি হাদীস।

নাফে বলেছেন, ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী সুফিয়া বিনতে আবী ওবায়েদের ভাগনেজীর মুযদালিফাতে নাসিফ আরম্ভ হয়ে যায়। ফলে সুফিয়া এবং তাঁর ভাগনেয়ী তাঁরা দু'জনে পিছে পড়ে যান। তাঁরা দশ তারিখ সূর্যাস্তের পর মিনায় পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছলে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাদের রামী করে নেয়ার নির্দেশ দেন এবং এই বিলম্বের জন্যে তাদেরকে ফিদইয়া হিসাবে কোনো কুরবানী করতে বলেননি।—হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মালিক এবং বায়হাকী।

www.bjilibrary.com

এ থেকে প্রমাণ হলো, কোনো মহিলা যদি দশ যিলহজ্জ অর্ধরাতের পর জুমরায়ে উকবায় রামী করে, সে ক্ষেত্রেও তার রামী সহীহ্ হবে। এর পূর্বে করলে সর্বসম্মতভাবে তার রামী সহীহ্ হবে না।

আইয়্যামে তাশ্‌রীকে পাথর নিক্ষেপ

আইয়্যামে তাশরীক বলতে বুঝায় যিলহজ্জ মাসের এগার, বার এবং তের তারিখ। এসব তারিখে তিনটি স্তম্ভেই (জুমরাতেই) পাথর নিক্ষেপ করতে হয়। আগেই বলেছি, দশই যিলহজ্জে শুধু জুমরায়ে উকবাতে রামী করতে হয়।

আইয়্যামে তাশরীকে শয়তানের স্তম্ভসমূহে পাথর মারার তিনটি সময় আছে ঃ

১. আদায়ের সময় ঃ সূর্য পশ্চিম দিকে গড়িয়ে পড়ার পর থেকে পরের দিন সূর্যোদয় পর্যন্ত।

২. আযীমতের সময় ঃ সূর্য পশ্চিম দিকে গড়িয়ে পড়ার পর থেকে সেদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

৩. রুখসতের সময় ঃ সূর্যাস্তের সময় থেকে পরদিন সূর্যোদয়ের সময় পর্যন্ত।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আইয়্যামে তাশরীকে) শয়তানের স্তম্ভসমূহের উপর পাথর নিক্ষেপ করেছেন সূর্য পশ্চিম দিকে গড়িয়ে পড়ার সময় কিংবা গড়িয়ে পড়ার পর।—হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ, ইবনে মাজাহ এবং তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেছেন হাদীসটি হাসান।

নাফে বলেছেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, আইয়্যামে তাশরীকের তিন দিনই রামী সূর্য পশ্চিম দিকে গড়িয়ে পড়ার পূর্বে করা যেতে পারে না। [বায়হাকী]

অবশ্য হানাফীদের মতে, যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি চলে যেতে চায় তার জন্যে বার তারিখে আর যে বিলম্ব করতে চায় তাঁর জন্যে তের তারিখ সূর্য পশ্চিম দিকে গড়িয়ে পড়ার পূর্বে স্তম্ভসমূহে পাথর মারা জায়েয। ইমাম বায়হাকী তালহা ইবনে উমরের সূত্রে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর একথাটি উল্লেখ করেছেন যে, ফেরার দিন সূর্য উপরের দিকে উঠার পরও রামী করা এবং মিনা থেকে প্রত্যাবর্তন করা জায়েয।

www.bjilibrary.com

কিন্তু ইমাম বায়হাকী বলেছেন এই বর্ণনাসূত্রে তালহা ইবনে উমর আল মক্কী নামক একজন দুর্বল ব্যক্তি আছেন।

এসব আলোচনার ভিত্তিতে আমরা মহিলাদের রামী করার সময় প্রসংগে অধিকতর যুক্তিযুক্ত সময় সেটাকে মনে করি যখন ভিড় ও চাপাচাপি কম থাকে। আর সে সময়টি হলো মাগরিবের পর থেকে পরদিন সূর্যোদয় পর্যন্ত।

আমাদের মতে এটা পরিবেশ, বাস্তবতা ও প্রয়োজনের দাবী। এ পন্থায়ই মহিলারা পুরুষদের ভিড় ও চাপাচাপি থেকে রক্ষা পেতে পারে। অবশ্য ফেরার দিন সূর্য পশ্চিম দিকে গড়িয়ে পড়ার পরের সময়টিও মহিলাদের জন্যে উপযুক্ত।

রামী করার জন্যে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা

কেউ যদি অসুস্থতা, জ্ঞান হারানো, কিংবা দুর্বলতার কারণে নিজে পাথর নিক্ষেপ করতে না পারে, তবে ফকীহদের মতে এমতাবস্থায় তার জন্যে এই পন্থা অবলম্বন করা জায়েয যে, কেউ তার হাতে পাথর উঠিয়ে দেবে এবং সে নিজ হাতে জুমরাতে পাথর মারবে, অথবা অন্য কাউকেও দিয়ে প্রতিনিধি হিসাবে তার পক্ষ থেকে পাথর মারাবে। এরূপ অবস্থায় এক ব্যক্তির জন্যে একই সাথে দুইটি পাথরও মারা জায়েয। অর্থাৎ একটি তার নিজের পক্ষ থেকে আর অপরটি সেই অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকে যে তাকে প্রতিনিধি বানিয়েছে।

একইভাবে কেউ যদি বন্দী অবস্থায় থাকে, অথবা এমন কোনো অবস্থায় থাকে, যা রামী করার জন্যে প্রতিবন্ধক, সে অবস্থায়ও রামী করার জন্যে প্রতিনিধি নিয়োগ করা জায়েয। ইবনে মাজাহ আবুয যুবায়েরের সূত্রে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। জাবির বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হজ্জ পালন করেছিলাম। আমাদের সাথে মহিলারাও ছিলেন, শিশু-কিশোররাও ছিলো। মহিলা ও শিশু-কিশোরদের পক্ষ থেকে আমরা তালবিয়া পাঠ করেছি এবং পাথর নিক্ষেপ করেছি।

ইমাম নববী আল মাজমু গ্রন্থে লিখেছেন, যে ব্যক্তি নিজে রামী করার ব্যাপারে অক্ষম হবে, তার উচিত নিজের পক্ষ থেকে রামী করার জন্যে এমন কোনো ব্যক্তিকে প্রতিনিধি বনানো, যে ইহরাম অবস্থায় নয়, কিংবা যে ব্যক্তি

www.bjilibrary.com

নিজের রামী সেরে নিয়েছে। কিন্তু সে যদি এমন কাউকেও প্রতিনিধি বানায় যে এখনো নিজের রামী সেরে নেয়নি, সে ক্ষেত্রে তার উচিত প্রথমে নিজের রামী সেরে নেয়া, অতপর সে ব্যক্তির পক্ষ থেকে রামী করা যে তাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছে। কোনো ব্যক্তি যদি অক্ষমতার কারণে নিজের পক্ষ থেকে অন্য কাউকেও রামী করার জন্যে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে এবং প্রতিনিধি রামী করে আসার পর তার অক্ষমতা দূর হয়ে যায়, তবে সময় থাকলে পুনরায় নিজে গিয়ে রামী করে আসা মুস্তাহাব। তবে এটা ওয়াজিব নয়। আর এটা কেবল তখনই মুস্তাহাব, যখন প্রতিনিধি তার অক্ষমতা দূর হবার আগে রামী করবে। কিন্তু প্রতিনিধি যদি তার অক্ষমতা দূর হবার পরে রামী করে থাকে, তবে পুনরায় নিজেই রামী করা তার জন্যে জরুরী। এ ব্যাপারে আলিমদের ঐকমত্য রয়েছে।

www.bjilibrary.com

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম মালিক, ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম শাফেয়ীর মযহাব অনুযায়ী মাথা মুন্ডন করা অথবা চুল ছাঁটা হজ্জের আমলসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল।

অধিকাংশ আলিমের মতে মাথা মুন্ডন করা অথবা চুল ছাঁটা ওয়াজিব। কোনো হাজী যদি একাজ না করে, তবে তার জন্যে কাফ্ফারা হিসাবে একটি পশু কুরবানী করা অপরিহার্য।

ইমাম শাফেয়ীর মতে মাথা মুন্ডন করা অথবা চুল ছাঁটা হজ্জের রুকনসমূহের একটি।

উমরার ক্ষেত্রে মাথা মুন্ডন বা চুল ছাঁটার সময় হলো সাফা ও মারওয়ায় সায়ী করার পর। আর হজ্জের ক্ষেত্রে একাজ করতে হয় কুরবানীর দিন অর্থাৎ দশই যিলহজ্জ জুমরায়ে উকবায় পাথর নিক্ষেপের পর। কিন্তু কোনো হাজী যদি সাথে করে কুরবানীর পশু এনে থাকে, তবে সেটি কুরবানী করার পর চুল কামাবে বা ছাঁটাবে। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক এবং একটি বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতেও চুল কামানো বা ছাঁটার একাজ আইয়্যামে নহরের মধ্যে হওয়া জরুরী। আইয়্যামে নহর বলতে বুঝায় সেইসব দিনকে, যেসব দিন কুরবানী করা যায়। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান এবং আহমদ ইবনে হাম্বলের মশহুর মতানুযায়ী কেউ যদি কুরবানীর দিনসমূহের পরেও চুল কামায় বা ছাঁটায়, তবে তা জায়েয, এ জন্যে তাকে কোনো কাফ্ফারা দিতে হবে না।

মহিলাদের জন্যে চুল ছাঁটা সুন্নত, কামানো নয়। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

ليس على النساء حلق انما عليهن التقصير

"মহিলাদের জন্যে চুল কামানো জরুরী নয়, তাদের জন্যে চুল ছাঁটাই যথেষ্ট।"

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু দাউদ। এছাড়া দারুকুতনী এবং তাবরানীতেও হাদীসটি রয়েছে। হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী এটিকে হাসান হাদীস বলেছেন।

www.bjilibrary.com

একদল ফকীহর মতে মহিলাদের মাথা মুন্ডন করা নাক কান কর্তন করার শামিল। একথা লিখেছেন ইবনুল মুনযির।

মহিলারা কি পরিমাণ চুল ছাঁটবে ?

এ প্রসংগে আলিমদের মাঝে মতভেদ আছে। ইহরাম খোলার সময় মহিলারা কি পরিমাণ চুল ছাঁটবে সে বিষয়ে ফকীহগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন।

ইমাম ম্যালিকের মতে, মহিলাদের মাথার চার পাশ থেকেই কিছুনা কিছু চুল কাটা জরুরী। কি পরিমাণ কাটতে হবে তা নির্দিষ্ট নেই। যে পরিমাণই ছাঁটুক না কেন তাই যথেষ্ট। তবে খোপা বা বেনীর মাথা থেকে সামান্য কাটা যথেষ্ট নয়।

শাফেয়ীদের মতে ন্যূনতম পরিমাণ হলো তিনটি চুল কাটা।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, প্রতিটি খোপা বা বেনীর মাথা থেকে পুরো এক আংগুল পরিমাণ কাটবে। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইসহাক এবং আবুস সওরেরও এটাই মত। ইমাম শাফেয়ীও অনুরূপ কথা বলেছেন।

আবু দাউদ লিখেছেন, আমি স্বয়ং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে বলতে শুনেছি, তাকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল, মহিলারা কি তাদের পুরো চুল কেটে ফেলবে ? তখন তিনি বলেছিলেন, হাঁ, তারা চুলগুলো মাথার সামনের দিকে এনে একত্র করে চারদিকে পুরো এক আংগুল পরিমাণ কেটে নেবে।

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও একই কথা বলেছেন।

আতা বলেছেন, মহিলারা মুষ্টিতে নিয়ে তিন আংগুল পরিমাণ চুল কাটবে।

www.bjilibrary.com

৪৪. হাদী বা কুরবানীর পশু

হাদী [هدى] মানে সেই কুরবানীর পশু, যা সওয়াব ও আল্লাহর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে হেরেমে কা'বার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُم مِّنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ق فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ج فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ط كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ط (الحج :٣٦-٣٧)

"আর (কুরবানীর) উটগুলোকে আমরা তোমাদের জন্যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে গণ্য করেছি। তোমাদের জন্যে তাতে বিপুল কল্যাণ নিহিত আছে। সুতরাং সেগুলোকে দাঁড় করিয়ে সেগুলোর উপর আল্লাহর নাম লও। আর (কুরবানীর পরে) যখন তাদের পিঠগুলো যমীনের উপর স্থিত হয়, তখন তা থেকে নিজেরা খাও এবং তাদেরকে খাওয়াও যারা অল্পে তুষ্ট হয়ে নিশ্চুপ বসে আছে, আর ঐ লোকদেরকেও, যারা এসে নিজেদের প্রয়োজন পেশ করে। এ পশুগুলোকে আমরা তোমাদের জন্যে নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছি, যাতে করে তোমরা শোকর আদায় করো। সেগুলোর গোশত আল্লাহর নিকট পৌছায় না, রক্তও নয়। কিন্তু তোমাদের তাকওয়া তাঁর নিকট অবশ্যি পৌছে।"

[সূরা আল হজ্জ ঃ ৩৬-৩৭]

নিজের কুরবানী নিজের হাতে যবেহ করা মুস্তাহাব। তবে শর্ত হলো, তাকে সুন্দর ভাবে যবেহ করা জানতে হবে। আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে সাতটি উট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যবেহ করেছেন।—হাদীসটি বর্ণনা করেছেন নাসায়ী এবং আবু দাউদ।

www.bjilibrary.com

যে ব্যক্তি নিজে ভাল যবেহ করতে জানে না, তার জন্যে মুস্তাহাব হলো নিজের কুরবানীর পশু যবেহ করার সময় তা প্রত্যক্ষ করা। এ প্রসংগে ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতিমাকে বলেছিলেন ঃ

يا فاطمة قومى فاشهدى اضحيتك فانه يغفر لك بكل قطرة من دمها كل ذنب عملتيه وقولى : اِنَّ صَلَاتِى وَ نُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ (الانعام : ١٦٢)

"ফাতিমা ! উঠো, তোমার কুরবানীর পশুর যবেহ্ প্রত্যক্ষ করো। কেননা এর প্রতি ফোটা রক্তের বিনিময়ে তোমার কৃতগুনাহ মাফ করা হবে। আর তুমি বলো ঃ আমার নামায, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মৃত্যু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যে। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমাকে একাজেরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর আমিই সর্বাগ্রে মাথা অবনতকারী।" (আল আনয়াম ঃ ১৬২)

ইমরান ইবনে হুসাইন বলেছেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, নিজ কুরবানী প্রত্যক্ষ করবার বিষয়টি কি আহলে বাইতের জন্যে নির্দিষ্ট ? তিনি বললেন ঃ না, তা নয়। বরং এটা সকল মুসলমানেরই করণীয়।

কুরবানীর পশু যবেহ করার জন্যে প্রতিনিধি নিয়োগ করা

নিজের কুরবানীর পশু যবেহ করা, গোশত বন্টন করা এবং চামড়া ছুটানোর জন্যে প্রতিনিধি নিয়োগ করা জায়েয।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উট যবেহ করার সময় আমাকে তা দেখা শুনার, চামড়া ছাড়ানোর ও গোশত বন্টন করার কাজ তত্ত্বাবধান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি আমাকে এ নির্দেশও দিয়েছিলেন, আমি যেনো মজুরী হিসাবে কসাইকে গোশত, চামড়া বা ভুঁড়ি প্রদান না করি। কসাইকে আমরা নিজেদের পকেট থেকে মুজুরী দিতাম।—এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী ব্যতীত বাকী সাতজন বড় বড় মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন।

www.bjilibrary.com

কুরবানীর পশু সম্পর্কে কতিপয় জাহেলী ধারণা

অনেক হাজীই মনে করেন, হজ্জের সময় প্রত্যেক হাজীর উপরই কুরবানী করা ওয়াজিব। তাছাড়া যে হাজীর উপর পশু কুরবানী করা আবশ্যক, তাকে নির্দিষ্ট তিনদিনের মধ্যে তার পশু যবেহ করতে হবে। আর যবেহ কেবল সেই জায়গায়ই করতে হবে, যা কুরবানীর জন্যে নির্দিষ্ট, অর্থাৎ মিনায়। আরো দেখা যায়; যাদের আর্থিক অসচ্ছলতা রয়েছে তারা এবং কৃপণ প্রকৃতির লোকেরা কম টাকায় কেনার জন্যে রোগা দুর্বল পশু ক্রয় করে তা যবেহ করে দেয়। এগুলো সবই জাহেলী ধারণা এবং কাজকর্ম। এসব ব্যাপারে সঠিক কথা হলো ঃ

১. কিরান ও তামাত্তু হজ্জ যারা করেন, শুধুমাত্র তাদের উপরই কুরবানী করা ওয়াজিব। যারা ইফরাদ হজ্জ করেন, তাদের উপর পশু কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। সুতরাং যাদের উপর কুরবানী করা ওয়াজিব তারা কুরবানী করবেন, আর যাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়, তারা কুরবানীর অর্থ দান করে দিলেই চলে।

২. হজ্জ যাত্রীদের একথাও জেনে রাখা দরকার যে, কুরবানী শুধু মিনাতেই করতে হবে, এমনটি জরুরী নয়। বরঞ্চ মক্কার সর্বত্রই কুরবানীর পশু যবেহ করা জায়েয। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

ان منى كلها منحر وان مكة و فجاجها منحر

"গোটা মিনা পুরোটাই যবেহের স্থান এবং মক্কা ও তার ঘাটিসমূহও যবেহের স্থান।"

৩. হাজীরা তাদের কুরবানীর পশু কখন যবেহ করবে সে বিষয়ে পবিত্র কুরআনে কিছু বলা হয়নি। তাছাড়া কোনো সহীহ হাদীস থেকেও নির্দিষ্ট সময়ের কথা জানা যায় না। তাই যেসব হাজীর উপর কুরবানী ওয়াজিব, তারা ওয়াজিব হবার পর যে কোনো সময় তা যবেহ করে দিতে পারে। তার জন্যে এমন কোনো সময় নির্দিষ্ট নেই যে, তার আগে পরে যবেহ করা জায়েয হবে না।

www.bjilibrary.com

অবশ্য সাধারণ কুরবানী ঐ নির্দিষ্ট তিনদিনের মধ্যেই করতে হবে, তার আগে পরে নয়। সাধারণ কুরবানীর পশু হাদী [هدى] নয়। সাধারণ কুরবানীকে ওয়াজিব বলে স্বীকার করে নিলেও তা হজ্জ যাত্রী এবং মুসাফিরের জন্যে ওয়াজিব নয়।[১]

৪. হাদী (হাজীদের কুরবানীর পশু) মোটা তাজা এবং নিখুঁত হওয়া বাঞ্ছণীয়।

১. ফাতাওয়া শাইখ মাহমুদ শালতুত ঃ পৃষ্ঠা ১৫৬ ;

www.bjilibrary.com

প্রিয় নবীর কবর যিয়ারত

মদীনায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাযার রয়েছে। তাঁর মাযার যিয়ারত করা হজ্জের রুকন নয় বটে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এবং সাহাবায়ে কিরামও হজ্জ করার জন্যে মক্কায়ই যেতেন। হজ্জ মক্কাতেই করতে হয়, যেখানে রয়েছে আল্লাহর ঘর। বাইতুল্লায় হজ্জ করলেই হজ্জের ফরযিয়াত পূর্ণ হয়ে যায়। মদীনায় যাওয়া হজ্জের রুকনও নয়, ফরযও নয়, ওয়াজিব নয়। কিন্তু ঐ ব্যক্তির চাইতে দুর্ভাগা কে আছে, যে মক্কায় এসে হজ্জ করতে পারলো, অথচ মদীনায় গিয়ে প্রিয় নবীর মাযার যিয়ারত করতে পারল না।?

বায়হাকী এবং দারুকুতনীতে বেশ কিছু হাদীস আছে। এগুলো থেকে পবিত্র রওযা যিয়ারত ওয়াজিব বলেই মনে হয়। তবে মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসগুলো সম্পর্কে নানা কথা বলেছেন এবং অনেকেই সেগুলোকে মওদূ (কৃত্রিম) হাদীস বলেছেন।

এসব সত্ত্বেও মদীনা মুনাওয়ারার শ্রেষ্ঠত্ব, উচ্চ মর্যাদা, মসজিদে নববীতে নামায পড়ার বিরাট সওয়াব এবং প্রিয় নবীর রওযায় হাযির হবার আকাংখাই মু'মিনদেরকে মদীনায় পৌছে দেয়।

ইবনে মাজাহর একটি হাদীস থেকে জানা যায় মসজিদে নববীতে একটি নামায পড়লে পঞ্চাশ হাজার নামাযের সওয়াব পাওয়া যায়। এ মসজিদেই রয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র মাযার। তাঁর মাযার যিয়ারত করা মুস্তাহাব আমলসমূহের মধ্যে উত্তম। ফলে সবসময়ই উম্মত হজ্জে গেলে তাঁর মাযার যিয়ারত করে আসে।

তাই হজ্জের ফরয শেষ করে প্রত্যেক হাজীরই মদীনায় যাবার সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। মসজিদে নববীতে ও রওযা মুবারকে নামায আদায় করার সৌভাগ্য সকলেরই হাসিল করা উচিত।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বর্ণনা করেছেন যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

www.bjilibrary.com

ما من احد سلم على عند قبري الارد الله على روحى حتى ارد عليه السلام -

"কেউ যখন আমার কবরের কাছে গিয়ে আমাকে সালাম দেবে, আল্লাহ তখন আমার দেহে আমার রূহ ফিরিয়ে দেবেন এবং আমি তার সালামের জবাব দেবো।"

এ হাদীসটি আবু দাউদেও বর্ণিত হয়েছে, তবে সেখানে "আমার কবরের কাছে গিয়ে" কথাটি নেই।

কাযী ইয়ায লিখেছেন ঃ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবরে হাযিরা দেয়া মুসলমানদের এমন একটি প্রচলিত নিয়ম, যে বিষয়ে সবাই একমত। আর এটা এমন একটি নেক কাজ, যার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যাহেরী ও মালিকী মযহাবের কোনো কোনো আলিমের মতে তো নবীর কবরে হাযিরা দেয়া ওয়াজিব।"

হাম্বলী মযহাবের কিছু আলিম নিয়ত করে নবীর মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাকে নাজায়েয বলেছেন। তাদের দলীল হলো আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি। তাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لا تبشدو الرحال الا الى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدى هذا و المسجد الاقصى -

"তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে নিয়ত করে সফর করবে না। সে তিনটি মসজিদ হলো ঃ ১. মসজিদুল হারাম (অর্থাৎ কা'বা) ২. আমার এই মসজিদ (অর্থাৎ মসজিদে নববী) এবং ৩. মসজিদে আকসা (অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাস)।"

—এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তার গ্রন্থাবলী ছাড়া মুসনাদে আহমদেও বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আমীন মাহমুদ খাত্তাব তাঁর 'ইরশাদুন নাসিক' গ্রন্থে এ দলীল খন্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ এই হাদীসটির অর্থ হলো, কোনো মসজিদ

www.bjilibrary.com

বা বিশেষ স্থানে এই নিয়তে কখনো সফর করো না যে, সেই মসজিদ বা স্থানের কোনো আলাদা মর্যাদা বা বিশেষত্ব রয়েছে। তবে তিনটি মসজিদের কথা ভিন্ন। কিন্তু মানুষ যখন কোথাও দেখা বা জ্ঞানার্জনের জন্যে যায়, তখন তার সেই সফর ঐ স্থানের উদ্দেশ্যে হয় না, হয় সেখানে যে ব্যক্তি রয়েছে তার উদ্দেশ্যে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বর্ণিত আরেকটি হাদীসের ভাষা নিম্নোরূপ ঃ

لا ينبغى للمصلى ان يشد رحاله الى مسجد ينبغى فيه الصلوة غير المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدى هذا -

"কোনো নামাযীর বিশেষ কোনো মসজিদে নামায পড়ার নিয়তে যাত্রা করা উচিত নয় তিনটি মসজিদ ছাড়া। সেগুলো হলো, মসজিদুল হারাম, মসজিদে আকসা এবং আমার এই মসজিদ।"

এ হাদীস থেকে প্রমাণ হয়, কোনো স্থান দেখা বা কারো সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হাদীসের নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্ত। এ বিষয়ে ইজমা (ঐকমত্য) রয়েছে যে, ব্যবসা বা অন্য কোনো পার্থিব উদ্দেশ্যে একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া জায়েয। তাছাড়া জিহাদের উদ্দেশ্যে কোথাও যাত্রা করা, দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করা এবং জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে কোথাও যাত্রা করা ওয়াজিব, কমপক্ষে মুস্তাহাব তো বটেই।

মোটকথা, এ প্রসংগে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য কথা হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবরে হাযির হওয়া এবং এই উদ্দেশ্যে সফর করা শুধু জায়েযই নয়, বরং অত্যন্ত পছন্দনীয় এবং মুস্তাহাব আমল।[১]

ইমাম গাযালী তাঁর 'ইহ্য়াউ উলূমুদ্দীন' গ্রন্থের আদাবুস সফর অধ্যায়ে লিখেছেন ঃ

আর এ ধরনের (অর্থাৎ জায়েয) সফরের মধ্যে রয়েছে আম্বিয়ায়ে কিরাম, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন, উলামা ও আওলীয়াগণের কবর যিয়ারত করার সফর। অর্থাৎ যিয়ারতের জন্যে এসব স্থানে সফর করা জায়েয। আর নবী

১। ইরশাদুল নাসিক ঃ পৃষ্ঠা ৩৩২—৩৩৩।

www.bjilibrary.com

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছেন ঃ "আমার মসজিদ, মসজিদে হারাম এবং মসজিদে আকসা এই তিনটি ছাড়া অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করো না, তাঁর এই নির্দেশ শুধু মাত্র মসজিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ এই তিনটি মসজিদ ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত মসজিদের মর্যাদা সমান, একটির উপর অন্যটির বিশেষ কোনো মর্যাদা নেই। এই তিনটি ব্যতীত অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে নিয়ত করে নামায পড়তে যাওয়া যাবে না। সুতরাং নবী করীমের এই নির্দেশ তাঁর কবর যিয়ারত এবং অন্যান্য নবী ও নেককারদের কবর যিয়ারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।"

এ যাবতকার আলোচনা থেকে আমাদের কাছে পরিষ্কার হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব। আর এই মুস্তাহাব পুরুষ ও মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য।

হায়েয ও নিফাস অবস্থায় যিয়ারত

মদীনায় যাওয়ার পর ফেরার আগে কোনো মহিলার হায়েয বা নিফাস আরম্ভ হয়ে যেতে পারে। এমতাবস্থায় যাত্রার পূর্বে প্রিয় নবীর কবর যিয়ারত করার জন্যে সে কি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করতে পারবে ?

এ মাসআলাটির ব্যাপারে সোজা কথা হলো, হায়েয বা নিফাসের অবস্থায় মসজিদে নববীতে প্রবেশ করার হুকুম এরূপ অবস্থায় অন্যান্য মসজিদে প্রবেশ করার মতোই।

জানাবত (গোসল ফরয হওয়ার অবস্থা) এবং হায়েয নিফাসের অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করার ব্যাপারে আলিমগণের তিনটি কথা আছে ঃ

১. একদল আলিমের মতে এরূপ অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয।

২. আরেকদল আলিমের মতে এরূপ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করা নিষেধ। কিন্তু কেউ যদি অবস্থান না করে শুধু অতিক্রম করে তবে তা জায়েয।

৩. আরেকদল আলিমের মতে এরূপ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করা এবং যাতায়াত করা সবই জায়েয।

* প্রথম দলের মধ্যে মালিকী মযহাবের আলিমগণ রয়েছেন। তাদের মতে, জুনুবী, ঋতুবতী এবং নুফাসার জন্যে মসজিদে প্রবেশ করা সম্পূর্ণ

www.bjilibrary.com

নাজায়েয। যে কোনো উদ্দেশ্যেই প্রবেশ করুক না কেন, অবস্থানের জন্যে, এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে অন্য দরজা দিয়ে বের হবার জন্যে এবং তা তার ঘরের মসজিদই হোক না কেন সকল অবস্থাতেই এদের জন্যে মসজিদে প্রবেশ নিষেধ। তবে চোর, হিংস্র পশু কিংবা কোনো অত্যাচারীর ভয়ে এরূপ অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ ও অবস্থান করা জায়েয। এ ক্ষেত্রে তাইয়াম্মুম করে নিতে হবে। এমতের পক্ষে তাদের দলীল হলো আল্লাহর বাণী :

لَاتَقْرَبُو الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ

وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ـ (النساء :٤٣)

"তোমরা নেশায় মাতাল অবস্থায় নামাযের কাছেও যেয়ো না। নামায পড়বে তখন, যখন কি বলছো তা সঠিকভাবে জানতে পারো। একইভাবে অপবিত্র অবস্থায়ও নামাযের কাছে যাবে না, যতোক্ষণ না গোসল করে নেবে। তবে পথিক হলে ভিন্ন কথা।" (নিসা : ৪৩)

এ আয়াতের 'নামায' মানে যেমন নামায, তেমনি নামাযের স্থান। কেননা কুরআনেই নামাযকে নামাযের স্থান হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন :

لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ ـ (الحج : ٤٠)

"তাহলে অবশ্যি ধ্বংস করে দেয়া হতো গীরজা, খানকা এবং (ইয়াহুদীদের) নামাযের স্থানসমূহ।" (সূরা হজ্জ : ৪০)

এ থেকে প্রমাণ হয় 'তবে পথিক হলে ভিন্ন কথা' দ্বারা মসজিদ অতিক্রম করা বুঝনো হয়েছে।

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটিও ফকীহগণ নিজেদের মতের সপক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করেন। তাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لا احل المسجد لحائض ولا جنب ـ

"ঋতুবতী ও জুনুবীদের মসজিদে প্রবেশ করাকে আমি হালাল করতে পারি না।"

* একদল আলিম কিছু শর্ত শারায়েতসহ জুনুবী এবং ঋতুবতীদের মসজিদে প্রবেশ করা এবং মসজিদের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করাকে জায়েয বলেছেন। তাদের শর্তাবলী নিম্নে আলোচিত হলো :

www.bjilibrary.com

* হানাফীরা বলেছেন, হায়েয, নিফাস এবং গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা জায়েয নয়। তবে প্রয়োজন দেখা দিলে জায়েয। যেমন গোসলের জন্যে পানি মসজিদ ছাড়া পাওয়া না গেলে, কিংবা ঘর থেকে বের হবার পথ মসজিদের ভেতর দিয়ে হলে, কিংবা এমন ঘরে বাস করতে বাধ্য হলে, যে ঘর থেকে মসজিদের ভেতর দিয়ে ছাড়া বের হবার অন্য কোনো দরজা নেই।

* শাফেয়ীদের মতে ব্লিডিং যতো কমই হোক না কেন হায়েয নিফাস অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা, অবস্থান করা, কিংবা বার বার যাতায়াত করা হারাম। তবে কেবল অতিক্রম করা জায়েয। কেননা উপরোক্ত আয়াতে [নিসা ঃ ৪৩] এর অনুমতি বর্তমান আছে। তবে এ অনুমতির ক্ষেত্রেও শর্ত হলো, মসজিদ অপবিত্র হবার বিন্দুমাত্র আশংকা থাকতে পারবে না। কিন্তু সর্বোপরি এ অবস্থায় মসজিদ দিয়ে অতিক্রম করা মাকরুহ। আর অতিক্রম মানে তাকে শুধুমাত্র এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে আরেক দরজা দিয়ে বের হতে হবে।

* হাম্বলীদের মতে, হায়েয নিফাস ও গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় না দাঁড়িয়ে মসজিদ দিয়ে শুধুমাত্র অতিক্রম করা জায়েয। ব্লিডিং-এর সময় অতিক্রম করতে পারবে, তবে মসজিদ অপবিত্র হবার আশংকা যেনো না থাকে। ব্লিডিং বন্ধ হলে মসজিদে অবস্থান করা জায়েয।

ইমাম ইবনে কুদামা এ মতের পক্ষে তাদের দলীল প্রমাণ পেশ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ ঋতুবতী, নুফাসা ও জুনুবীর জন্যে মসজিদে অবস্থান করা জায়েয নয়। তবে আমাদের মতে, আল্লাহর বাণী "তবে পথিক হলে ভিন্ন কথা" দ্বারা যে ব্যতিক্রম করা হয়েছে, তাতে মসজিদ পারাপার বা অতিক্রম করা জায়েয বলে প্রমাণিত হয়। তাছাড়া উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ

نا ولينى الخمرة من المسجد - (مسلم ج)

"আমাকে মসজিদ থেকে চাটাই এনে দাও।"

আমি আরয করলাম, আমার তো মাসিক চলছে। তিনি বললেন ঃ

ان حيضتك ليست فى يدك –

www.bjilibrary.com

"তোমার মাসিক তো আর তোমার হাতে নয়। (অর্থাৎ তোমার হাত তো আর অপবিত্র নয়)।" (সহীহ মুসলিম)

তাছাড়া জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, 'আমরা জানাবাত (গোসল ফরয হওয়া) অবস্থায় মসজিদের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করতাম।' এ বর্ণনাটির কথা উল্লেখ করেছেন ইবনুল মুনযির। তাছাড়া যায়েদ ইবনে আসলাম রাদিয়াল্লাহু আনহুও বর্ণনা করেছেন যে, 'সাহাবায়ে কিরাম জানাবাত অবস্থায় মসজিদের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করতেন।' এ বর্ণনাটিও উল্লেখ করেছেন ইবনুল মুনযির। এ বর্ণনায় বিষয়টি সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের প্রতি আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ বুঝানো হয়েছে যে, এ বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কোনো প্রকার মতভেদ ছিল না। আর "ঋতুবতী ও জুনুবীদের মসজিদে প্রবেশ করাকে আমি হালাল করতে পারি না" বলে যে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে তা সূত্র বিচ্ছিন্ন হাদীস। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এটিকে জয়ীফ হাদীস বলেছেন। অবশ্য ইবনে কাত্তান বলেছেন এটি সহীহ হাসান হাদীস।

* তৃতীয় মতটি যারা পোষণ করেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন, ইমাম মুযনী, দাউদ যাহেরী এবং ইবনুল মুনযির। তাদের মতে, কোনো শর্ত ছাড়াই জুনুবী মসজিদে অবস্থান করতে পারে। কারণ কুরআনের বাণী ঃ

لاَ تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكٰرٰى -(النساء : ٤٣)

"তোমরা যখন নেশায় মাতাল অবস্থায় থাকো, তখন সালাতের কাছেও যেয়ো না।" (আন নিসা ঃ ৪৩)

এ আয়াতে 'সালাত' দ্বারা রূপক অর্থে 'নামাযের স্থান' গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই। বরং এখানে প্রকৃত অর্থেই সালাত মানে নামায। তাই এখানে (সূরা নিসার ৪৩ আয়াতে) 'পথিক' শব্দ দ্বারা মসজিদের উপর দিয়ে চলা-চলকারী বা অতিক্রমকারী অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে না। বরং এর অর্থ হলো, সেই মুসাফির, যে ভ্রমণে (সফরে) থাকার কারণে পানি পাচ্ছে না। এমতাবস্থায় সে যদি জুনুবী হয়ে থাকে, তবে তাইয়াম্মুম করা ছাড়া মসজিদের কাছে যাবে না।

একথার প্রমাণ হলো এই যে, মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্যে কাফিররাও আসতো, আর তাদের জুনুবী হবার ব্যাপারে তো কোনো প্রকার সন্দেহই নেই। সুতরাং জুনুবীদের মসজিদে প্রবেশ করা এবং

www.bjilibrary.com

অবস্থান করা যদি নিষেধই হতো, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফিরদেরকে মসজিদে প্রবেশ করতে দিতেন না।

কাযী আবুত তাইয়্যেব আত তাবারী লিখেছেন, ঋতুবতী যদি মসজিদ পবিত্র রাখার ব্যাপারে নিজের উপর মজবুত বিশ্বাস রাখতে না পারে এবং শক্ত করে নেকড়া বেঁধে না থাকে, তাহলে তার মসজিদে প্রবেশ করা মাকরুহ। তবে মসজিদ অপবিত্র হবে না বলে যদি নিজের উপর বিশ্বাস থাকে, তবে মাকরুহ হবে না।

সারকথা

সারকথা হলো মাসিক চলাকালে মহিলারা মসজিদে প্রবেশ করতে পারে। তবে শর্ত হলো তাকে এ ব্যাপারে আস্থাশীল হতে হবে যে, মসজিদ অপবিত্র হবে না। এটা হাম্বলী এবং যাহেরী মযহাবের কিছু আলিমের মত। তাছাড়া ইমাম মুযনী, ইবনুল মুনযির, আবুত তাইয়্যেব আত তাবারী প্রমুখেরও এটাই মত।

কিন্তু হানাফী, শাফেয়ী ও মালিকীদের মতে জরুরত ও বাধ্য হওয়া ছাড়া জুনুবী, ঋতুবতী ও নুফাসার জন্যে মসজিদে যাওয়া জায়েয নয়।

আসলে এ মাসাআলাটি প্রসংগে কিছু আলিম আযীমত পন্থী আবার কিছু আলিম রুখসত পন্থী; উভয় পক্ষের দলীল প্রমাণই যথেষ্ট যুক্তিসংগত ও মজবুত।

তবে আমরা মনে করি জুনুবী, নুফাসা ও ঋতুবতীর উচিত সতর্কতা অবলম্বন করা। এরূপ অবস্থায় মসজিদে নববীতে কবরস্থলে প্রবেশ না করাই উচিত। বরঞ্চ বাবে জিব্রীলের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করে আসাই যথেষ্ট। এ পন্থা আদব ও সতর্কতার অধিকতর সহায়ক। আল্লাহই সর্বজ্ঞানী।

واخرى دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمين –

–ঃ সমাপ্ত ঃ–

www.bjilibrary.com

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- পর্দা ও ইসলাম–সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- স্বামী স্ত্রীর অধিকার ,,
- মুসলিম নারীর নিকট ইসলামের দাবী ,,
- মুসলিম মা বোনদের ভাবনার বিষয়-অধ্যাপক গোলাম আযম
- মহিলা সাহাবী-তালিবুল হাশেমী
- সংগ্রামী নারী -মুহাম্মদ নূরুযযামান
- মহিলা ফিক্‌হ ২য় খণ্ড- আল্লামা আতাইয়া খামীস
- ইসলাম ও নারী -মুহাম্মদ কুতুব
- ইসলামী সমাজে নারী-সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী
- আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা -আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ
- আল কুরআনে নারী ১ম খণ্ড -অধ্যাপক মোশাররফ হোসাইন
- আল কুরআনে নারী ২য় খণ্ড ,,
- একাধিক বিবাহ -সাইয়েদ হামেদ আলী
- নারী নির্যাতনের কারণ ও প্রতিকার -শামসুন্নাহার নিজামী
- নারী মুক্তি আন্দোলন ,,
- পর্দা একটি বাস্তব প্রয়োজন ,,
- দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের দায়িত্ব ,,
- আদর্শ সমাজ গঠনে নারী ,,
- পর্দা কি প্রগতির অন্তরায় ? -সাইয়েদা পারভীন রেজভী
- পর্দা প্রগতির সোপান -অধ্যাপক মাজহারুল ইসলাম
- বাংলাদেশে নারী মুক্তি আন্দোলনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া- মোঃ আবুল হোসেন বি. এ